আশাপূর্ণা দেবীর
ছোটগল্প সঙ্কলন

আদান-প্রদান

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন

লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-0512-3

প্রথম প্রকাশ : 1993 (*শক* 1915)

চতুর্থ মুদ্রণ : 2002 (*শক* 1923)

মূল্য : 40.00 টাকা

Ashapurna Devir Chhotogalpo Sankolan *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক

নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

গল্প

যা দেখি, তাই লিখি

উপন্যাস লিখেছি দেড়শোর বেশী আর ছোট গল্প হাজার দেড়েকেরও ওপর। ছোটগল্পই আমার 'প্রথম প্রেম'। বাল্য থেকে বার্ধক্যে দীর্ঘকাল ধরে লিখে চলেছি। এই দীর্ঘকালে যেমন ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, তেমনি সমাজজীবনের ওপর দিয়েও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, রদবদলের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। লেখা কোনোদিনই থামাইনি। সমাজের বদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতারও। লেখার মধ্যে সেই বদলের ছাপ এসেছে অনিবার্যভাবেই। তাই অনেক সময় মনে হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্ব-বিরোধিতা। কিন্তু যা দেখেছি আর দেখে যা মনে হয়েছে সেটাই লিখে চলেছি। হয়ত যাকে হিংস্র অত্যাচারী বলে মনে হয়, সে মূলতঃ হিংস্র নয়, অত্যাচারী নয়, অবোধ মাত্র। তার বোধহীনতাই অত্যাচারীর চেহারা নেয়। আবার এও দেখেছি মানুষ সবচেয়ে অসহায় নিজের কাছেই। তা সে নারী পুরুষ উভয়েই। সেই অসহায়তা থেকে তার উদ্ধার নেই। আবার হয়তো সে নিজের সবচেয়ে 'অচেনা'। তাই একদা যে জীবনটিকে পরম মূল্যবান ভেবে হৃদয় দিয়ে লালন করে এসেছে, এক মুহূর্তেই তা একান্তই মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাইনা এবং আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু তার মধ্যে দেখে চলেছি কি অফুরন্ত জীবন বৈচিত্র্য। কী বিচিত্র সব চরিত্র ! যে মানুষের মধ্যে রয়েছে উত্তরণের প্রেরণা, সুকুমার শুভবোধ, সেই মানুষই হয়তো পারিপার্শ্বিকতার চাপে অদ্ভুত একটা বিকৃত চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা বাইরে থেকে ঘৃণ্য, বিকৃত। কেবলমাত্র নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যেই নয় পারিবারিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যেও কত টানাপোড়েনের, কত ভেজাল নির্ভেজালের কারবার। নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি, অনুভব করেছি, এবং বলেও চলেছি আমার ছোটগল্পগুলির মধ্যেই বেশী।

পরিবার

আমাদের বাড়ি খুব রক্ষণশীল ছিল। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পাট ছিলনা। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে পড়েছি সর্বদাই। সেই পড়াটি বাড়িতে এবং শুধুই গল্প উপন্যাস। আমার মার ছিল ভীষণ সাহিত্যপ্রীতি। মার একদিকে সমস্ত সংসার আর একদিকে বই পড়া। তাই

বাড়িতে অনেক বই আসত। তখনকার দিনের যত গ্রন্থাবলী সবই মার ছিল আর যত পত্র পত্রিকা তখন বেরোত সেগুলো প্রায় সবই আসত। তাছাড়া তিন তিনটে লাইব্রেরী থেকে বই আসত। মায়ের বই পড়া মানে সে প্রায় কুম্ভকর্ণের ক্ষুধার মতই। আর আমাদেরও স্কুলের বালাই নেই। সেইসব বইগুলো আমরা তিন বোনে নির্বিচারে পড়ে ফেলতাম অতি বাল্য থেকেই। পড়তে পড়তে লেখার সাধ হল। হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেলে একটি পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম আর সেই লেখাটাই ছাপা হয়েছিল। তখন আমার তের বছর বয়স। আমার দিদি একটু আধটু ছবি আঁকতেন। আমার পরের বোনও কবিতা লিখতো, ছবিও খুব ভালো আঁকতো। আমাদের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলারই সুযোগ ছিল না। আমার বাবা ৺হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছবি আঁকতেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় বাবার আঁকা অনেক ছবি আছে। প্রথম সংখ্যার কভারটাও বাবার আঁকা। সম্পাদক জলধর সেন বাবার পরিচিত ছিলেন। বাবা ছবি আঁকতেন বলে আরো অনেকের সঙ্গেই বাবার বেশ পরিচয় ছিল। তাঁরা আমাদের বাড়ী আসতেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। আমরা শুধু বাইরে থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতাম ঐ একজন 'লেখক' এসেছেন. ঐ একজন 'আর্টিস্ট' এসেছেন এই পর্যন্ত।

আমরা আটটি ভাইবোন ছিলাম। ছিল অত্যন্ত সাধারণ জীবন। দাদারা লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু আমাদের তো বারো বছর বয়স থেকে বাড়ির কঠোর নিয়মে বাইরে বেরোনো বন্ধ। আমার জীবনে কিছু স্মৃতির কথা ভাবতে বসলে মনে হয় যদি খুব গরীবের মেয়ে হতাম, বা খুব বিশিষ্ট কোনো বড়লোকের মেয়ে হতাম তাহলেও বা তা নিয়ে কিছু বলার উপাদান পাওয়া যেত। দুঃখ দুর্দশা অভাব অথবা ঐশ্বর্যের ঝলক। সেদিক দিয়ে কিছুই তো নেই। স্রেফ মধ্যবিত্ত ব্যাপার। মধ্যচিত্তও। শুধু আমার বাবা ছবি আঁকতেন আর মার ছিল অত্যধিক সাহিত্যপ্রীতি। সেই হেতুই হয়তো অন্যান্য আত্মীয়জনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের মানসিকতার কিছু তফাৎ ছিল।

সাহিত্য ও সংসার ছাড়া আমার জীবনের আকর্ষণ বলতে আর কিছুই ছিল না। আমি ছবিও আঁকিনি, গানও শিখিনি। যদিও আমার বাবা শিল্পী ছিলেন, আমার বোনেরাও ছবি আঁকতে পারতেন। তবে আমার বেড়াবার সাধ ছিল খুব আর বই পড়বার। যখন আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, ভাবতুম আমার বর যদি লাইব্রেরিয়ান হন তাহলে বেশ হয়, অনেক বই পড়তে পাব। আবার মনে হতো যদি রেলে কাজ করেন তাহলেও মন্দ হয়না। খুব বেড়াতে পাব। না কোনটাই হয়নি। আমার স্বামী ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন, সাধ থাকলেও সাধ্য কম ছিল। অতএব শুধু লেখা এবং পড়ার ওপরই ছিল একমাত্র নির্ভর। সব সময় সংসারের সব কাজ সেরে চেষ্টা করেছি আমার এই শখটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। এবং অবশ্য সফলও হয়েছি। অন্য কোনো কিছুর ওপর আর তেমন আর্কষণ ছিলনা। তবে পরে বেড়িয়েছি সাধ্যমত। বিদ্যের দৌড় তো কেবলমাত্র মাতৃভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাই বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে

বিদেশী সাহিত্যের স্বাদলাভই সম্বল। তবে তেমন অনুবাদ পেলেই আগ্রহ নিয়ে পড়ি এবং পড়তে পড়তে মনে হয়, পরিবেশ দেশকাল পাত্র যতই যেমন হোক মানুষ ভেতরে সবই এক।

সাহিত্য ও সমাজ

আমি প্রথম শুরু করেছিলাম ছোটদের জন্যে লেখা দিয়ে। এখনও লিখেও চলেছি। সেটা লিখতে খুব ভালো লাগে। বড়দের জন্যে ছোটগল্প লেখার পর—উপন্যাস। উপন্যাস হচ্ছে আমার পরবর্তী ভালোবাসা। তবে এখন আর ভালোলাগার প্রশ্ন নেই। এখন হয়েছে যেন লিখতে হয় তাই লেখা, তবে না লিখেও থাকতে পারি না। প্রথম দিকে লেখার জগৎ মনে বিশেষ জায়গা নেয় বলেই হয়তো বক্তব্য জোরালো হয়, ক্রমশঃই সেটা যেন অভ্যস্ত কাজের মতো হয়ে দাঁড়ায়। তবু বলার কথা সব সময়ে থাকে নিশ্চয়ই। সর্বদাই তো নতুন কথার ঢেউ। তবে সব কখনও বলে ওঠা যায়না। সময় কম, ক্ষমতাও ক্রমেই কমে আসছে তবু মনটা তো থেমে থাকে না। এক এক সময় মনে হয় যেন আমি লিখিনা কেউ আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। তাই বলি আমি মা সরস্বতীর স্টেনোগ্রাফার। তিনি যা লেখান তাই লিখি। নাহলে পুজোর সময় কুড়িটি কাগজে লেখার পরে হয়তো দেখা গেলো পাড়ার পুজোর সুভ্যেনিরের জন্যে যেখানা লিখেছি সেটাই সে বছরে সবচেয়ে ভালো লেখা হয়েছে। এ এক অদৃশ্য শক্তি। লেখাপড়ার তো ধার দিয়ে যাইনি তবু হাজার হাজার পাতা লেখান কে ? মনে হয়, হয়তো প্রত্যেক সাহিত্যিক বা শিল্পীর ভিতরে এরকম একটা ভাব থাকে। অলক্ষ্য থেকে কাজ করান কোনো অদৃশ্য শক্তি।

আমি চিরদিনই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। আমার পৃথিবী জানলা দিয়ে দেখা। একেই তো খুব রক্ষণশীল বাড়ীর মেয়ে আবার প্রায় তেমন রক্ষণশীল বাড়ীর বৌও। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কেউ জানতো না আসলে 'আশাপূর্ণা দেবী' কে ? ওটা কোনো পুরুষ লেখকের ছদ্মনাম নয়তো ? পরে যখন বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ে সকলের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়েছে, অনেকে বলেছেন, এই যেমন সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র,'আমরা তো ভাবতাম ওটা বোধহয় একটা ছদ্মনাম। আসলে পুরুষের লেখা। এমন বলিষ্ঠ লেখা'।

অনেক সময় আমার কাছে এমন সব প্রশ্ন আসে 'গল্প-উপন্যাস লেখার সময় আপনি কী আগেই সব কিছু ভেবে নেন ? আর সেই ভাবার সময় কাকে প্রাধান্য দেন ? ঘটনা, কাহিনী না চরিত্র ?' তার উত্তরে আমি বলি—গল্প উপন্যাস লেখার সময় আমি চরিত্রই প্রধানত ভাবি। তারপরে চরিত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলো একটু একটু করে ভেবে নিয়ে সাজাতে চেষ্টা করি। অনেক সময় ভাবনার বাইরেও চলে যায় ঘটনাগুলো, চরিত্রটাকে ঠিক রাখতে। মানে আমার মনের মতো রাখতে। অনেক সময় যে ঘটনাগুলো ভাবি সেগুলো হয়তো অনেক বদলে যায়। এক সময় মনে হয় যে ওদের নিয়ন্তা আমি নই, ওরা আপন ইচ্ছায় নিজের পথে চলে যাচ্ছে। আবার অনেকে ভেবে বসেন, কাহিনীর নায়িকা হয়তো আমিই। সে ভাবাটা অবশ্য ভুল। তবে 'আমি'-হীন লেখা কি হয় ? সবার লেখাতেই তার নিজের 'আমি' টা অন্তরালে কাজ করে।

যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি— ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশী তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয় আর ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করতো। কিন্তু আমাদের আমলে তো এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমন কি গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও তো ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ দুঃখ জ্বালাটা জমত। আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন প্রথম প্রতিশ্রুতির 'সত্যবতী'। তবে পারিপার্শ্বিকতা তো জোগাড় করতে হবেই। 'সুবর্ণলতা'র সমাজটাকে অবশ্য দেখেছি বাল্য-শৈশবে। আমাদের বাড়ীর এবং আমাদের মাসতুতো পিসতুতো ইত্যাদিদের ঘরে ঘরে দেখেছি। সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের খুব নতজানু হয়ে থাকতে হত। তবে যাঁরা গিন্নিবান্নি হয়ে গেছেন তাদেরও দারুণ প্রতাপ ছিলো। অল্পবয়সী মেয়েদের, বিশেষ করে বৌদের জীবন ছিলো দুঃখের নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করতো, কেন এমন অবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা? লেখার মধ্যে সেই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে বারে বারে।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, 'মেয়েদের ওপরে অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুরতার একটা কারণ আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো, কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই এক জায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।' এইটাই আসল কথা এবং বোধহয় শেষ কথা। মেয়েদের কাছে পুরুষেরা তেমন মানসিক সহায়তা পায়না, যতটা পায় তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যর জন্য। এখন অনেক কিছুই বদলেছে কিন্তু মনোধর্ম তো তেমন বদলায়নি। মেয়েরা যত সহজে প্রেয়সী হতে পারে, তত সহজে শ্রেয়সী হয়ে উঠতে পারে না।

মনে হয় এখনকার সাহিত্যে ব্যক্তিগত সমস্যাই প্রাধান্য পাচ্ছে। সমষ্টিগত সামাজিক সমস্যার কথা কেউ তেমন ভাবছে কই? যেটা ভাবা হয় সেটা হচ্ছে খুব অনগ্রসর সমাজের কথা নিয়ে। নারীর সমস্যা নিয়ে পুরুষেরা তো খুব বেশি আলোড়িত নয়। আগে মেয়েদের যে হতমান্য অবস্থা ছিল তা দেখে মহৎ চিন্তাশীল পুরুষেরা আলোড়িত হতেন। না হলে বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রাতঃস্মরণীয় বলা হয় কেন? এখনকার পুরুষদের তেমন আলোড়িত হবার দরকার হয়না। কারণ তারা তো মেয়েদের সেই আগের কালের অবহেলিত রূপ দেখেননি। অবশ্য আজকাল গ্রামের মেয়েদের নিয়ে বেশ কিছু লেখা হচ্ছে, লেখকরাই লিখছেন। কিন্তু সে তাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ দেহগত আনন্দ বেদনা নিয়েই লেখা হয়। তাদের সামগ্রিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে বেশী লেখা হয়না। তবে এসব ধারণা আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে। সবই তো আর পড়ে ওঠা হয়না।

সমাজ ও সাহিত্য

সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক, কাজেই সাহিত্যিক যদি যথেচ্ছাচার করেন তবে অধিকার ভঙ্গ করা হয়। তাঁকে ভাবতে হয় তাঁর লেখার মূল্য আছে। এবং তাঁর দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে। সাহিত্যিকের কাজ উত্তরণের পথ দেখানো। শুধু বানিয়ে লেখা নয়। আসলে সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা। প্রতিকারের চিন্তা করাও সাহিত্যিকের কাজ নয়। সে কাজ সমাজ সংস্কারকের। নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারলে সন্তোষ, না পারলে যন্ত্রণা। নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়।

যদি কিছু বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি সেটা করেছি প্রতিবাদ করবার মাধ্যম হিসেবেই। তবে কখনোই সে প্রতিবাদ তাল ঠুকে জানাতে চাইনি। আমাকে যেটা পীড়া দিয়েছে যা যন্ত্রণা আর চিন্তা-জর্জরিত করেছে, সেটাকে বোঝাতেই ওদের মধ্য দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি। যা দেখি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয় ? আমি কখনও 'এইটা হওয়া উচিত' একথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কী হয় সেটাই বলবার। কী উচিত বলবার আমি কে ?

তবে পৌঁছে গেছি অনেকের কাছেই। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি সারা জীবনের খাটা-খাটুনিটা বৃথা যায়নি। সারা জীবন আরামকে হারাম করে যা বলতে চেয়েছি তা হয়তো অন্যদের বোঝাতে পেরেছি। 'বিদ্রোহিনী' সৃষ্টি করার প্রশ্নে বলব আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন (আর আমার লেখা) পাশাপাশি রাখলে 'বিদ্রোহিনী'কে কোথাও ধরা যাবে না। তবে সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে। যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গন্ডি থেকেই দেখা। চিরদিন দেখেছি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে সুখী মনে হয় সে হয়তো আদৌ সুখী নয়, আবার যাকে নেহাৎ দুঃখী মনে হয় সে সত্যিকারের দুঃখী নয়। বাইরের চেহারা আর ভেতরের চেহারা দুটোর মধ্যে হয়তো আকাশ পাতাল তফাৎ। সেটাই অনেক সময় আমার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি, সমাজসেবিকাদের নিয়েও তেমন নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে। তবে তাদের নিয়েই, যারা অসহনীয় অবস্থাকে মেনে নিতে পারেনা। তেমন অবস্থা হলে— ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে। চিরদিনই ভেতরে একটা আপসহীন বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ নয়। তাকে যদি নারীমুক্তির পিপাসা বলতে হয়, তাহলে তাই। সেটা ব্যক্তিগত নয়। সমষ্টিগত সমাজের জন্য। আমাদের সময়ে 'বিদ্রোহিনী' কথাটাই ছিল। 'নারীমুক্তি' শব্দটি চালু ছিল না। প্রথম জীবনে মেয়েদের অবরোধ সমস্যাই আমাকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করত। ছেলেবেলা থেকেই তো দেখেছি সেই বন্ধনদশাগ্রস্ত অবস্থা। তাছাড়া মেয়েদের সব বিষয়েই তো ছিল অনধিকার। এখন সে অবস্থা অনেক কেটেছে। অন্তত আইনের দিক থেকে সমস্ত বিষয়ের অধিকার তারা পেয়েছে। 'স্বাধীনতা'— সেটাও বাইরের জগতে যা পাবার তা পেয়েছে। কাজেই এখন আর সেই নিয়ে মনকে পীড়িত করে না। এখন যা আমাকে ভাবায় তা হল মেয়েদের স্বাধীনতা

পাবার পর তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না ? মনের মধ্যে স্বাধীনতা নামক যে স্বপ্নের জগৎ ছিল ঠিক তেমনটি কী হচ্ছে ? তবে এখনকার মেয়েদের সমস্যাও কম নয় বরং আগের থেকে অনেক বেশী সমস্যা। এখন তারা দশভূজা মূর্তি নিয়ে ঘর সামলাচ্ছে বার সামলাচ্ছে। আমি ঘরোয়া মেয়েদের কথাই বলছি, তারা এখন ঘরে-বাইরে সমানভাবে কাজ করে। এই মেয়েদের ক্ষমতা অসীম। শুধু একটিই তাদের এখন নেই বা খুবই কমে গেছে তা হচ্ছে সহিষ্ণুতা। বললে ভুল হবে না — বড় অসহিষ্ণু হয়ে গেছে আজকের মেয়েরা। পরমত-অসহিষ্ণুতা তাদের জীবনে অনেক অশান্তি ডেকে আনছে। এটা থাকলে অবশ্যই জীবন অনেক সুন্দর হতো। আমার তো মনে হয় শিক্ষা সভ্যতা আর শালীনতার প্রথম পাঠই হচ্ছে— পরমতসহিষ্ণুতা। ধৈর্যের সঙ্গে অপরের দিকটা ভাবা।

আর একটা সমস্যা হচ্ছে, যদিও নারী মুক্তি নিয়ে মেয়েরা খুবই উদ্দীপ্ত উত্তেজিত কিন্তু 'মুক্তি' সম্বন্ধে একটা সুস্থ ধারণা কোথায় ? স্বক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজেকে তারা এখনও ঠিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আত্মমর্যাদা ও আত্ম-অহমিকা যে এক নয় সেটা তারা অনেক সময় ভুলে যায়। মনে হয় যতদিন না তারা 'আসক্তি' ত্যাগ করতে পারবে ততদিন মুক্তি আসবে না। মেয়েরা সবের প্রতিই বড় বেশী আসক্ত। তুচ্ছ বস্তুর প্রতিও আসক্তি। আবার মানুষের প্রতিও একধরনের তীব্র আসক্তি। স্বামী-সন্তান এরা একান্তই 'আমার' হোক। আর কারুকে সে ভালবাসতেও পারে না। আজকের মেয়েরা সবই নিজে পরিচালনা করতে চায়। সেটাও আবার অনেক সময় সমস্যা ডেকে আনে।

সদ্য বিগত তিনটি যুগকে আমি আমার 'ট্রিলজি'র মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। এই যুগকে সেভাবে পারছি না। এখন বয়সের ভারে ঘরবন্দী। তবে হিসেব মতো যেটুকু হাওয়া বাইরে থেকে এসে পড়ছে তাই দেখছি। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই যুগটাকে, এখনকার কালকে ঠিকমত ধরা যাচ্ছে না। ক্রমশই মানুষের সুখী হবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মানুষকে সে ভালোবাসতে পারছে কম। ভালোবাসার পরিধি কমে যাচ্ছে। কাজেই সে সুখী হবার যত চেষ্টা করছে ততই ব্যর্থ হচ্ছে। বস্তুর মধ্যে সুখ কোথায় ? অথচ সেটা বুঝতে না পেরে সেখানেই সুখের সন্ধান করছে। ফলে তার হৃদয়ের প্রেরণা-গুলিই চলে যাচ্ছে।

আগেই বলেছি আমার জানার জগতের গন্ডিটা খুবই ছোট তবুও এক সময় মনে হয় মানুষ যেন ক্রমশই কেমন সংকীর্ণ আর ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। আগে বড় বাড়ি, বড় দালান, বড় সংসার, বড় বড় জিনিসপত্র ছিল, এখন আসবাবপত্র ঘরবাড়ি সমস্ত কিছুই ছোট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনটাও সেই সংগে বোধহয় ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার ভালোবাসার ক্ষমতাও যেন ক্রমেই সংকীর্ণ হতে হতে আত্মকেন্দ্রিকতার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য। সাহিত্য ও সমাজ এ দুটো তো পাশাপাশি চলে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ আবার সমাজও সাহিত্যের দর্পণ। আবার এও বলা যায়, সমাজ ও সাহিত্য এগিয়ে চলেছে সমান্তরাল দুটো লাইনে পাশাপাশি — একে অন্যকে অতিক্রম করবার চেষ্টা

করতে করতে। এ জিনিষ চিরকালই আছে, তবে আগের দিনে সমাজ এবং সাহিত্য এ দুইয়ের মধ্যেই রক্ষণশীলতার প্রভাব একটু থাকতোই। তাই চট করে ঐ 'অতিক্রম'টি তেমন দুরন্ত গতির চেহারা নিত না। একালে রক্ষণশীলতার মনোভাব কমে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার 'বেপরোয়া' ভঙ্গিটাকেই 'আধুনিকতা' বলে গণ্য করা হচ্ছে। কাজেই ঐ অতিক্রমটির গতি দুরন্ত হয়ে চলেছে।

তাছাড়া আমাদের সাহিত্যে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব তো আছেই —বর্তমানে সমাজেও পাশ্চাত্য জীবনের প্রবল প্রভাব ভারতীয় জীবনধারায় দ্রুত বদল ঘটিয়ে চলেছে। যেটা স্বাস্থ্যকর কিনা তা ভাববার।

একথা অবশ্যই সত্য, জীবনে যা কিছু আছে, বা থাকে, জীবনধর্মী সাহিত্যে তার সব কিছুই আসতে পারে। সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। তবু আমার নিজস্ব ধারণায় – অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বড় নগ্ন নির্লজ্জ। সেখানে তাকে সাহিত্যের দরবারে যথাযথ প্রকাশ করতে দিলেও একটি আবরণ থাকা আবশ্যক। সেই আবরণটুকু হচ্ছে ভাষার শালীনতা। শালীন ভাষায় সবকিছু ব্যক্ত করতে পারাও একটি সূক্ষ্ম শিল্প। তাকে 'অবাস্তব' বলে ফেলে দেওয়া কী সংগত ?

মানুষের দেহটার মতো 'বাস্তব সত্য' আর কী আছে ? তবু তাকে লোকচক্ষে প্রকাশ করার কালে কী নিরাবরণভাবে আনা হয় ? নিজের সম্বন্ধে বেশী বলা অস্বস্তিকর, তবু তেমন একটু দায়িত্ব যখন এসেই পড়েছে তখন বলতেই হয় ভাষার অশালীনতা আমার মনকে পীড়া দেয়, কোনো পরিস্থিতিতেই তাকে প্রবেশাধিকার দিতে মন চায় না। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে আমি এই নীতিটি মেনে চলে এসেছি, কিন্তু তাতে তো কখনো অসুবিধে বোধ করিনি। পাঠক সমাজ তো গ্রহণ করে ধন্য করেছেন, 'কৃত্রিম' আর 'অনাধুনিক' বলে তো ফেলে রাখেননি। আমার পাঠক সমাজের কাছে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ।

❑

ভূমিকা

আশাপূর্ণা ভারতীয় ভাষায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের মধ্যে স্থায়ী আসন নিয়েছেন। অথচ সুযোগ্য অনুবাদের অভাবে বিশ্বসাহিত্যে তিনি এখনও অচেনা। ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর উপন্যাস যতটা পরিচিত, ছোটগল্পের তত অনুবাদ হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে জগদীশ গুপ্ত বলেছিলেন— "গভীর উদ্দেশ্য লইয়া, নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া, তিনি অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই।" আশাপূর্ণার ক্ষেত্রেও এই মন্তব্যটি অবিকল প্রযোজ্য। চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বাঙালী জীবন নিয়েই সত্তর বছর ধরে লিখে চলেছেন— অথচ সহস্রদল বিশিষ্ট মানবজীবনের বিচিত্র দিকে তাঁর সহস্র চোখ খোলা। জীবনের সোজা উলটো দুটি দিকই তাঁর গভীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়। এবং ঈশ্বরদত্ত যে লেখনীটি হাতে নিয়েই তাঁর জন্ম, তার কল্যাণে তাঁর নিজের দেখা জীবনের দৃশ্যগুলি পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরতে আশাপূর্ণার দক্ষতা তুলনাহীন।

তাই সত্তর বছর ধরে লিখেও তাঁর লেখনীতে ক্লান্তির ছাপ পড়েনি, আসেনি পৌনঃপুন্যের ত্রুটি, বরং অনুশীলনে বেড়েছে ঔজ্জ্বল্য। স্বচ্ছন্দ প্রাণশক্তিতে তাঁর লেখনী এখনও সতেজ। তাতে ক্রোধ, কৌতুক, শ্লেষ, বিষাদ, তিক্ততা, বিস্ময় আজও অবারিত ধারায় উৎসারিত হয়ে চলেছে, অসামান্য শিল্পশৈলী আর গভীর রসবোধের দ্বৈত শক্তিতে।

সত্তর বছরে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে, বদল হয়েছে সমাজ সংসারের, কিন্তু আশাপূর্ণা বলেন, "পরিবেশ, দেশ, কাল, পাত্র যতই যেমন হোক মানুষ ভেতরে সবই এক। এদেশেও সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজও মানুষের মূলটা বদলায়নি।" আশাপূর্ণার শিল্পকৃতি এই "মানুষের মূলটা" নিয়েই। তাঁর লেখায় যে মানুষগুলির সাক্ষাৎ পাই তারা নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ, সংসারী মধ্যবিত্ত নারীপুরুষ, অতি পরিচিত, অতি প্রাণবন্ত। তারা উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত নয়, অতি-মেধাবী শিল্পী পণ্ডিত নয়, সন্ত-সন্ন্যাসী নয়, নয় সমাজবিরোধী, শয়তান কিংবা সমাজবিচ্ছিন্ন প্রান্তিক ভবঘুরে। আশাপূর্ণা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "আমি কখনও আমার জানা জগতের বাইরে পা ফেলতে যাবার চেষ্টা করি না।" এখানেই আশাপূর্ণার জিৎ। নেহাৎ সাধারণ, আটপৌরে, 'সুস্থ' 'স্বাভাবিক' লোকজন যাদের নিয়ে সংসারে আমাদের প্রতিদিনের বাঁচা, আশাপূর্ণার ছোটগল্পে সেই সব মুখেরই মিছিল। ঠিক যেন শুকনো তুলির জোরালো দুটি একটি টানে তিনি চরিত্রগুলিকে স্কেচ করে ফেলেন। আশাপূর্ণা বলেন, "আমি চরিত্রই প্রধানত ভাবি। তার পরে চরিত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলো একটু ভেবে নিয়ে সাজাতে

চেষ্টা করি।" আশাপূর্ণার ছোটগল্পের প্রাণ তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টি — যা তাঁর শাণিত শব্দচয়নে, মর্মভেদী বিষয় নির্বাচনে, এবং উদাসীন নিরপেক্ষ উপস্থাপনের মধ্যে মূর্ত। গভীর মানবিকতায় এবং কঠোর বাস্তববোধে মনুষ্যজীবনের চরম নির্মমতার দিকগুলি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর জুড়ি নেই। ঈর্ষণীয় তাঁর একনিশ্বাসে গল্প বলতে পারার জাদুমন্ত্রটিও। গল্পের কাহিনীটি নিটোল হয়, অথচ কাহিনীতেই গল্প ফুরিয়ে যায় না। তার রেশ চলে অনেকক্ষণ ধরে, পাঠকের অন্তর্লোকে। আশাপূর্ণার নিজের ভাষায়, "উপন্যাস আমাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তবু ছোট গল্পের ওপরেই আমার পক্ষপাত। কেন ? ... হয় তো ছোট গল্পই আমার 'প্রথম প্রেম' বলে। এবং এখনও ছোট গল্প লিখতেই বেশি ভাল লাগে, এটাই ঘটনা।... আমার মনে হয় উপন্যাস লেখা যেন একটা 'কাজ' আর ছোট গল্প লেখাটা হচ্ছে 'আনন্দ'। ... ওতে তো কোনও কাঠ খড় পোড়াতে হয় না। আপনিই হয়ে ওঠে।" এই আপনিই-হয়ে-ওঠা ছোটগল্পের রাশি থেকে কুড়িটি তুলে এনেছেন লেখিকা স্বয়ং।

জীবনের ছোটো ছোটো মুহূর্তের মধ্য দিয়ে অকস্মাৎ খুব বড়ো চিরন্তন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলে মানুষ। হঠাৎ হঠাৎ একটা বন্ধ খড়খড়ি তুলে, একটি ঘুলঘুলির ঢাকনা খুলে মানুষের মনের সংসারের ভেতর মহলটা আমাদের দেখিয়ে দেন আশাপূর্ণা। হঠাৎ নগ্ন হয়ে পড়ে চেনামুখের তলায় অচেনা মানুষের নতুন মূর্তি। কখনও তা সন্তের মতো মহৎ, কখনও আত্মকেন্দ্রিকতায় অমানুষিক, কখনও ক্ষুদ্রতায় নীচতায় পাশব, কখনও বা অপরিসীম ঔদাস্যে নির্মম। বাটির মধ্যে মধ্য সূর্যের প্রতিবিম্বের মতো ছোটগল্পের ছোট্ট আধারে ঝিকিয়ে ওঠে পূর্ণ, জ্বলন্ত, জীবনসত্য। ছোটগল্পে 'আনন্দ' পেলেও সেখানে নিজেকে 'নিরাসক্ত' 'দর্শক' বা 'কথক' বলে মনে করেন আশাপূর্ণা — উপন্যাসে যিনি ভূমিকা নেন 'বিদ্রোহিনী'র। "নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি, এবং বলেও চলেছি আমার ছোটগল্পগুলির মধ্যে। সেখানে আমার ভূমিকা আদৌ 'বিদ্রোহিনী'র নয়। কেবলমাত্র নিরাসক্ত দর্শকের অথবা কথকের।" তিনি বারংবার বলেন, "ছোটগল্পই আমার 'প্রথম প্রেম'।" নিঃসংশয়ে ছোট গল্পই তাঁর প্রিয় হাতিয়ার— যার মধ্যে আশাপূর্ণার মেধার ঔজ্জ্বল্য তীব্রতম, বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি সর্বাধিক। আর সম্ভবত লেখিকার স্বকীয় অভ্যন্তরীণ সত্তাটিও সবচেয়ে প্রকট। ট্রিলজির 'সত্যবতী'র মধ্যে তাঁর নিজের চেহারা আছে তা তিনি স্বীকার করেছেন কিন্তু ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা। "যে কোনও লেখকেরই লেখার মধ্যে তার নিজস্ব সত্তাটির উপস্থিতি ঘটবেই। চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে তো তারা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না।"

আশাপূর্ণার ছোটগল্পের চরিত্রগুলি মূলত সমাজনির্ভর প্রাণী, সমাজই তাদের কাছে শেষ সত্য। বুকের মধ্যে যাই ঘটুক, আশাপূর্ণার গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজের চাপের কাছে নিজেকে বলি দিচ্ছে। গল্প সাজানোর গুণে কখনো তা হয়ে উঠছে মহানুভবতা, কখনো বা হৃদয়ের দৈন্য, কখনো কঠোর আত্মসংযমের পরীক্ষা। তলিয়ে ভেবে

দেখলে দেখবো ছোটগল্পগুলিতে শেষ জিৎ কিন্তু ব্যক্তির নয় সমাজেরই। প্রত্যেক বার। সে ব্যক্তি গল্পে হারুক, আর জিতুক, প্রকৃত জয়ী সমাজ। যা ঘটে থাকে বাস্তবে। "যা হয় আমি তাই লিখি," আশাপূর্ণা বলেন," 'উচিত' বলবার আমি কে ?"

আশাপূর্ণার ছোটগল্পে মেয়েরা পুরুষচরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন, অনেক বেশি পূর্ণতা পেয়েছেন। নারীর চোখেই তো পৃথিবীটাকে দেখা আশাপূর্ণার। "আমিহীন কি লেখা হয় ? সব লেখাতেই তার নিজের 'আমি' টা অন্তরালে কাজ করে চলে।" তাই হয় তো আশাপূর্ণার নারীরা অনেক সুসম্পূর্ণ, নীচতা হীনতায়ও যেমন তারা পুরুষকে হার মানায়, ত্যাগের ব্যাপ্তিতে, বুদ্ধির ক্ষিপ্রতায়, বোধের গভীরতায়, সংযমের তীব্রতায়ও তারাই জিতে যায়। দুঃখে সুখে আশাপূর্ণার পুরুষেরা বুঝি একটু কম বর্ণময়। তাঁরা পিছনের আসনে। একটু স্থূল, একটু নিরীহ, একটু ভীরু, খানিক রগচটা। সূক্ষ্ম, জটিল, দ্বন্দ্বজর্জর মানসিকতার অধিকারী নারীরাই। শোষিতের ভূমিকাতেও তাঁরা, শোষকের ভূমিকাতেও তাঁরাই।

চার দেওয়ালের গন্ডীর মধ্যে থাকলে কি হবে, জীবনের জটিল, রঙিন, রক্তাক্ত সংগ্রামে আশাপূর্ণার নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থবল, লোকবল নিয়ে বহিরঙ্গে পূর্ণ ক্ষমতাশীল পুরুষের অন্তরঙ্গের বলে বলীয়ান না হলেও হয়তো চলে যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের মূল শক্তি যে অন্তর্নিহিত। আশাপূর্ণার নারীদের বোধবুদ্ধিই তাদের প্রকৃত 'স্ত্রীধন'। তাঁর গল্পে প্রায়ই সাধারণ মেয়েদের মধ্যে অনন্যসাধারণ মনুষ্যত্ব ঝিলিক মারে। গল্পে চমকপ্রদ যতগুলি নারী চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন সেরকম অবিস্মরণীয় পুরুষ চরিত্র কিন্তু বিশেষ আমাদের চোখে পড়েনি।

আশাপূর্ণার লেখা মননজাত, ঋজু, বুদ্ধিনির্ভর, ভাবাবেগবর্জিত। আর আছে তাতে মৃদু কৌতুক, যা কখনও বিশুদ্ধ মধুর, কখনও বা কটু কাষায় রসে সিক্ত বিদ্রূপ। প্রধানত নাগরিক পটভূমিকায় তাঁর গল্পগুলি ঘটে। দু'একটি মফঃস্বলী বা গ্রামীণ দৃশ্যও যে নেই তা নয় কিন্তু সংখ্যায় তা অতি সামান্য। আশাপূর্ণা মনে প্রাণে নাগরিক চেতনাসম্পন্ন শিল্পী। —"শহুরে মধ্যবিত্ত মানস" বলতেই তো আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিষিক্ত মননের কথা ধরে নিই, আশাপূর্ণা তার মূর্ত প্রতিবাদ। তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্য শিক্ষা-নিরপেক্ষ হয়েও এক মুক্ত, স্বচ্ছ, মার্জিত, পরিপূর্ণভাবে বাঙালি, নাগরিক চিন্তাধারা। আধুনিক পশ্চিমী ভাবনার সঙ্গে স্বদেশী সংস্কৃতির নিয়ত সংঘাত আমাদের সমাজকে ভেঙে গড়ছে, নিত্য নতুন রূপ দিচ্ছে। আশাপূর্ণার লেখায় তারই প্রতিবিম্ব দেখি। আশাপূর্ণার ভাষাতে, " সমাজ তো একটা 'মৃত' বস্তু নয়। 'জীবন্ত' মাত্রেরই পরিবর্তন ঘটে। ভাঙাগড়ার কাজ অহরহই চলে। হয় তো নতুন কিছু একটা দেখলেই সমাজমানসে 'গেল-গেল' রব ওঠে, আবার ধীরে ধীরে সেটাই সহনীয় এবং গ্রহণীয় হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু মূল্যবোধ থাকে যার অবক্ষয় কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কোনও পরিপ্রেক্ষিতেই নয়।" আশাপূর্ণার ছোটগল্পগুলি তাঁর এই দৃঢ় উক্তির সদাজাগ্রত উদাহরণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতির সুযোগ তিনি পাননি, তাতে বাংলা

সাহিত্যের কোনও লোকসান হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি নিজেও তা মনে করেন না। "আমি জানি আমি যতটুকু পেয়েছি সেটাই আমার ক্ষমতার সীমা। বহিরঙ্গের কোনও সুযোগসুবিধে তার বেশি কিছু করতে পারত না।"

আশাপূর্ণা দেবীর মতো তীক্ষ্ণ ধীমতী কোনো শিল্পী যখন বিংশ শতাব্দীর এই যন্ত্রযুগের মাঝখানে কলকাতা শহরের মত উর্বর এক সাংস্কৃতিক ভূমিতে জীবনযাপন করেন, তাঁর দেহটি চার দেওয়ালের গন্ডীর মধ্যে থাকলেও তাঁর মনন ও উপলব্ধি সেখানে গন্ডীবদ্ধ থাকে না। তাঁর বাস্তববুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, জগৎ সংসার সম্পর্কে জ্ঞান কোনটাই খন্ডিত হয়ে পড়ে না, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ভোঁতা হয়ে যায় না, ঈশ্বরদত্ত শিল্প নৈপুণ্য সীমিত হয়ে থাকে না। ঘরের মধ্যে বসেই তিনি শান দেন তাঁর কলমে, তাঁর নজরে। বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবনে অভিজ্ঞতার বিচিত্র সাম্রাজ্যে মেলে দেন তাঁর সত্যদৃষ্টি, ডুব দেন মনুষ্যহৃদয়ের গহন গুহাকোণে। এর জন্য তাঁর প্রয়োজন শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতির তারের, যে অদৃশ্য অ্যান্টেনা ছড়িয়ে থাকে বাতাসে, তুলে নেয় যা কিছু শব্দ, দৃশ্য, সংবাদ। আধুনিক বাঙালি জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখবার জন্য তাঁর শুধু সময় সচেতনতাটুকুই যথেষ্ট। তাঁর চতুর্দিকেই তো ছড়িয়ে আছে জীবন, ফুঁসে উঠছে তার তরঙ্গ। একে ভাষায় ধরবার জন্য তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে তরঙ্গ আমাদের ঘর-সংসারের চৌকাঠের এধারে এসে প্রত্যহ আছড়ে পড়ছে, সেইই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নিয়ে কদাচ উদ্বিগ্ন হতে হয়নি তাঁকে। মানুষ নামক জীবটি এমনই অফুরন্ত বৈচিত্র্যের, অশেষ অভিনবত্বের উৎস যে তাঁর ছোটগল্পের জন্য প্লটের অভাব হয় না। শুধু চোখ, মন, আর কান দুটি খোলা থাকলেই হল। "আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবু তার মধ্যেই দেখে চলেছি কী অফুরন্ত জীবন বৈচিত্র্য। কী বিচিত্র সব চরিত্র।"

শিল্পী আশাপূর্ণা সত্য উন্মোচনে নির্মম। সংসারের কোনো বহু প্রশংসিত "আদর্শ" মানবিক সম্পর্ককেই তিনি ভাবালুতার আড়ালে 'মহৎ' হয়ে বাঁচতে দেন না। মাতৃত্বের কি পিতামহত্বের যে আদর্শ মহিমান্বিত চেহারা আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃত, আশাপূর্ণার নির্মম সত্যদৃষ্টি তাদেরও এফোঁড় ওফোঁড় করেছে। বারবার আশাপূর্ণার ছোটগল্পে তথাকথিত মাতৃহৃদয় হার মেনেছে মানুষী স্বার্থপরতার কাছে, অহংপ্রেমের হাড়িকাঠে। এই নিষ্ঠুরতার ছবি বারবার একজন "ঘরনী-গৃহিণী-জননী"-র সংসারী কলমেই ফুটেছে একের পর এক ছোটগল্পে। বিচিত্র বিভিন্ন "ঘরোয়া" পরিস্থিতিতে। কোথাও প্রেমিকের হাতে গোপনে গয়নাগাঁটি তুলে দিয়ে মা স্বামী-কন্যাকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে গেছেন — আর সবকিছু জেনে বুঝেও মেয়েকে না জানার ভাণ করতে হচ্ছে, কোথাও ধর্ষিতা মেয়ের ঠিকানা মা উনুনে গুঁজে দিচ্ছেন সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়ে, কোথাও সদ্য পুত্রহারা মা বধূর বৈধব্যে খুশি। জীবনের যেসব দিকগুলো আমরা দেখতে চাই না, আশাপূর্ণা সেদিকের জানলাগুলোই খুলে দেন শিল্পীর নির্মমতায়। 'ভয়' গল্পে যেমন সাতসন্তান মারা যাবার পরেও নিঃসন্তান বৃদ্ধা জননী "সায়েব

ডাক্তার" দেখাতে চান— মৃত্যুভয়ের প্রাকৃতিক চাপে তিনি নির্লজ্জ, নগ্ন হয়ে পড়েন— "বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই, কিন্তু মরতে বড় ভয় করে"। এই দ্বন্দ্ব একান্তভাবেই সামাজিক মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে। যখন অহংকারী স্বামী-সোহাগী পুত্রবধূটি বিধবা হয়ে তাঁরই নিরিমিষি হেঁশেলে ভর্তি হল, জয়াবতীর অন্তরে তখন পুত্রশোকের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল প্রতিশোধের উল্লাস। কত সহজে প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাজয়ের কাহিনী আশাপূর্ণার কলমে ফোটে ! "ছিন্নমস্তা" ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে লেখা, আরো আগেকার দিনের কাহিনী। কিন্তু "আয়োজন" আজকের দিনের। "ছিন্নমস্তা"তে একটি পুরুষকে ঘিরে দুটি নারীর অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুত্রের মৃত্যুতে শেষ হয়, কিন্তু পুত্রশোকে নয়, নিষ্ঠুর এক জয়োল্লাসের অস্ফুট ভয়াবহতায়।

"আয়োজনে" মাতৃস্নেহ নয়, এখানে আক্রান্ত হয়েছে নাতির প্রতি দাদুর স্নেহ। বাঙালী সমাজে যা নিয়ে আবেগপ্রবণতার সীমা নেই। এই গল্পে দ্বন্দ্ব শ্বশুরে-পুত্রবধূতে। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে শিশু পৌত্র। শ্বশুরের নিষেধ ও শুভবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে অতি-আধুনিক মা ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যায় এবং দাদুর ভয়কেই সত্য করে নাতি জ্বরে পড়ে। এই জ্বরে শিশুটির গোপন মৃত্যুকামনা পর্যন্ত চলে যায় দাদুর অবচেতনে,তীব্র অহংতৃপ্তির জটিল উত্তেজনা। শিশুর জ্বরমুক্তিতেই দাদুর মনে আনন্দের পরিবর্তে আসে এক অদ্ভুত পরাজয়বোধের অবসন্নতা। না, সোমনাথ দানব নন, অতি সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ— সংসারে যাঁর কোনও দাপট আর নেই। অহংয়ের এই ভয়ংকর চেহারাও ফোটাতে আশাপূর্ণার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। বাস্তবে মানুষ কত দুর্বল, কত ক্ষুদ্র, কত অ-মহান্ ! এ-বইতে নেই, কিন্তু প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'স্থিরচিত্র' গল্পটি। মৃতপুত্রের ক্ষতিপূরণের টাকায় মায়ের পুত্রের নামে "স্মৃতিমন্দির" প্রতিষ্ঠার উন্মত্ত স্বপ্নকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবার চরম আনন্দের মুহূর্তে মায়ের হাতে আকস্মিক একটি চিঠি এসে পৌঁছয়। স্মৃতিমন্দিরের বিগ্রহটি মরেননি, বিকলাঙ্গ হয়ে জীবিত আছেন, ঠিকানা জানিয়েছেন। পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না পুত্রের বেঁচে থাকার খবর মায়ের কাছে সেই মুহূর্তে আর সুসংবাদ নয়। "মাতৃত্বের মহিমা"কে ধ্বংস করতে আশাপূর্ণার মত দক্ষতা কম মহিলা লেখকই দেখিয়েছেন — অথচ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি দেখি প্রায়ই বিবেকনির্দিষ্ট নৈতিকতার বাইরে সমাজনির্দিষ্ট সুনীতিবোধকেই মান্য করে চলে। এই এক আশ্চর্য গূঢ় দ্বন্দ্ব আছে আশাপূর্ণাতে।

সমাজ ও সংস্কারের কাছে ব্যক্তি অনায়াসে বলি দেয় তার হৃদয়কে, ইচ্ছাকে, বিবেককে। বাইরের সমাজকে তুষ্ট রাখতে পাপ-পুণ্যের গহন অন্তরীণ সত্যকেও অনেক সময়ে ছেড়ে দিতে হয়। ঘুরে ফিরে আশাপূর্ণার গল্পে আমরা যেমন সমাজের কাছে ব্যক্তির পরাজয় দেখি, তেমনি সেখানে সামাজিক মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত যুক্তিহীন অহংবোধের কাছে হৃদয়নিষ্ঠ নীতিবোধেরও পরাজয় নিঃশব্দে সঙ্গোপনে ঘটে যায় ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় ('আয়োজন' 'ছিন্নমস্তা' 'কসাই' 'স্থিরচিত্র')। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির চাপে প্রায়ই মানবিক সম্পর্কগুলিকে ভেঙে যেতে দেখি।

আশাপূর্ণার নারীচরিত্রগুলি স্মরণীয় নানাভাবে। কিন্তু অনেক সময়েই তারা তাদের "মহত্ত্ব" অর্জন করে আত্মবিলোপের মাধ্যমে ; সমাজের কাছে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে। সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনকামী নায়িকারা নিজেদের শতদুঃখ দিয়েও সমাজের হালটি ধরে রাখেন, তরী বেচাল হতে দেন না। (এখানে অনুপস্থিত 'কসাই' গল্প স্মরণীয় এ প্রসঙ্গে) প্রসঙ্গত মনে পড়ে সেই গল্পটিও, পাগলস্বামী বিয়েবাড়িতে আত্মহত্যা করার পর, যে আশ্রিতা ভগ্নী চিলেকোঠাতে ঢুকে সারারাত শব আগলে দরজা বন্ধ করে রাখে, যাতে ভাইঝির বিবাহবাসরটি পন্ড না হয়ে যায়। (এ বইতে নেই) বা জেলফেরৎ স্বামী গ্রামে ফিরে এলেও তাকে না-চেনার ভাণ করে পুত্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করে যে স্ত্রী। তারপরে দীঘিজলে আত্মহত্যা করে সেই পাপমোচনের পথ খুঁজে নেয়। (এ বইতে নেই) না, ছোটগল্পে দুর্বার প্রতিবাদী নয়, দুর্বার সত্যবাদী আশাপূর্ণার নির্ভীক লেখনী। জীবনে যা ঘটে, যা ঘটতে উনি দেখেছেন,সেই ছবি। যা ঘটলে ভালো হয়, যা ঘটা উচিত, তার চিত্র নয়। আশাপূর্ণা নিজেই বলেছেন— "আগে যাঁরা লিখতেন তাঁরা মোটামুটি সবাই আদর্শপ্রধান লেখা লিখতেন, অর্থাৎ সেখানে বলা হত, 'এরকম হওয়া উচিত'। আমি বরাবরই লিখি, 'এরকম হয়'। 'এরকম হওয়া উচিত' একথা বলি না।" আশাপূর্ণা অবশ্য "কী হয়" সেই সত্য উদঘাটনেই থেমে থাকেন না— উপন্যাসে এগোন আরো একটু, "কেন হয়" এই প্রশ্ন করা পর্যন্ত। "যা হয় আমি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয় ?...'কী হয়' সেটাই বলবার। 'উচিত' বলবার আমি কে ?" এমন সহজে শিল্পীর সততা বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করা শুধু আশাপূর্ণাকেই সাজে। তিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেননি। নীতিকথা লিখতে বসেননি। লিখছেন জীবনের স্থিরচিত্র। "আমার যা আদর্শ তা থেকে সরে আসিনি কখনও। যা লিখেছি সবই মধ্যাবত্ত জীবনের গন্ডি থেকে দেখা। বাইরের চেহারা আর ভেতরের চেহারা দটোর মধ্যে হয় তো আকাশপাতাল তফাৎ। সেইটাই অনেক সময় আমার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি। সমাজসেবিকাদের নিয়েও নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে।" আশাপূর্ণার মতে—"সাহিত্যিকের কাজ হল নিজেকে প্রকাশ করা। প্রতিকারের চিন্তা করা সাহিত্যিকের কাজ নয়।" সত্যকে প্রকাশ করার ধরনের মধ্যেই আছে তার সমালোচনা। প্রতিকারের চিন্তা তো পাঠকের। আশাপূর্ণার বিষয়বস্তু—"মিলন বিরহ প্রেম বা প্রেমভঙ্গ নয়, তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠাপটে বন্ধনজর্জরিত মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণাকে ধরে রাখতে" চাওয়া। এই যন্ত্রণা নানা মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে আশাপূর্ণার নিখুঁত কারিগরিতে। অত্যন্ত হালকা চালে নেহাৎ ঘরোয়া দৃশ্যাবলীর মধ্যে তিনি জীবনের অতলান্ত নিষ্ঠুরতার কঠিন শীতল স্পর্শ পাঠকের অস্থিমজ্জায় পৌঁছে দেন। কিছুক্ষণের জন্যে বুঝি সাড় থাকে না। আশাপূর্ণা অত্যন্ত সচেতন বাক্‌শিল্পী। প্রতিটি কমা, দাঁড়ি, বিস্ময়বোধক চিহ্ন তিনি হিসেব কষে বসান। শব্দসংযমে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তেমনি সংযত তিনি বিষয়বস্তু চয়নেও। 'কাল' উত্তাল, দুরন্ত, মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল। এবং বিতর্কিত ও অগ্নিগর্ভ। .... তবে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে আগুনের কিছুটা

প্রকাশের চেষ্টা তো আছেই, তার বেশি নয়। আমি কখনও আমার জানা জগতের বাইরে পা ফেলতে যাবার চেষ্টা করি না।"

স্ফুলিঙ্গগুলিকে ধরবার উপযুক্ত শব্দভান্ডার আশাপূর্ণার অফুরন্ত। অতি সহজ, সর্বদা ব্যবহৃত, পরিচিত ঘরোয়া শব্দগুলিই তাঁর প্রয়োগের গুণে শাণিত, তীক্ষ্ণ তীরের মত লক্ষ্যভেদ করে। পাঠকের বোধ ও মননকে একযোগে বিদ্ধ করতে তাঁর জুড়ি নেই। আশাপূর্ণার আপাত-সাধারণ বিষয়বস্তু তাঁর আপাত-সহজ ভাষার মতই এক প্রতারক প্রচ্ছদ মাত্র যা তাঁর নির্দয় সত্যদর্শনের শক্তি, নগ্ন বাস্তববোধ এবং তীক্ষ্ণ মেধাকে আধো ঘোমটার আড়ালে রহস্যময় করে রাখে। ভয়াবহ অহংবোধ কীভাবে মনুষ্যত্বকে, মানুষী সম্পর্কগুলিকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেয়, মায়ের পুত্রস্নেহ, বা পিতামহের শুভাকাঙ্ক্ষার চেয়েও যে প্রবল হয়ে উঠতে পারে হৃতপ্রায় সামাজিক কর্তৃত্ববোধের মোহ, সেই নির্মম সত্য সংসারে আমরা দেখেও দেখতে চাই না। কিন্তু আশাপূর্ণা তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। 'স্বর্গের টিকিট' গল্পে চামেলী গায়ে আগুন দেয় তার জেঠীর রসিয়ে রসিয়ে দুঃসংবাদটি পরিবেশন করার ফলে। অন্যভাবে খবরটি পেলে সে কী করতো বলা যায় না! আশাপূর্ণার লেখাতে মেয়েদের যেমন চরম যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা আছে, তেমনি আছে চরম সূক্ষ্ম অত্যাচার করার শক্তিও। 'ছুটি নাকচ' আরেকটি অত্যাশ্চর্য কাহিনী— যেখানে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে মনিববাড়ির মেয়েটিকে বাঁচাতে হাসপাতাল থেকে ছেলে চুরি করতে গিয়ে জেলে যায় বাড়ির কাজের মেয়েটি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে দেখে গ্রামের শ্বশুরঘরে আর জেলফেরৎ মেয়েমানুষের ঠাঁই নেই— যদিও সেই জেলে যাওয়ার সুফল, অর্থানুকূল্যটুকু তারাই ভোগ করেছে। ছুটি পেয়ে পুনর্মিলনের যে আনন্দ, স্বামী-পুত্রের যে মমতার আশ্রয়টি সে আশা করছিল তার পরিবর্তে অপেক্ষা করে আছে সামাজিক কলঙ্কের আতঙ্ক, ঘৃণা, অস্বীকৃতি। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হয় না— শেষ হয়, এক গভীরতর মানবিকতার আশ্বাসে, যেখানে বিধিবদ্ধ সামাজিক আশ্রয়টুকু হারালেও এই বিপুল জগৎ সংসারে মেয়েটি নির্বান্ধব হয়ে পড়ে না। জীবন ফুরিয়ে যায় না। একটি নবীন মিত্রতার সংকেতে, নতুন পথে, জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হয় তার।

আশাপূর্ণার ছোটগল্পে একটি ব্যাপার নজর কাড়ে। নায়িকারা প্রায়ই কপটাচার দ্বারা জগৎ সংসারে শান্তি রক্ষা করেন, নীলকণ্ঠের মতো সংসারে অপ্রিয় সত্যের বিষটুকু নিঃশব্দে পান করে নিয়ে। কামিনী রায়ের সেই বেদনা যেন আশাপূর্ণার নারীচরিত্রগুলির জীবনে প্রস্ফুট— "জীবনে ও কপটাচরণে শেষে আর ভেদ নাহি রবে"। তফাৎ এই যে এখানে নারীরা জেনেবুঝে সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়ে কপটাচার করেন। স্বার্থে নয়, পরার্থে। সমাজ সংসারকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে। আশাপূর্ণার লেখনীতে নারীর এই কাপট্য কখনও মধুর, কখনও বিষণ্ন, কখনও ভয়াবহ, কখনও দুঃসাহসিক, কিন্তু জগৎসংসারের পক্ষে সর্বদাই উপকারী। অথচ এমনই এক ছোট উপকারী কাপট্যের কারণে নোরাকে তার পুতুলের ঘর ভেঙ্গে দিতে হয়েছিল! আশাপূর্ণার

নারীরা দু' ধরনের কপটাচার করেন— এক, যেখানে অন্যের মঙ্গলের জন্যই অন্যকে প্রতারণা করা হচ্ছে। আর যেখানে সমাজকে খাজনা যোগানোর উদ্দেশ্যে নিজেকেই প্রতারণা করা হচ্ছে। আশাপূর্ণার বালিকা থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সব নারী চরিত্রই এধরণের সদর্থক কপটতায় সিদ্ধহস্ত।

যদিও আশাপূর্ণা বলেন তিনি চরিত্রকেন্দ্রিক, চরিত্রনির্ভর গল্প রচনা করেন, কার্যত দেখা যায় তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে সমাজই আছে মুখ্য ভূমিকায়। সমাজই নায়ক। দৃশ্যত যদিও প্রাধান্য পায় মানুষ। তার নানা বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জট নিয়ে সমাজের ফাঁদে-পড়া অসহায় মানুষ। কিন্তু সুতো টানছে অন্তরালে সমাজ। আশাপূর্ণার ছোটগল্পে নারীরা সংস্কারমুক্ত নয়, তারা সংস্কারের কাছে হার মানে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কারকে অন্তর থেকে 'মান্য' করে না। সংস্কারের অনর্থক অত্যাচারের দিকটি আশাপূর্ণা তুলে ধরেন বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দিয়ে নয়, বিনষ্টির উদাহরণ দিয়ে ('একটি মৃত্যু ও আরেকটি', 'পরাজিত হৃদয়,' 'কার্বন কপি')। তাঁর চরিত্রগুলি স্বাধীন নয়, দ্বিধাহীনও নয়, তারা জীবনের সিন্ধুতীরে স্বেচ্ছাবিহার করে না, সমাজশৃঙ্খলিত বন্দীজীবন যাপন করে যায়। নিজেকে ও নিজের প্রিয়জনদের ধ্বংস করে ফেলে তারা সংসারে সমাজের ও সংস্কারের জয়পতাকা ওড়ায়। যা তাদের প্রাণ চায়, তা না-করে বরং উলটোটাই করে। কেননা সমাজ তাই চায়। অনড় সংস্কার এবং অহংবোধ এই দুটি বিষ চরিত্রগুলির 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে'— তা থেকে তারা মুক্ত হবার চেষ্টা করে না।

সেখানেই তাদের দুর্বলতা—নিজেদেরই দুর্বলতার শিকার তারা। তাদের বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদেরই কামনা বাসনা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে। জীবনের বিরুদ্ধে। ঘটনার মাধ্যমে ফুটে ওঠে মনুষ্যচরিত্রের জটিলতা, আর চরিত্রের মধ্যে শোনা যায় সমাজের অনুশাসনের চাবুক হাঁকড়ানোর নেপথ্য শীৎকার। নির্জন প্রবাসগৃহে পুরোনো প্রণয়ীর অবস্থিতিতে রাত্রিবাস দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে আপাত-আধুনিকা উত্তর ত্রিংশতী ডিভোর্সির পক্ষে ('কার্বন কপি')। ধর্ষিতা সন্তানকে কোল দিতে সাহস পান না শোকার্ত আধুনিক বাবা মা ('পরাজিত হৃদয়')। যেমন নির্দোষ জেনেও জেলফেরৎ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে গ্রাম্য স্বামী ('ছুটি নাকচ')। বৃথা লোকলজ্জার ভয় এড়াতে স্বেচ্ছায় বাল্যবন্ধু আপনভোলা দেবরটিকে গৃহহারা করেন এবং নিজেও চিরনিঃসঙ্গ জীবন্মৃত হয়ে যান এক প্রৌঢ়া বৌদিদি ('একটি মৃত্যু ও আরেকটি')। দেওরের সঙ্গে মামলা চালিয়ে সমাজে মুখরক্ষা করেন আরেক বিধবা বৌদিদি ('হাতিয়ার')। জামাইয়ের মৃত্যুসংবাদ বুঝেও না-বোঝার ভাণ করে নেহাৎ তরুণী মেয়েকে একটি বিয়েবাড়ির উৎসবসন্ধ্যা উপহার দেন জননী— কিন্তু সমাজশাসিত পিতা মায়ের এই ছলনাটুকু মার্জনা করতে অক্ষম হন ('বঞ্চক')। নাতির স্বাস্থ্য নিয়ে ভীত ঠাকুর্দার জীবনে একটা মুহূর্ত আসে যখন নাতির জীবনের চেয়েও নিজের অহং তাঁর কাছে বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে ('আয়োজন')। একমাত্র পুত্রের জীবনের চেয়েও পুত্রবধূর বৈধব্য শাস্তি বেশি পছন্দ হয় কখনও ক্ষুব্ধ অপমানিতা শাশুড়ির জীবনে ('ছিন্নমস্তা')। এই সব কঠোর কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় গল্প বাংলাসাহিত্যে কমই আছে।

এখানে নবীন প্রজন্মের নাগরিক জীবনযাত্রা নিয়েও বেশ কিছু গল্প আছে ('সবদিক বজায় রেখে', 'বে-আব্রু', 'স্বর্গের টিকিট', 'বড় রাস্তা হারিয়ে', 'বাড়ির নাম শুভদৃষ্টি', 'ঘূর্ণমান পৃথিবী', 'আয়োজন','কার্বন কপি' ইত্যাদি)। আশাপূর্ণার লেখনীতে মস্তানদের বুলির অপভাষাও যেমন স্বচ্ছন্দে চলে এসেছে, কোথাও আড়ষ্ট ঠেকেনি, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাবিত নতুন বাঙালির সায়েবিআনাও এসেছে নিতান্ত সহজভাবে। এঁরা দ্রবময়ী ('ভয়') জয়াবতী ('ছিন্নমস্তা') দের চেয়ে কম জীবন্ত নন। 'জগন্নাথের জমি' গল্পটি আলাদা তারে বাঁধা; প্রায় প্রতীকী স্বচ্ছতায় এক আশ্চর্য শিল্পমানে উন্নীত হয়েছে।

এ বইয়ের প্রধান চরিত্র গুণ এর বৈচিত্র্য। গল্পগুলির মধ্যে অমিলই এই সংকলনটির মূল্যবৃদ্ধি করে। পঁয়ত্রিশ বছরের তফাতে আশাপূর্ণা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়কে ধরে রাখতে পেরেছেন তাঁর এই স্বনির্বাচিত কুড়িটি গল্পে। ১৯৯১ সালের গোড়া পর্যন্ত দেড়হাজারেরও বেশী ছোটগল্প লিখেছেন আশাপূর্ণা— মাত্র ছাব্বিশটি সংকলন আছে তাঁর গল্পের—বাকি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে গেছে অসংকলিত। দেড়শোর বেশি উপন্যাস লিখেছেন। রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কারগুলি তিনি পেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের জন্যই, কিন্তু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রেম ছোটগল্পই।

'গতানুগতিক', 'ছাঁচ' শব্দগুলি আশাপূর্ণার অভিধানে নেই। তাঁর চরিত্রগুলি কেউই ছাঁচে গড়া নয়— কেউ গড়া সমাজের শাসনে, (যেমন 'পরাজিত হৃদয়') কেউবা প্রকৃতির শাসনে (যেমন 'দ্রবময়ীর মৃত্যুভয়')। আশাপূর্ণা নিজে মনে করেন তিনি চরিত্র ঘিরেই গল্প গঠন করেন। ঘটনাপ্রধান,আবহপ্রধান নয় চরিত্রপ্রধান,— এভাবে ভাগ করতে বসলে এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প হয়তো চরিত্রপ্রধান মনে হবে। কিন্তু কতগুলি গল্পে ঘটনাই প্রধান, চরিত্রের চেয়ে। সমাজের নগ্ন চেহারাটি শুধু চরিত্রের মাধ্যমে নয়, পরিস্থিতির মাধ্যমেও (একটি পরিস্থিতিতে একটি চরিত্র কীভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়) তিনি উপস্থিত করেন। নবীন প্রজন্মসংক্রান্ত কাহিনীগুলি সবই পরিস্থিতিপ্রধান— এসব গল্পে ব্যক্তিচরিত্র নয়, যুগচরিত্র চিত্রণই তাঁর উদ্দেশ্য। আশাপূর্ণার ঝরঝরে নির্মেদ ছোটগল্পগুলি একান্তভাবেই নাগরিক, অন্তরে বাইরে আধুনিক। তাতে যেমন নিসর্গ নেই তেমনই নেই অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া অথবা ধর্মবিশ্বাসের ছুৎমার্গ। ধর্মের প্রসঙ্গ যেখানে আসে, তাতে থাকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। হিন্দুয়ানির অপশাসনের হতশ্রী দিকটিকেই তিনি উন্মোচন করেন। সংসারে যখন সংস্কারের, আচার-বিচারের কঠোরতা মনুষ্যত্বের হানি ঘটায়, বা ধর্ম যখন কপটতার অন্যনাম হয়ে দাঁড়ায়, আশাপূর্ণার তীক্ষ্ণ লেখনীতে তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনযাপনে আশাপূর্ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার যাবতীয় ধর্মীয় আচার কঠোরভাবে পালন করেন —ঠিক তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মতই—সমাজনির্দিষ্ট আইনমাফিক। যুক্তি বুদ্ধি মনন যাই বলুক, সমাজের চার দেওয়ালের যে জগৎকে তিনি মেনে নিয়েছেন তার নিয়ম থেকে সরে আসা নয়। শিল্পের সঙ্গে জীবনের মিল ঘটাতে গিয়ে আচারের সঙ্গে মননের এই দ্বন্দ্ব আশাপূর্ণার নারীদের চিরন্তন যুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণার জোর চীৎকৃত অতিকথনে নয়, নিচু গলার স্বল্পভাষণে। একাজে ছোট গল্পের তুল্য শক্তিশালী আধার গদ্যে আর কী বা আছে ? লেখিকা এখানে ১৩৬১ থেকে ১৩৯৬ পর্যন্ত প্রকাশিত কুড়িটি গল্প রেখেছেন। নির্বাচনের ভিত্তি তাঁর ভালো লাগা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের অনুরোধে মাত্র একমাসের মধ্যেই তিনি গল্পগুলির নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন শুনেছি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সময় ব্যবধান আছে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে। লেখিকার ভাষার বদল এবং থীমের বদল চোখে পড়ে যেমন, ঠিক তেমনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ক্রমশ-বদলে-যাওয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়শীল কাঠামোটি। অশিক্ষিত জাঁদরেল শাশুড়িদের স্থূল অত্যাচারের যুগ থেকে ('ছিন্নমস্তা') আমরা এসে পড়েছি সুশিক্ষিত জাঁদরেল পুত্রবধূদের সূক্ষ্ম অত্যাচারের যুগে ('ঘূর্ণমান পৃথিবী')। আশাপূর্ণার কলমের সহানুভূতি কার সঙ্গে ? যখন যে নিষ্পিষ্ট, যখন যে অত্যাচারিত, যে মানুষটি চাকার নিচের দিকে-তারই সঙ্গে। কখনও সে যুবতী বউ, কখনও বিধবা শাশুড়ি, কখনও বা বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ শ্বশুর। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনও পক্ষই নেন না তিনি। তাঁর কাজ কেবল ছবিটি তোলা। পক্ষ নেবার ভার পাঠকদের ওপর। আশাপূর্ণার ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন এবং ইতিহাস দুটোই ধরা আছে, কিন্তু স্লোগান নেই, পোস্টার নেই। জীবনের নিষ্ঠুরতম সত্যগুলি, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনার কাহিনীগুলি তিনি যেন ছোট ছোট নুড়ির গায়ে নরুন দিয়ে খোদাই করে কালস্রোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বড়ো কথা ছোটো করে বলায় তিনি ওস্তাদ, মনুষ্যজীবনের বড়ো বড়ো ধাককাগুলিকে ছোটো গল্পের ছোটো পরিসরের মধ্যে ধরে ফেলায় তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য।

নবনীতা দেব সেন

সবদিক বজায় রেখে

পড়ন্ত বিকেলে মেঘলা আকাশের ঘোলাটে ছায়ায় ঘরের মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বুতান তাই জানলার ধার ঘেঁসে বসে শেলেটে ছবি আঁকছে। শেলেটে ছবি আঁকতেই ভালোবাসে বুতান, অপছন্দ হওয়া মাত্রই ডাস্টার ঘষে বিলীন করে ফেলা যায়। আবার নতুন রেখা পড়ে।

মাকে ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখলো বুতান, আর চমকে উঠে বললো, মা ! তুমি এইমাত্তর আপিস থেকে এসেই আবার বেরোচ্ছ ?

তনিমা বললো, হ্যাঁরে, একটু ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

ডাক্তারখানায় ? কেন ? কার অসুখ করেছে ?

আরে বাবা অসুখ নয়, কদিন ধরে ভীষণ মাথা ধরছে, চোখটা একটু দেখাতে যেতে হবে।

তোমার তো চশমা রয়েছে। নতুন সুন্দর চশমা।

ওই তো ওইটাই ঠিক লাগছে না। তাই ডাক্তারবাবুকে বলতে যাচ্ছি।

বারে আমি বুঝি একা পড়ে থাকবো ?

একা আবার কী ? মালতীমাসি রয়েছে না ?

ও তো পচা।

এই ! চুপ ! খবরদার এসব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে না। তুমি মালতীমাসির কাছে দুধটা খেয়ে নিও। লক্ষ্মী হয়ে থাবে বুঝলে ? মালতীমাসি যেন তোমার নামে নিন্দে দিতে না পারে।...

মার গলার স্বরটা মৃদু হয়ে আসে, দেখেছো তো আমি ফিরে এলেই মালতীমাসি তোমার নামে নিন্দে দেয়। বলে, 'খুকু দুধ ফেলে দিয়েছে !... খুকু ডিম খায়নি, ভেঙ্গে গেলাসের জলে গুলে দিয়েছে !... খুকু আমার একটাও কথা শোনেনি...।'

'খুকু' সতেজে বলে, ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারো না ?

এই ! আবার ! চুপ ! ছাড়িয়ে দিলে চলবে কী করে ? লোক পাওয়া যায় ? নইলে দিতে তো ইচ্ছে করে। দায়ে পড়েই রাখা।

সাড়ে চার বছরের মেয়েটাকে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আস্বাদন করিয়ে তনিমা, এখন গলা তুলে বলে, গুড্ গার্ল হয়ে থাকবে। মালতীমাসিকে একদম জ্বালাতন করবে না ! দুধ খেয়ে নেবে।... আচ্ছা টা টা !

বুতান অনিচ্ছাভরে একবার 'টা টা'র ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ে। যেটা দেখলেই মনে হয় 'না না।' পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ওঠে, কখন আসবে ?

আরে বাবা সেকি ঠিক করে বলা যায় ? বাস পাওয়া যায় না, রাস্তা জ্যাম, ডাক্তারখানায় লোকের ভিড় তিন ঘন্টা বসিয়ে রাখে—

ও। বুঝেছি। তার মানে দেরি করবে। আচ্ছা আচ্ছা আমিও দুধ খাবো না। মালতীমাসির কথা শুনবো না।

বুতান, দিন দিন ভারী অসভ্য হয়ে যাচ্ছো তুমি ? কেন, তুমি জানো না, এসব হয় ? তোমায় নিয়ে বেরোই না ? দেখো না ? আমাদের কি গাড়ি আছে ?

ঈস। বাপীটা যা না একখানা । একটা গাড়ি কেনে না !

তনিমা চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে উৎসাহচাপা, চাপাগলায় বলে, বলিস না তোর বাপীকে। খুব করে বলবি।

বললেই যেন শুনবে বাপী ! বাপী যা না একখানা ! আমাদের ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে।

মা থমকে বলে, তারা স্কুলবাসে আসে না ? গাড়িতে আসে ?

আহা ! তা কেন ? ওদের বাপীদের বুঝি আপিস যেতে হয় না ? তো অন্যসময় তো ওদের মা, গাড়িটা নিয়ে যতো ইচ্ছে বেড়ায়। ওরাও বেড়ায়।

একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়ায়। তোর মার ভাগ্যে আর তা হয়েছে। আচ্ছা চলছি। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। মনে আছে তো ? একদম গুড গার্ল হয়ে—

মা অন্যমঞ্চে এসে দাঁড়ায়।

মালতী, তুমি শুধু শুধু বসে আছো কেন ? এইসময় রুটি টুটিগুলো করে নিলেই তো হয়।... রোজই তো দেখছো সন্ধ্যে হলেই লোডশেডিং।

মালতী যেমন বসে ছিল সেইভাবেই বসে থেকে, পোজ দিয়ে একটা গা মোচড় দিয়ে বলে, বিকেলের সময় কিচেনে ঢুকতে মন লাগে না ! লোডশেডিঙের জ্বালায় টি.বি. দেখা তো ঘুচে গেছে। সাততাড়াতাড়ি রান্না সেরে কী সগগো লাভ হবে ? দুটো মোমবাতি রেখে যান।

একগোছা মোমবাতি তো চায়ের বাসনের তাকে রাখাই রয়েছে। আর শোনো— দেখছো তো 'ইনভার্টারটা' কদিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারেন্ট চলে গেলে খুকুর ঘরে একটা কেরোসিন আলো জ্বেলে দিও।

সে অতো বলতে হবে না। আপনি আসবে কখন ?

তনিমা হঠাৎ ঈষৎ কঠিন সুরে মনিবানীর গলায় বলে, সে আমি তোমায় বাক্যদত্ত হয়ে বলে যেতে পারছি না ! দেরি হলে খুকুকে ঠিক সময় খাইয়ে দেবে।

খেলে তো ! যা মেয়ে ! শুনবে আমার কথা ?

আচ্ছা ঠিক আছে। বাচ্চাকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয় মালতী। যাক কেউ 'বেল্' বাজালেই হুট্ করে দরজা খুলে দেবে না, পাশের দিকের জানলা দিয়ে দেখে নেবে। আর দুম করে বলে বোসো না 'বাড়িতে কেউ নেই।' বলবে বৌদিদি একটুখানির জন্যে

বেরিয়েছে, আর দাদাবাবু এক্ষুনি অফিস থেকে আসবে।

মালতী টাইট ফিট ব্লাউস আর পেট বার করা স্টাইলে শাড়ি পরা শরীরটাকে আর একবার মোচড় খাইয়ে বলে, ও কথা তো আপনি রোজই পাখি পড়া করে বলে যাও বৌদিদি। আবার বলার কী আছে ?

'বৌদিদির' মুখটা কালো হয়ে যায়। সেই কালচে স্বরেই বলে, তবু ভুলে যেতেও তো কসুর দেখি না। আচ্ছা, এসে দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে যাও।

মালতী একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের বাড়ির এই এক ফ্যাচাং। দরজা লাগাও, দরজা খোলো। ফেলাটবাড়ির দরজা কেমন ঠেকিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা যে যখন ফেরে নিজে চাবি খুলে ঢুকে আসে। 'কাজের লোকেদের' কোনো ঝামেলা নাই।

হুঁ।

তনিমা রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে যায়। রাগ ওই দুর্বিনীত মেয়েটার ওপর, রাগ বরের ওপর। রাগ 'দেশের বাড়ি বাসিনী' শাশুড়ির ওপর ! আশ্চর্য জেদি মহিলা। নিজে 'দেশের বাড়িটা দেখাশুনোর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে' বলে সেখানেই গিয়ে পড়ে আছেন, (অবিশ্যি 'গেছেন' সেটা তনিমার ওপর ভগবানের দয়া। সর্বদা মাথার ওপর জাঁতা ! বাপস !) কলকাতার এই পচা বাড়িখানা বিক্রি করতেও দেবেন না। হলেও আজেবাজে প্যাটার্নের একতলা একটা বাড়ি, তবু রাস্তার ধারে— এতোখানি জমিসমেত বাড়ি কি আজকালকার দিনে সোজা দাম মিলবে ?.. তা নয় ছেলের কাছে কাঁদুনি 'তোর বাবার সাধ ছিল দোতলা তোলবার। বলেছিলেন, 'অলক যদি পারে।' সে যদি তুই নাও পারিস বাবা, আমি বেঁচে থাকতে বেচাবেচি করিসনে। আমি মরলে যা খুশি করিস।'...

...যেন উনি এক্ষুনি মরছেন ! ইস্পাতের শরীর। তো মাতৃভক্ত পুত্তুরের তার ওপর আর একটি কথা নয়।... যুক্তির বালাইমাত্র নেই। আমি যদিবা ও বিষয়ে একটু কথা তুলেছি—মুখ চোখের ভাব এমন হয়ে উঠবে, যেন ওনার মাকে খুন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।.. ওনার দিকে যুক্তি কী ? না 'যদি কখনো মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতায় চলে আসতে চান ? এ বাড়ির পাট উঠিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থাকলে, মা এসে উঠবেন কোথায় ?' যেন ফ্ল্যাটের দরজায় তাঁর 'প্রবেশ নিষেধ' লট্‌কে রাখা হবে।...

আসলে সেকালের বুড়োবুড়িদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা কোনো 'সেন্টিমেন্ট' খাড়া করে, পরবর্তীদের হাত পা বেঁধে রাখা। তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক। এ স্রেফ্ মনস্তত্ত্বের একটি জটিল তত্ত্ব। যেটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারি, তাই প্রয়োগ করেই ওদের সুখের হন্তারক হই।

এই বাড়িটা বেচে দিলেই একটা সুন্দর ফ্ল্যাট আহরণ করা যায়। হয়তো 'উদ্বৃত্তও' কিছু থাকতে পারে, যা মূলধন করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির স্বপ্ন দেখা যায়।

দূর ! কিস্যু হবে না ।

উঃ । যা দেরি হয়ে গেল ।

অলকই হয়তো আগে এসে পড়বে। মাত্র দু'মিনিট আগে এলেও অনায়াসে বলবে 'একঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি ।'

'মুক্তাঙ্গনে' একটা নতুন নাটক এসেছে, বড়দি খুব প্রশংসা করল সেদিন, সেই থেকেই দেখার ইচ্ছে ।

কিন্তু তনিমার পক্ষে ইচ্ছেপূরণ কি সহজ ?

বরকে জপানো, বাড়িতে ছল-চাতুরি । ওই যা একখানি মেয়ে হয়েছেন । মা কোথাও বেরোচ্ছে দেখলেই যেন হাপসে পড়েন মেয়ে । 'ডাক্তার দেখানো', 'মেজমাসির শরীর খারাপ দেখতে যাওয়া' এমনি যা হোক বানিয়ে তবে রেহাই । সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি শুনলে সাড়ে চার বছরের ধাড়ি মেয়ে হাঁ হাঁ করে কাঁদতে বসবে।

আর তার বাপটিও তেমনি ।

বলা হবে টিভিতে তো রাতদিনই সিনেমা থিয়েটার নাচ গান সব কিছু দেখছো । হিন্দি বাংলা ইংরিজি । আবার ছুটে ছুটে দূরে যাওয়ার দরকার কী ?

এই মানুষকে নিয়ে ঘর করা ।

এ দিন আবার বলা হলো, কেন সেদিন তোমার বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখে এলেই পারতে ? রাতদিন তো ফোনে কথা চলে । কী রকম রাগটা হয় ?... যখন মেজাজ দেখিয়ে বললাম, 'কেন ? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা ? যে সব সময়ে পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে ?' তখন তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে আনলো ।.... তাই কি নিশ্চিন্ত সুখ বলে কিছু আছে ? এই যে যাচ্ছি—বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে গপপো বানাতে হবে—'বাস খারাপ হয়ে কিম্বা হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল । নয়তো ডাক্তারের চেম্বারেই তিন ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছিল ।' আর সঙ্গে সঙ্গে ওই পাজিটা বলতে বসবে—আপনি যখন যেখানে যাবে, মেয়েকে নিয়ে যেও বৌদিদি । ওকে 'মেনেজ' করা এই মালতী মন্ডলের কর্ম নয় ।

'কর্ম নয় ।' ইয়ার্কি ? যেন শুধু এই আড়াইখানা লোকের রান্নাবান্না করার জন্যে তোকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে, চার বেলা রামরাজত্ব করে খাওয়া, আর আরাম আয়েস, সাজসজ্জা, টিভি দেখা, ইত্যাদি দিয়ে রাখা । তার ওপর আবার জল ঘাঁটলে ওনার হাতে হাজা হয় বলে, বাসন মাজা কাপড় কাচার জন্যে আলাদা একটা লোক রাখা । অন্য অন্য বাড়িতে তো দেখি—একটা লোকই জুতো সেলাই চন্ডী পাঠ সবই করে । ...অবিশ্যি হাজা ফাজা হলে বিশ্রী লাগে । সর্বদা খাবার জিনিসে হাত । তো কাজ কমানোয় একটু কৃতজ্ঞতা আছে ?

মিনিবাসটা চট করে পেয়ে গিয়েছিল এই যা ভালো । তবু বাসে বসে তনিমা অবিরত আপন দুর্ভাগ্যের আর জ্বালার হিসেব কষে চলে । আর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে ।

ঠিক তাই । সন্ধ্যে হওয়া মাত্রই ফস করে বিদ্যুৎ বিদায় নিলো । সঙ্গে সঙ্গেই বুতান তীক্ষ্ণ

আর্তনাদ করে উঠলো, এই মালতীমাসি, শিগগির আলো আনো।... আঃ! দেরি করছো কেন? মালতীমাসি—

মালতী একটা আধখানা ভুশোপড়া চিমনি পরানো জ্বলন্ত কেরোসিন ল্যাম্প সাবধানে হাতে ধরে এনে বললো, বাবাঃ বাবাঃ! উড়ে আসবো না কী? এই জন্যেই তো তোমার মাকে বলি, আপনার 'ইনর্ভাটার' আলো না থাকলে যেদিন সন্ধ্যের মুখে বেরিয়ে যাবে, একটা কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে রেখে যেও।... তো শুনিয়ে দেবে—'কেরোসিন বুঝি খুব শস্তা?' এ দিকে মেয়ে যে ছিঁচকাঁদুনী!

কী? আমায় ছিঁচকাঁদুনী বলা হচ্ছে? তোমার বুঝি ছোটবেলায় বাড়িতে কেউ না থাকলে আলো নিভে গেলে ভয় করতো না?

মালতী ল্যাম্পটাকে সাবধানে টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে, পলতেটা উস্কে দিয়ে বলে, আমার? হেঃ। আমাদের আবার ঘরে কেউ নাই এমোন হতো নাকি? সর্বদাই তো ঘরে লোক গিসগিস!... মা বাপ পিসি ঠাকুদ্দা, আর আমরা পাঁচটা. ভাইবোন। ছিলো না শুধু ঠাকুমা।

পাঁচটা ভাইবোন!! য্যাঃ।

পাঁচটাই তো। দুটো ভাই, তিনটে বুন।

ওঃ। নিজের খুব মজা ছিলো কি না। তাই আমায় ছিঁচকাদুনী বলা হচ্ছে। মাকে বলে দেব।

দিবি তো দিবি। তোর মা আমায় ফাঁসি দেবে না কী?

অ্যাই! তুমি আমায় 'তুই' বলছো যে? তুমি কাজের লোক না?

শোনো কথা। কাজের লোক তা কী? এইটুকু একটা পুচকে মেয়েকে 'আপনি আজ্ঞে' করতে হবে নাকি?

কেন? 'তুমি' বলতে পারো না? দেখো মাকে বলে দিলে, মা তোমায় ছাড়িয়ে দেবে।

মালতী নিজস্ব ভঙ্গিতে শরীর মোচড় দিয়ে বলে, ওমা! এইটুকু মেয়ে, যেন পাকা ঝিঁকুটি। ছাড়িয়ে দেবে তো দেবে। আমার যেন আর কাজ জুটবে না! ওই নতুন ফেলাটবাড়িগুলো থেকে তো হরদম ডাকে।

ঝটকা মেরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বুতান চেঁচিয়ে ওঠে, আঃ। মালতীমাসি চলে যাবে না বলছি। এই আলোয় আমার বিচ্ছিরি লাগে।

তো আমি কী করবো? এখেনে বসে থাকলে আমার চলবে? কাজ নাই? তোমার মা তো এসে মাত্তরই প্যাঁচাল পাড়বে, এটা হয়নি কেনো? ওটা হয়নি কেনো?'

চলে যায়।

আর পরক্ষণেই বুতান রান্নাঘরে চলে আসে।

মালতীমাসি, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।

মালতী ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তা এখানে কী ? তোমার ঘরে বোতলে ফোটানো জল নাই ?

না। আমি এখানের জল খাবো। ফ্রীজের জল।

তা আর না। তারপর মা আসামাত্তরই বলবে, 'মা মালতীমাসি আমায় ফ্রীজের জল দিয়েছে।' তোমায় চিনি না আমি ?

তা চিনলেই বা কী ! বুতানের যে এখন এখানেই থাকা দরকার। একটা মানুষের সান্নিধ্যে। আর সে সান্নিধ্যটা বিলম্বিত করতে উপায় হচ্ছে কথা চালিয়ে যাওয়া।... সে কথার মধ্যে যে শুধু বুদ্ধির প্রকাশই থাকবে তা তো হয় না।...

তাই মালতীর আরো কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় বুতান, আহা মা বুঝি বলে না, 'মালতী কী কী করেছে এতোক্ষণ ? তোকে কী খেতে দিয়েছে সব বল ?' আচ্ছা মাকে বলে দেব না —আমায় একটু ফ্রীজের জল দাও। মোটেও বলবো না।

মালতী চাকি বেলুন পেড়ে বসে মিচকে হেসে বলে, বলবে না। শুধু মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুক-খুক কাশবে, আর বলবে, ঠান্ডা জল খেয়েছি কি না তাই কাশি হয়েছে। হাড় বিচ্ছু ঘুঘু মেয়ে। জানি না আমি ?

মালতীমাসি ! বুতান সতেজে বলে, তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছো ?

মালতী ঢোক গিলে বলে, শোনো কথা। গালাগালি আবার কী ? ও তো ঠাট্টা !

ঠাট্টা ! আহা।

বুতানের মুখে একটু দেবদুর্লভ হাসি ফুটে ওঠে, আমায় যেন বোকা পেয়েছে।...

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এখন বকবক থামাও তো। লেখাপড়া করোগে না !

লেখাপড়া ! সেই একা ঘরে ! ভুশোপড়া চিমনি ঢাকা আলোর নীচে ? আধা ছায়া আধা আলোয় !

এখানেও মোমবাতির শিখার চারদিকে অন্ধকারের ছায়া। তবু এখানে একটা মানুষের উপস্থিতি।

মালতীমাসি ! আমি রুটি বেলবো। দাও—

আঃ। খুকু ! কাজের সময় দিক্ কোরো না। একে লোডশেডিং এর জ্বালায় মরছি। পড়া লেখা নাই ? ভোর না হতেই ইস্কুলে ছুটতে হবে না ?

কী ? কাল ইস্কুলে যেতে হবে ? কাল বুঝি রবিবার নয় ? বোকা ! বোকা ! দাও বেলুনটা।

আঃ। খুকু ! বলছি না কাজের সময় ব্যস্ত কোরো না বাবা ! এই মেয়েখানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে বৌদিদির রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে যাওয়া !

কী ?

বুতান আবার মর্যাদাবোধে সচেতন হয়। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলে, তুমি আবার আমার মার নামে নিন্দে দিচ্ছো ! মা না থাকলেই তুমি মার নামে নিন্দে দাও।

রোসো,বলে দিয়ে তোমায় কী মজা দেখাই। মা তোমায় কী করে দেখো।

দেখাস। কে কাকে মজা দেখায় দেখিস। কী করবে তোর মা আমার ? মুন্ডু কেটে নেবে ? এখন যাবি ? কাজ করতে দিবি ? ওই তো—এখান থেকে তো তোর ঘর দেখা যাচ্ছে। কেবল রান্নাঘরে ঘুরঘুর। আচ্ছা জ্বালা।

ওঃ। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে !

গটগট করে চলে যায় বুতান। এতো অপমানের পর আর থাকা যায় না। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা জলটা ফ্রকের কোণ তুলে মুছতে মুছতে চলে যায়।

আলোর ধারে এসে দাঁড়ায়।

লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠে না, শুধু কান্না চাপা !

শেলেট-পেন্সিলটা নিয়েই বসে আবার। কিন্তু কিছু আঁকা আসে না কেন ? আলোটা অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন ? বাতাসে জানলার পর্দাগুলো দুলে দুলে দেয়ালে এমন ছায়া ফেলে কেন ? কোথায় কী সব শব্দ হয় কেন... মা এখনো ডাক্তারখানায় বসে আছে কেন ? বাবা এখনো আসছে না কেন ?... নিজের বুকের মধ্যেই এমন দুমদুম শব্দ হয় কেন ?... হঠাৎ হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দগুলো এমন বিচ্ছিরি লাগে কেন ? শব্দগুলো কি অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে যায় ?.. সবচেয়ে স্বস্তির শব্দ শুধু রান্নাঘর থেকে আসা খুন্তির শব্দ। কড়ার ওপর চাটুর ওপর।

সেই স্বস্তির শব্দের কাছেই চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কী ?

মালতীমাসি ! এখনো আলো আসছে না কেন ?

সে কথা আলো কোম্পানিদেরই শুধোগে যাও। মুখপোড়াদের জ্বালায় একদিন টিবি দেখার জো নেই।

তোমার খালি টিভি আর টিভি। মা কখন আসবে ?

সে কথা আমায় বলে গেছে ? যখন থিয়েটার ভাঙবে তখন আসবে।

কী ? থিয়েটার মানে ?

মানে আবার কী ! মা থিয়েটার দেখতে গেছে, জানিস না বুঝি ?

কখনো না। মিথ্যুক। মা তো চোখ দেখাতে চশমার ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে।

তোকে তাই বলে বুঝিয়ে গেছে বুঝি ?..মালতীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে ! এ বাড়ির কাজটা তো ছেড়েই দেবে ঠিক করেছে, তবে আবার তোয়াক্কা কিসের ? তাই বলে, মা যদি ডাক্তারখানায় গেছে তো, তোর বাপী এখনো আসছে না কেন ? মা এখেন থেকে থিয়েটারে গেছে, বাপী আপিস থেকে এসে সেখানে জুটবে। দেখিস একসঙ্গে ফিরবে।

তোমায় বলেছে ?

বুতানের চোখে অগ্নিশিখা।

মালতীর প্রাণে সেই পৈশাচিক সুখস্বাদ, আমায় কারুর কিছু বলতে হয় না। দুজনায়

ইংরিজি করে কথা বললেও বুঝতে পারি।

তুমি মিথ্যুক। তোমায় আমি মারবো।

মার। মার না যতো ইচ্ছে।

মালতীমাসি। আমার রুটি খিদে পেয়েছে। এতো দেরি হয়ে গেছে আমায় খেতে দিচ্ছো না কেন?

আপাতত এই রুটি পর্বে, রান্নাঘরে উপস্থিতির একটা সম্মানজনক কারণ থাকবে।

মালতী বলে, ও বাবা! এ যে ভূতের মুখে রামনাম। নিজেই তো মা না এলে খেতে চাও না। এসো তালে। দিচ্ছি।

থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে এসে তনিমা অলককে বলে, দেখলে তো? তোমায় বলিনি, বড়দি বলেছিল নাটকটা দারুণ!

অলক বলে, তা দেখলাম অবশ্য। তবে বাড়ি ফিরে কী নিদারুণ নাটক দেখতে হবে তাই ভাবছি। হয়তো দেখা যাবে তোমার মালতীতে আর বৃতানেতে কোনও একটা উপলক্ষে খন্ডযুদ্ধ বেধে গেছে।

ভয় পাইয়ে দিও না বাপু। বেশ ছিলাম এতোক্ষণ। এই, একটা ট্যাক্সি দেখো না গো।

ট্যাক্সি! বাস পেয়ে যাব না?

এখন আর লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে বাসে চড়তে ইচ্ছে করছে না। ভয় নেই, তোমার পকেট ভাঙবো না। আজ আমিই তোমায় গাড়ি চড়াই।

দেখি। ট্যাক্সি পেলে! এ সময়—

ওই তো। আগে থেকেই 'নেতিবাচক উক্তি।' সত্যি এতো ইয়ে তুমি! জামাইবাবুকে দেখেছ? এখনো এ বয়সে সব বিষয়ে কী এনার্জি।

পকেটে এনার্জির রসদ থাকলে সবাই এনার্জিদার হতে পারে।

সেটা মজুত রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় মশাই! শুধু অফিসটি আর বাড়িটি ছাড়া আর কিছু তো জানলে না—ওই ওই তো, এই ট্যাক্সি।

গুছিয়ে বসে তনিমা বলে, জানো, তোমার কন্যে তোমায় খুব হ্যানস্থা করছিল!

অলক বললো, খুবই স্বাভাবিক। শিশু অনুকরণপ্রিয়।

আহা। ইস। তুমি না এমন একখানা!

এখন সদ্য একটি ভালো নাটক দেখে আসার আবেশে দুজনে কাছাকাছি বসে নিভৃত কথোপকথন করতে করতে পথচলার সুখস্বাদ, তাই মেজাজের পারা নীচের দিকে।

বলছিলো কী জানো? ওর ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে, শুধু ওর বাপীটারই গাড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় না।

অলক মৃদু হেসে বলে, শুধু এই? এরপর আরো কত বলবে।

আহা বাচ্চা তো। অন্যের দেখে সাধ হয়।

সেটা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হয়।

তনিমা অলকের গায়ের ওপর একটু এলিয়ে পড়ে বলে, বাদে তুমি ! তবে সত্যি বাপু গাড়ি একখানা থাকা মানে হাতে স্বর্গের টিকিট থাকা। এই তো দেখো না, গাড়ি থাকলে অনায়াসেই বুতানটাকে নিয়ে আসা যেতো। একা রেখে আসতে হতো না।

এই নাটক দেখতে ? বুতানকে ?

আহা নাটকের ও কী বুঝতো ? মা বাপীর সঙ্গে এলাম, সেটাই আমোদ। আর সত্যি বলতে মালতীর কাছে একা রেখে আসা ! ওটি যে 'কী' তোমায় বলে বোঝানো যাবে না। বুতানের সঙ্গে যা রেষারেষি আর চোটপাট করে ! এক একদিন তো যা শুনি বুতানের কাছে রাগে মাথা জ্বলে যায়। অথচ বেশি বকাবকির উপায় নেই। তক্ষুনি ঠিকরে উঠে বলবে, 'না পোষায় ছেড়ে দিন'। তখন মনের রাগ মনে চেপে আবার দেঁতো হাসি হেসে তোয়াজ করতে হয়। তোর মেজাজ এমন মিলিটারি কেনরে ? গত জন্মে লড়ুয়ে ছিলি বোধহয়। এই সব বলে। উপায় কী। সহজে লোক মিলবে ? তাছাড়া একটা গুণ, চোর ছ্যাঁচোড় নয়। এই যা।

সেটাও কম নয়, বলে অলক মালতী প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলে, ভাবছি সামনের শনিবারে একবার শ্যামনগরে চলে গেলে হয়।

হ্যাঁ আজকাল এই ভাষাতেই ইচ্ছে ব্যক্ত করে অলক। আগে আগে তো বলতো, সামনের শনিবারে মার কাছে যাবো ভাবছি। একদিন বড়শালীর সামনে বড় অপদস্থ হতে হয়েছিল। শালী বলছিলেন, তোরা কী কুনো বাবা। সাতজন্মে একবার বেড়াতে আসতে পারিস না। বুঝলাম দুজনেই অফিসের বাবু। তবু রবিবারগুলো কী করিস ? শুধু ঘুমিয়ে কাটাস ?

সঙ্গে সঙ্গে তনিমা বলে উঠেছিল, আর বলিস না বড়দি, শনিবার এলো কী, এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি 'মার কাছে যাবো—' বলে হেদিয়ে পড়বেন। বাস ! রবিবারটি খতম।

তদবধিই, ভাষাটার বদল হয়ে গেছে।

'শ্যামনগরে ঘুরে এলে হয়'।

তনিমা চকিত হয়ে বললো, কেন ? কোনো ইয়ে—অসুখটসুখের খবর পেয়েছ নাকি ?

খবর আর কোথা থেকে পাবো ? চিঠিপত্র তো—খবর পাইনি বলেই—

কেন তোমার সেই শ্যামনগরের ডেলিপ্যাসেঞ্জার পরেশবাবু ?

তিনি তো ছমাস হলো রিটায়ার করেছেন।

ও। তাই বুঝি।

তনিমা একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে, আমারও তো একবার যেতে ইচ্ছে করে। বুতানটাও তো এতদিন তার ঠামাকে দেখেনি।

অলক একটু চমকায়। এ আবার কী ভূতের মুখে রামনাম ? নাকি একটু সৌজন্যের স্টান্ট ? নাকি অন্য কিছু ? তবু আস্তে আলগা ভাবে বলে, গেলে মা দারুণ খুশী হবেন।

তা তনিমার মধ্যে একটু অন্য কিছু আছে বৈকি। তার বিশ্বাস নিজে একবার গিয়ে পড়ে,

নিজেদের বহুবিধ অসুবিধের কথা ফেঁদে আর যুক্তির জাল ফেলে, সেই অবুঝ জেদি মহিলাটিকে কব্জা করে নিয়ে বাড়িটা বিক্রি করানোয় রাজি করে ফেলতে পারে। ওই উনি একটি সই না ঝাড়লে তো অলকের কিছু করার নেই। তাই তনিমার এই সাধু সংকল্প!

তবে তখনি কী ভেবে বলে উঠলো, আচ্ছা—রবিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়, এমন কোনো গাড়ি নেই ? বাসেও তো যাওয়া যায় তাই না ?

অলক ঈষৎ গম্ভীর হয়, সকালে গিয়ে সন্ধ্যেয় ফেরা ? সে যাওয়ার আর মানে কী ? মার তো জানাও থাকবে না। আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কথা বলার সময়ই থাকবে না। আমি একা যাই, তাতেও ব্যস্ত হয়ে যান। যা কিছু কথা ওই শনিবার রাতটুকুই।

এতো ব্যস্ত হবার কী আছে ? আমরা তো আর কুটুম নই ?

অলকের মুখে আসছিল, 'আপাতত' তো তাই। সেটা সামলে নিল। যত নিরাপদে থাকা যায়। বললো, সেকথা কে বোঝাবে ?

কিন্তু রাতে থাকাও তো একটা মস্ত প্রবলেম। এখানে তাহলে মালতীকে একা বাড়িতে রেখে যেতে হয়।

অলক মানলো। বললো, তা বটে। ভয় পেতে পারে।

ভয় ?

তনিমা ব্যঙ্গে তীব্র হয়, ওই মেয়ের ভয় ? ভয় পাবার মেয়েই বটে। জাঁহাবাজের রাজা একখানি।

তবে আর কী ? তুমি তো বলো, খুব বিশ্বাসী।

তা ঠিক। আস্পদ্দাবাজরা বড় চোর ছ্যাঁচোড় হয় না। তনিমা গলার স্বর খাদে নামায়, অন্য অবিশ্বাস আছে। সুযোগ পেয়ে একা বাড়িতে ভাব ভালবাসার লোক এনে ঢোকাবে না, তার গ্যারান্টি কী ?

আঃ। কী যে বলো।

আহা গো ! যেন এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে। হয় না এমন ?

অলক গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু হঠাৎ একঘন্টার নোটিশে ভালোবাসার লোক জোটানো, একটু বেশি কল্পনা নয় ?

তনিমা ঝুনো গলায় বলে, ওহে মশাই, যা ভাবো তা নয়। আছে 'একটি।' খুকুকে বলে রাখি তো আমরা যখন বাড়ি থাকি না, তখন মালতীমাসি কী করে কোথাও বেরিয়ে যায় কিনা, ওর কাছে কেউ এসে কথা বলে কিনা নজর রাখিস।... তো মেয়েটি তোমার কম ওস্তাদ নয়। ওই তো চুপি চুপি বলেছে, এক একদিন মালতীমাসি জানলা দিয়ে একটা বিচ্ছিরি মতন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে।

অলক তিক্ত গলায় বলে, তার মানে বুতানকে একটা স্পাই করে তোলা হচ্ছে।

ওঃ ! ভারী নীতিবাগীশ এলেন !...কিছুক্ষণ আগের সেই সুখস্বাদ আর থাকল না, তনিমা যথা স্বভাব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তুমি আমি দুজনেই তো বেলা নটার মধ্যে বেরিয়ে যাই, খুকুটা সাড়ে দশটার সময় এসে যায় তাই। ওকে নজর রাখতে বলবো না তো কাকে বলবো ? চোর বদমাস কার সঙ্গে কী পরামর্শ করবে ঠিক কী ? পেয়ারের লোক হলে তো আরো বিপদ। তোমায় তো আর কোনো জ্বালা পোহাতে হয় না। মহাপুরুষ হওয়া শক্ত কী ? আমার যা জ্বালা। কাঁটাতারের ওপর দিয়ে হাঁটা। দেখেছ কী উদ্ধত ভঙ্গি ! আমার সঙ্গে কথা কয়, কী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ! জেরাও করিনি কিছুই নয় 'কে এসেছিল রে ?' জিগ্যেস করতেই কী ঝঙ্কার। বলে কিনা, 'গরিব বলে কী আমাদের একটা মামা কাকা থাকতে নাই ? তাও তো আপনার 'সন্দ' বাতিকের তরে জানলা থেকে কথা বলেই বিদেয় দিই। বাড়ির মধ্যে ঢোকাই না। ও বাড়িতে থাকতে মাসিমা নিজে ডেকে, বসতে বলেছে, চা জলখাবার দিতে বলেছে। মাসিমা বলেছে, 'আহা ! কাকা বলে কথা।' আপনার বাড়ির মতো এমন ওঁচা বাড়ি আর দেখি নাই !' বোঝো ? এও আমায় সয়ে যেতে হয়েছে। তক্ষুনি ইচ্ছে হলো দূর করে দিই। কিন্তু কী করবো ? ওকে ছাড়ালে, নিজেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। তাই ওই একখানি সর্বদা ফণা উচনো কেউটেকেই পরম পুজ্যি করে থাকতে হয়।

অলক কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে, 'অথচ সত্যিকার পূজনীয়' কে 'পুজ্যি' করে চলতে তোমার মানে বাধে ! অথচ যাতে সব সমস্যার সমাধান আছে। নাকি চেঁচিয়ে উঠবে। তবু ওই কালকেউটের হাতেই জীবনের যথাসর্বস্ব সর্বস্বের সারকে ছেড়ে রেখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা হয় ? ওই একটা অজ্ঞাতকুলশীল কোথাকার কোন গ্রামের চাষীবাসী ঘরের মেয়ে, পরিচয়ের মধ্যে পাশের বাড়ির কাজের লোকের দেশের মেয়ে। শুধু এই । তবু তার হাতেই—

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেই তো হয় না ? জবাবটা মাথায় রাখতে হবে না ? তক্ষুনি শুনতে হবে না, এমন ঘটনা বুঝি অলক জীবনে এই প্রথম দেখছে ? আর কারো সংসারে দেখোনি এমন ? একটা ফ্রকপরা খুকীর হাতে সমগ্র সংসার আর বাচ্চার ভার ফেলে রেখে দুজনে সারাদিন বাইরে থাকছে দেখনি ?

অতএব চেঁচিয়ে ওঠা হয় না।

এযুগে পুরুষের কণ্ঠস্বর জোর হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

নীরবতাই নিশ্চিন্ততা।

গাড়ি বাড়ির মোড়ের কাছে এসে গেছে।

তনিমা বলে উঠল, এই শোনো, তুমি এইখানটায় নেমে পড়ে রাস্তায় দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আগে বাড়ি ঢুকবো। তুমি তারপর—

অলক অবাক হয়ে তাকালো।

তনিমা ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে বললো, তোমায় বলা হয়নি বুতানকে বলে এসেছি,

ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে যাচ্ছি। দুজনে একসঙ্গে ফিরলে সন্দেহ করবে।

অলক স্তব্ধ হয়ে গিয়ে, পাথরের গলায় বলে, এতোক্ষণ ডাক্তারের কাছে!

ওঃ সে যা হোক একটা বানিয়ে ফেলা যাবে। তোমার ওই মেয়েটির জন্যে গল্প বানাতে বানাতে গল্প লিখিয়ে হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে যে সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে চলতে হয়, আমিই জানি।

অলক আরো স্থির গলায় বলে, আর আমি? আমি তাহলে এতোক্ষণ কোথায় ছিলাম?

এবার ঝঙ্কারের পালা।

আহা তোমার আবার নতুন কী? অফিসের কাজে ফিরতে রাত দুপুর হয় না কোনো কোনো দিন? এই যে ভাই, গাড়িটা একটু থামিয়ে—ইনি এখানে নেমে যাবেন! আমি আর একটুখানি—

অলক নিঃশব্দে নেমে পড়ে।

এখানেই কি চেঁচিয়ে ওঠা সম্ভব? সম্ভবের মধ্যে শুধু একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করা।

আর ভাবা—

মাকড়সা নিজেকে ঘিরে ঘিরে জাল রচনা করে বোধহয় আপন শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো, গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস করা হয়ে গেছে। বুতানটা ঘুমিয়ে পড়লো না তো? এখন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো। দরজার ওপর দেহটাকে প্রায় সমর্পণ করে ডোরবেলটা বাজালো। শব্দটা কি বড় বেশি জোরে হলো?

দরজা খুলে দিতে এলো মালতী নয়, তনিমা।

ওই ঘন্টিটার মতই ঝনঝনে গলায় বলে উঠলো, উঃ। এতোক্ষণে আসা হলো! আচ্ছা এতোক্ষণ কে তোমার জন্যে অফিসের দরজা খুলে রাখে বলো তো? আশ্চর্য!

আর সঙ্গে সঙ্গে বুতানের আরো তীক্ষ্ণ স্বর তীব্র হয়ে আছড়ে পড়লো, মালতীমাসি! এই মালতীমাসি! এই তো বাপী এতোক্ষণে আপিস থেকে এলো। বলা হচ্ছিলো কিনা—'মা ডাক্তারখানায় গেছে না কচু। মা তো থিয়েটার দেখতে গেছে। তোর বাপী আপিস থেকে সেখানে আসবে। দুজনে থিয়েটার দেখবে।' মিথ্যুক! মিথ্যুকের রাজা! তোমায় আমি গুম গুম করে কিল মারবো! তোমার মুন্ডু ভেঙ্গে দেবো! তোমার চুল কেটে নেবো। তোমার চোখে লঙ্কা দিয়ে দেবো। তোমায় তোমায় তোমায় মেরে ফেলবো।

একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শিশুচিত্তের অসহায়তার যন্ত্রণা আর দুর্বল মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের কাছেই শরণ নিতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি, এই একটা উপলক্ষ পেয়ে ফেটে পড়ে।

আর অন্য একটা চিত্ত, সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে ফেলার কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে বলে ওঠে, আঃ বুতান। কী পাগলামি হচ্ছে? মালতীমাসি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিল বুঝতে পারোনি? একের নম্বরের বোকাটা!

❑

একটি মৃত্যু এবং আর একটি

মানুষ চেনা সত্যিই শক্ত।

বোধহয় জগতের সব শক্ত কাজের সেরা শক্ত হচ্ছে মানুষ চেনা ! একটা মানুষকে দিনের পর দিন দীর্ঘদিন ধরে দেখেও জানতে পারা যায় না কী রয়েছে তার মনের গভীরে। তা না হলে সুনয়নীর মুখে এই কথা !

এতো নীচ আর নির্লজ্জ কথা উচ্চারণ করলেন সুনয়নী !

সুনয়নীর পেটের মেয়েরাই চমকে উঠল তাদের মায়ের কথা শুনে ! জ্ঞানাবধি যারা বোধহয় মার প্রতিটি নিঃশ্বাসেরও খবর জানে। সেই তাদের ভদ্র সভ্য সুরুচি সম্পন্ন উদার সুকুমারী মা ! হতে পারে একটা হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় তাদের মার মুখের চেহারাটা অনেক বদলে গেছে। কপালের সেই সদা জ্বলজ্বলে মস্ত সিঁদুর টিপটির আর কোঁকড়া ধরনের চুলের ঠাস ভেদকরা সরু সিঁথির ওপরকার ঘন করে আঁকা সিঁদুরের রেখাটির অভাবে মাকে অন্য রকম দেখতে লাগছে, তো সে তো বহিরঙ্গে। সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের খেসারতে। তা, বলে ভেতরটা এভাবে বদলে যাবে ? না কি এইটিই মনের মধ্যে পোষা ছিল ? শুধু প্রিয়তোষের ভয়ে বাইরে আহ্লাদী ভাবটি দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ?

মুহূর্তের চিন্তা।

বুলি আর বাবলি প্রায় এক যোগেই চমকে উঠে বলে উঠল, কী বলছ মা ? এই কথা বলতে যাব আমরা অলককাকুকে ?

সুনয়নী মেয়েদের এই চমকানিতে দমলো বলে মনে হল না। তেমনি ভাবেই বলল, ঠিক ওই ভাবেই না হোক অন্যভাবে একটু গুছিয়ে বলবি।

কোনভাবেই বলা যায় না ! অসম্ভব ! ভাবাই যায় না।

সুনয়নী শক্ত গলায় বললেন, তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হলে আমাকেই সেই অসম্ভব কাজটা করতে হবে।

ছোটমেয়ে বাবলি একটু কটকটে। সে বলে উঠল, কেন, বলতে হবেই বা কেন ? যেমন চলে আসছে, তেমনিই চলবে।

সুনয়নী মেয়ের উত্তেজিত উত্তপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, যেমন চলে এসেছে ? অবস্থা যে আর ঠিক তেমন রইল না, সেটা বোঝবার বয়েস নিশ্চয় হয়েছে তোমাদের। সংসারে

আয়ের পথটা চলে গেল, দেখতে তো হবে আর কী পথ আছে ! তোমাদের অলককাকু তো দিব্যি এতকাল বিনা ভাড়ায় বাড়ির সামনের দিকের দু' দুখানি ঘর অকুপাই করে কাটিয়ে এলেন। ওই ঘরদুটো পেলে, রান্নার ব্যবস্থা দোতলায় তুলে এনে অনায়াসেই পুরো একতলাটা ভাড়া দেওয়া যায়। আজকালকার দিনে সেটা অনেক।

ওঃ ! এতোখানি পরিকল্পনা হয়ে গেছে !

তার মানে এ-পরিকল্পনা মনের মধ্যে লালিতই ছিল মার ! বুঝতে আর বাকি থাকে না বুলি বাবলির ! বাবার তো অলক ছিল প্রাণতুল্য, কে বলবে মামাতো ভাই। নিজের ছোট ভাইয়ের অনেক বেশি ! তাই বাবার কাছে সুয়ো হতে মা আমাদের এমন ভাব দেখাতেন, এমন ব্যবহার করতেন যেন উনিও অলককাকুকে নিজের ভাইয়ের মতই দেখেন। অত আদর-যত্ন, খাওয়া নিয়ে অতো জোরাজুরি, ছবি আঁকতে বিভোর হয়ে গিয়ে অলককাকু খাওয়া দাওয়ার সময় এসে উঠতে না পারলে মা নিজে গিয়ে হিড়হিড় করে টেনে এনেছেন তাকে। ছবি নিয়ে হি হি করে কত ঠাট্টা করেছেন, আবার কোনো কোনো সময় বলেছেন, থাক বাবা, শিল্পীর ধ্যান ভঙ্গ করে কাজ নেই। তোরা যা চা-টা দিয়ে আয় কাকুকে।

আবার ওই ছবি নিয়ে 'একজিবিশান' করার জন্যেও কত সময় কত উৎসাহ দিয়েছেন অলককাকুকে মা, সবই তো তাদের দেখা ! তখনই না হয় হঠাৎ পরপর দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়ে কলকাতা ছাড়া হয়ে গেছে তাই। বিয়ের পর একটানা এতোদিন থাকা, এই বাপের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে এসে, তাঁর 'কাজ' পর্যন্ত রয়ে যাবার জন্যে ! তা এতোদিন তো বাড়িতে নানা জনের আবির্ভাবে, লোকে লোকারণ্য ছিল, সুনয়নীকেও স্তব্ধ আর শোকাহতের মূর্তিতেই দেখেছে। তার মধ্যেও খোঁজ নিতে দেখা গেছে সুনয়নীকে, অলক খেয়েছে কি না। সবই লোক দেখানো ? সারাজীবনের সবই অভিনয় ? বাবার মন রাখা ? বাবার কাছে দেখানো, দ্যাখো আমি কত উদার !

তা নইলে বলতে পারলেন কী করে, তোমরা তো কাল যে যার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে ! তো যাবার আগে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও। আমি বললে খারাপ দেখাবে, তোমরাই তোমাদের অলককাকুকে এবার পথ দেখতে বলে যাও। আমার আর চিরকাল এতো ক্ষমতা থাকবে না, যে শুধু শুধু একটা বেআক্কেলে মানুষের ঝক্কি সামলে মরব।

ওরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিল মার মুখের এই অপরিচিত ভাষা শুনে, আর অন্য রকম হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে। থমকে বলে উঠেছিল, এই কথা বলতে যাব আমরা অলককাকুকে ?

বুলি তারপর বলল, অলককাকু বেআক্কেলে ?

সত্যি বলতে অলক যে শুধু তার পিসতুতো দাদা প্রিয়তোষেরই প্রাণতুল্য ছিল তা নয়, প্রিয়তোষের মেয়েদেরও তাই ছিল। আর সে-ও তো সেই চোখেই দেখত মেয়েদের।

বুলি বাবলির ছেলেবেলা মানেই অলককাকু। তাদের যত আবদার যত উৎকট উৎকট

ইচ্ছেপূরণের দায় সব অলককাকুর ! সুন্দর সুকান্তি, শুধু স্বাস্থ্যে একটু খাটো এই ছেলেটা যেমন সভ্য ভদ্র মার্জিত হৃদয়বান তেমনি হাসিখুশি ! আর ছবি আঁকাই ধ্যান জ্ঞান।

বুলির মনে আছে একবার প্রিয়তোষ আর সুনয়নী অলকের বিয়ে বিয়ে করে খুব ব্যস্ত করেছিলেন, তখন অলককাকু বলেছিল, তার মানে আমাকে তাড়াতে চাও কেমন ? বেশি জোর করলে কেটে পড়ব কিন্তু। বিদ্যেয় তো অষ্টরম্ভা, কাজের মধ্যে রংতুলি নিয়ে ছেলেখেলা, তার ওপর আবার প্রাণের সখী 'অ্যাজমা'কে নিয়ে ঘরকন্না ! এমন হতভাগা যাবে বিয়ে করতে ?

বিয়ে করেনি অলক।

প্রিয়তোষ আর সুনয়নী অনেক ভুজুর ভাজুর, অনেক খোসামোদ তোয়াজ করে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক হিতোপদেশ দিয়েও রাজি করাতে পারেনি। অলক হেসে হেসে বলেছে, ভবিষ্যতের ভয় দেখিয়ে আমায় কাবু করে ফেলতে চাইছ প্রিয়দা ? অত সোজা নয়। ভবিষ্যতে যদি সুনয়নী আমায় রেঁধে খাওয়াতে বেজার হয়, সেই ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে মাথায় একটা গন্ধমাদন চাপিয়ে বসব ? এতো বোকা না কি ? বেঁচে থাক আমার স্বাধীনতার পাইস হোটেল। কলকাতায় অভাব আছে ?

অলক তার থেকে সাত বছরের বড় দাদার বৌকেও বৌদি বলতে রাজি হয়নি। বলেছিল, বৌদি বলবে না হাতি ! আমার থেকে বয়েসে ছোট। নাম ধরে ডাকবো ! ব্যাস !

প্রিয়তোষের মা তখন বেঁচে। অল্প বয়েসে মা-মরা অলক ছোট থেকে পিসির কাছেই মানুষ। পিসি বলেছিলেন, ওমা শোনো কথা। তাই বলে দাদার বৌকে নাম ধরে ডাকবি ? বিশ্বসুদ্ধু লোকই তো বয়েসে ছোট হলেও বড় ভাজকে বৌদি বলে।

বলুক তো। আমার দায় পড়েছে বলতে।

ও তোর থেকে কত ছোট শুনি ? মোটে তো মাসকয়েকের।

জানি। দশমাসের। তাই কি কম না কি ? তার মানে আমি যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করছি, ও তখন সবে পৃথিবীতে পড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করল। তাকে আবার বৌদি ! ধ্যাৎ।

সুনয়নী এসে শাশুড়ির কাছে নালিশ করেছে, মা দেখুন, অলক আমায় নাম ধরে ডাকছে। বৌদি বলছে না।

শাশুড়ি হেসে বলেছেন তা তুমিও তো বাপু ওকে নাম ধরে ডাকছ, ঠাকুরপো বলছ না।

আহা বাঃ। ও আমায় মান্য করবে না, আমি ওকে মান্য করতে যাব ! ভারি মজা।

মহিলা ভীতিকর শাশুড়ি ছিলেন না, ভারি উদার আর স্নেহময়ী ছিলেন। নিজের মেয়ে ছিল না। পরের মেয়েটিকে সেই পোস্টেই বসিয়ে ছিলেন। ছেলের বৌয়ের কাছে কোনো কর্তব্যের দাবি দাওয়াও ছিল না তাঁর। ভাবতেন, ওরা ছেলেমানুষ হাসুক খেলুক বাড়িটা আহ্লাদে ভরিয়ে রাখুক, এটাই সুখের। আমি তো এতোদিন একাই চালিয়ে এসেছি, বৌ এসেছে বলেই 'কুঁড়ে' জগন্নাথ হয়ে যাব ?

ছেলের বৌয়ের কাছে ভীতিকর হলেই যে ছেলের কাছেও ভীতিকর হয়ে যাবেন, সহজ প্রীতির সম্পর্কটি হারিয়ে বসবেন, এ বোধটাও বোধহয় ছিল তাঁর।

তাছাড়া হেসে কথা বলাই স্বভাব ছিল তাঁর। তখনও তাই বলেছিলেন, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। কেউ কাউকে মান্য করতে হবে না নামই ধরিস ! এই শোধবোধ ঝগড়া রোধ।'

কিন্তু সুনয়নীর ভাগ্যে এমন দুর্লভ বস্তুটি বেশিদিন টিকল না ! বুলি সবে জন্মেছে, সে-সময় মারা গেলেন তিনি। সুনয়নীর হালকা ফুরফুরে দিনগুলো হারিয়ে গেল, হয়ে উঠল জগদ্দল। একদিকে শিশু, অপরদিকে সংসারের রান্নাবান্না, কাজ-কর্ম।

প্রিয়তোষ এসব ব্যাপারে বরাবরই অপটু। সে কেবল ব্যস্ত হতেই জানত। বলতে গেলে—বুলিকে মানুষ করে তুলেছিল তার অলককাকুই। কান্না ভোলানোর চাকরি থেকে ক্রমশ প্রমোশন। খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে চান করানোও। সেটা হয়তো কখনো শর্ত সাপেক্ষেও।

এই সুনয়নী প্লীজ আধঘন্টা সিটিং দিয়ে যাও। আমি তোমার ছিঁচকাদুনীকে চান করিয়ে দেব।

অলকের হাত পাকানোর সময়, মডেল হতে বাধ্য হতে হতো পিসিকে। অলকের প্রথমকালের স্কেচ্-এর খাতায় এন্তার ওই সামনের একটি দাঁত-পড়া হাস্যবদনা বুড়ির মুখ। মুখের থেকেও অবশ্য ভঙ্গিটাই ছিল অলকের বেশী দরকার।

ও পিসি, তুমি দুপুরে যেভাবে বই পড়তে পড়তে চশমাটা খুলে ফেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়, সেইভাবে একটু ঘুমিয়ে পড় না।

পিসির চোখ কপালে উঠতো, ওমা এ কী অনাছিষ্টি কথা রে তোর। আমি সকাল বেলা এই ছিষ্টির কাজ ফেলে ঘুমিয়ে পড়তে যাব ?

বাঃ। প্রিয়দা তো কলেজ চলে গেছে। আর তোমার কী কাজ ?

না ! আর আমার কোনো কাজ নেই কেমন ? যা বাবা পালা। যখন ঘুমোবো, তখন আঁকিস।

কিন্তু সে কথা বলে কি নিবৃত্ত করা যায় ? শিল্পীর যখন বাই চাপে তখন ধৈর্য শব্দটা কাজে লাগে না।

অলক ততক্ষণে ঘরের মেজেয় মাদুর পেতে কাছে একখানা বই আর একখানা হাত পাখা যেমন তেমন করে ফেলে রেখে, অভিনয় মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখেছে।

সুনয়নীর ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারই ঘটতে থাকতো যখন তখন। সুনয়নী বিকেলে গা ধুয়ে বৈকালিক প্রসাধন সেরে স্টোভ জ্বেলে প্রিয়তোষের জন্যে জলখাবার বানাতে বসতে যাচ্ছে, অলকের প্রচন্ড মিনতি, এই সুনয়নী প্লীজ ! লক্ষ্মী মেয়ে, একটু খোলা জানলার ধরে এসে দাঁড়াও। মুখে ভাব ফোটাও, প্রিয়দা বাড়ি ফিরতে দেরি করছে, তাই হতাশ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছো।

সুনয়নী রাগের ভান করে বলত, আর কিছু না। আমি এখন তোমার জন্যে 'পোজ' দিয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকি, আর তোমার প্রিয়দা কড়াইশুঁটির কচুরির বদলে কাঁচাময়দা খাক। জানো তো খিদে পেলে দাঁড়াতে পারে না।

আরে বাবা, তোমার কচুরি আমি ভেজে দেব। বেলতে না পারি, কী ফার্স্টক্লাস ভাজতে পারি তার প্রমাণ আছে, মনে আছে তো ?

তা শুধুই কি জানালার ধারে ?

উনুনের ধারে, বঁটি কুটনোর ধারে ড্রেসিং টেবলের ধারে গামছা দিয়ে ভিজে চুল ঝাড়ার কালে 'সুনয়নী এক মিনিট ! এই সুনয়নী যেমন আছো ফ্রিজ হয়ে যাও। খবরদার একটুও নড়বে না।' কখনো যথাযথই কর্মকালে, কখনো অভিনয়মঞ্চ সাজিয়ে।

আবার বুলি বাবলিকে নিয়েও কম করত না।

সুনয়নী এটাকে একবার বাবা আদম করে ওর বাথটবে বসিয়ে দাও না, চুল উস্কো করে।

সুনয়নী মাথায় হাত দিত।

এতক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে সাজাগোজা করালাম, এখন বাবা আদম করে বাথটবে বসিয়ে দেব ? অসম্ভব।

আরে বাবা, একজন উঠতি শিল্পীর উপকারের খাতিরে না হয় একটা অসম্ভবকে সম্ভব করলে।

তুমি একটা আস্ত পাগল।

তা ভাঙাচোরার থেকে আস্ত ভাল।

প্রিয়তোষের প্রকৃতিটি ছিল ওর মায়ের মতই উদার স্নেহশীল। অলকের ওপর স্রেফ বাৎসল্য ভাব।

ছবিগুলো দেখতো। আর মোহিত হয়ে গিয়ে বলতো, কী করে এমন অবিকল আদলটা আনিস বল তো ? ঠিক মনে হচ্ছে বুলি। আর এটা তো একদম সুনয়নী ! চুলটা পর্যন্ত।

অলক হাসতো।

চুলটা পর্যন্ত কী গো প্রিয়দা। চুলটাই তো আসল। চুলের ব্যাপারটা একটু বদলে দিলেই মুখ একদম আলাদা।

প্রিয়তোষকেও ধরে করে এক একবার বসাতে ছাড়ত না।

বলতো, বোসো বোসো। ঠিক ওইভাবে চশমাটা একটু কপালে তুলে। ক্যাপশান দেব অধ্যাপক নোটবুক লিখনরত !

সেই অলক।

বুলি বাবলির শৈশব বাল্য কৈশোর সবটাই তো 'অলককাকু'।

সাত তাড়াতাড়িই দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়ে বসেছিল প্রিয়তোষ। বলেছিল, ভাল ছেলে পাচ্ছি। আমার ছাত্র ছিল, দেখেছি। ভারি চমৎকার ছেলে।

পরপর বিয়ে হয়ে গেছিল দুজনের।

অলক ক্ষেপিয়েছে, ওসব ভালছেলে টেলে কিছু না, আসলে তোদের বিদায় করে ফেলে মুক্তপুরুষ হয়ে প্রাণ ভরে শুধু নোট লিখবে প্রিয়দা, বুঝলি ? যাতে একাগ্র সাধনায় মাঝখানে আর কেউ ডিস্টার্ব না করতে আসে।

আবার সুনয়নীকেও ক্ষেপিয়েছে,ইস। সুনয়নী। বললে কেউ বিশ্বাস করবে দু'খানা জামাইয়ের শাশুড়ি হয়ে গেছ তুমি ! ছেলেদুটো যখন তোমায় মা বলে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নেয়, হাসিচাপা দায় হয়।

তা সত্যি বললে বিশ্বাস না করার মতই।

সুনয়নীর চেহারাটি সেই রকম যে চেহারা সহজে বুড়ো হয় না। টসকায় না। সময় যেন ওর ওপর দিয়ে আলতো হয়ে বয়ে যায়। ডালপালা খসিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, দু'খানা পাতাও ঝরিয়ে দিয়ে যায় না।

শুধু এখনই এই কদিন মনে হচ্ছে কোথায় যেন কী ঝরে গেছে। কপালের ঝকঝকে টিপটা আর সিঁথির টকটকে রেখাটা ছাড়াও বোধহয় আরো কিছু।

বুলি বলল, তুমি যে এভাবে বদলে যেতে পারো তা কখনো ভাবতে পারিনি, মা।

সুনয়নী অদ্ভুত একটু হেসে বলল, কেন, মাকে কি তোদের স্বর্গের দেবী বলে মনে হতো ?

তা না হোক, তোমাকে কখনো স্বার্থচিন্তা করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বাবলি বলল, ঠিক।

সুনয়নী কারো দিকে না তাকিয়ে, হয়তো বা কোনো দিকেই না তাকিয়ে বলল, সে চিন্তাটা একটা পাহাড়ের আড়ালে থাকতো। আমার চিন্তার দায় ছিল না।

বাবার এই হঠাৎ চলে যাওয়া, আর তারপর এই সব কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব অলককাকু ওই শরীরে কী ভাবে বয়েছে, দেখেছ তাকিয়ে ?

করেছে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য না। চিরকাল সেই মানুষটার কাছে কম পাওয়া তো পায়নি।

পেলেই কি, সবাই এতো শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে—

বাবলির স্বরটা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। আর তারপরই স্বভাবসিদ্ধ কটকটে ভঙ্গিতে বলে উঠল, এ যেন মনে হচ্ছে 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী।'

মনে হলে আর কী করা যাবে।

অলককাকু এবাড়ির কেউ নয়। অলককাকুকে ইচ্ছে করলেই 'পথ দ্যাখো' বলা যায়, এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না মেয়ে দুটো। বুলি বলে উঠল, এর থেকে বোধহয় অলককাকুকে এ কথাও বলা ভাল ছিল, আমার এখন টাকার দরকার, তুমি ওই ঘর দুটোর ভাড়া দাও।

সুনয়নী একটু বিদ্রূপের গলায় বলল, বললেই দিতে পারবে, এই তোদের বিশ্বাস ? স্বামী

কোনো আয় আছে ওর ? কখনো দুটো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছে, কখনো দুখানা বইয়ের মলাট আঁকছে। এই তো ছিরি !

বাবলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সত্যি, মানুষ চেনা কী শক্ত। মার মধ্যে অলককাকুর জন্যে এতোটা তাচ্ছিল্য জমানো ছিল। কী করে চেপে রাখতেন ? মনে হতো অলক ওঁর একেবারে প্রাণের পুতুল। শুধু বাবাকে দেখিয়েই তো। খুব রেগে গিয়ে বলে উঠল, তা এতোই বা কী অভাব পড়ল তোমার ? বাবার লেখা নোটবইগুলো তো বাবা সঙ্গে নিয়ে যাননি।

মেয়ের এই ক্রুদ্ধ এবং যুক্তিপূর্ণ উক্তি-তেও বিচলিত দেখা গেল না সুনয়নীকে। বলল, তোদের কি ধারণা পাবলিশাররা এতো কর্তব্যনিষ্ঠ হবে, যে তিনি নেই, তবু বাড়ি এসে ঠিকমত টাকা পৌঁছে দিয়ে যাবে ?

মেয়েরা তাদের সেই 'ভালো' মায়ের মুখে এহেন কূটকচালে কথা শুনে রেগে ওঘরে চলে গিয়ে ফেটে পড়ল। আর কিছু না। ওই কুটিল বুড়ি বড়মাসির কুমন্ত্রণা। বাবার কাজ-এর সময় কুড়িদিন ধরে এখানে পড়ে থেকে মার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সারাক্ষণ গুজগুজ করে তুকতাক করে মার মনে কুটিলতা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

ঠিক বলেছিস দিদি। চিরকাল মা অলক বলতে অজ্ঞান। বাবা হেসে হেসে বলতেন, 'তোমার প্রাণের বন্ধু !' আর—

বড়মাসিকে তোর ভাল লাগে বাবলি ? দেখতে তো এতো সুন্দরী।

ভালই বটে। আমার দুচক্ষের বিষ লাগে। কথাগুলো কী বিচ্ছিরি। মা ফল ডাব এসব খেতে পারেন না, তবু একগাদা করে দিয়ে দিয়ে বলবে, কিছু তো খেতে হবে ভাই। এখন তো আর চা-বিস্কুট নিয়ে বসতে পারবি না। 'পারেন না' কেন তা ও তো বুঝি না। চা-বিস্কুটের মধ্যে মাছ মাংস ভরা আছে ? মা-ও যে ওর দলে চলে গেলেন, এটা যেন ওর ভারি আহ্লাদের ব্যাপার। অসহ্য। নীচমন বুড়ি। ওর প্ররোচনাতেই মা—

মায়ের মুখে হঠাৎ এই নীচ কথা শুনে মনের মধ্যে যে বিস্ময় সংশয় জমে উঠেছিল তার একটা কারণ আবিষ্কার করেই বোধহয় ওরা দুই বোন কিছুটা শান্তি পেয়ে যুক্তির দ্বারা মার বুদ্ধি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মার কাছে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল, আচ্ছা মা, এটা ভেবে দেখেছ, অলককাকু ছাড়া এখন আর বাড়িতে কোনো পুরুষ গার্জেন নেই !

সুনয়নীর ঠোঁটের কোণে কি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, সেটাই তো ভেবে চলেছি। পুরুষ কেন, মেয়েও নেই। তোরা তো হাওয়া হয়ে যাবি।

ওরা অসহিষ্ণু গলায় বলল, আমরা তো হাওয়া হওয়ারই জন্যে। আমাদের কথা আসছে কেন। অলককাকু চলে গেলে একদম একা থাকতে হবে তোমায়, তা খেয়াল করেছ ? সিকিউরিটির প্রশ্ন নেই একটা ?

সুনয়নী শান্তভাবে বলল, সেই দরকারেই তো একটা ঘরগেরস্তী ভাড়াটে জোগাড় করছি রে ?

জোগাড় করছ ? তুমি কোথা থেকে জোগাড় করছ ?

বড়দির শ্বশুরবাড়িরই কে যেন। দুটো ঘরের মধ্যেই দশজন থাকবে। নিরাপত্তার অভাব আর থাকবে না তোদের মার।

ওঃ। সেই বড়মাসি। তার মানে অবধারিত তুকতাক। যাক। বয়ে গেল। ওদের হাতের বাইরেই যখন চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

মুখ হাড়ি করে বলল, যা খুশি কোরো। দয়া করে আমরা থাকতে থাকতে অলককাকুকে কিছু বলতে যেও না।

কেন ? সব শক্ত ভারটাই মা বইবে ?

মেয়েদের অনুরোধ রাখল না সুনয়নী, যখন অলক আর ওরা খেতে বসেছে, (সুনয়নী তো এখন টেবিলচ্যুত) ফট করে বলে বসল,তা হলে অলকবাবু কাল থেকে আপনার সেই স্বাধীনতার পাইস হোটেলই ভরসা ?

চমকে মুখ তুলে তাকাল অলক। প্রিয়তোষ চলে যাবার পর, এই প্রথম সুনয়নীকে নিজস্ব ভঙ্গিতে কথা বলতে শোনা গেল। তার মানে আস্তে আস্তে ফর্মে এসে যাবে। আশার কথা ! কিন্তু কথাটার মানে কী ?

চমকে উঠল বুলি-বাবলিও।

ঘরের কথাই তো বলার কথা ছিল। এটা আবার কী ? এই নতুন কথাটার অর্থ ?

সুনয়নী সমবেত চমকে-ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে অথবা না তাকিয়ে বলে উঠল, কন্যারা তো আজ চলে যাচ্ছেন। আর গিন্নির তো হেঁশেলের বালাই-ই নেই আর। স্বপাকে একপাক পিন্ডি সেদ্ধ করার ওয়াস্তা। তোমার তো একটা গতি চাই।

তা কথাটা তাই। সেই রকমই চালিয়ে চলেছে সুনয়নী।

নিয়মভঙ্গের পর কোনো শুভানুধ্যায়িনী হৃদয়বতী করুণাবিগলিত গলায় বলেছিলেন বটে, আর এখন হবিষ্যি কেন ? এর পর তো নিরিমিষ তরিতরকারি সবই খেতে পারো ভাই। সুনয়নী জবাব দিয়েছিল, নিরামিষ তরকারি আবার তরকারি ! অরুচি।

তা সে যাক। কিন্তু এখন কি এই কথাটা বলবার কথা ছিল ?

মেয়েদের দুজনের মাথা দুটো নেমে প্রায় পাতের সঙ্গে ঠেকে গেল। শুধু অলক চোখ তুলে বলল, তা সেই একপাকের পিন্ডিতে আমার আপত্তি হবে একথা ভাবছ কেন ?

তোমার আপত্তি না থাক, আমার আছে। আমি কোন্‌দিন রাঁধি, কোন্‌দিন না রাঁধি, তার ঠিক নেই। তোমায় নিয়ে অস্বস্তি।

আমায় নিয়ে অস্বস্তি !

অলকও মাথা নিচু করে বলল, ঠিক আছে। কাল থেকে তাই হবে।

ঘরে এসে বুলি বলল, মা ! এটার মানে ? বলবে ঘরের কথা, হঠাৎ খাওয়ার কথা হল যে ?

সুনয়নী বলল, ভেবে দেখলাম, একটা পুরনো বট কাটতে, একেবারেই গোড়ায় কোপ দিলে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবার ভয় থাকে। গাছ কাটিয়েরা আগে কিছু ডালপালা ছেঁটে নেয়।

মাকে ভূতে পেয়েছে, এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হয়ে দুজনে বাবার ছবিকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বরের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল। দুজনের একই স্টেশন। একজন দুর্গাপুর একজন আসানসোল।

অলক ওদের সঙ্গে হাওড়া পর্যন্ত গেল। সুনয়নী আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রিয়তোষের সেই এনলার্জড ছবিটার সামনে গিয়ে আস্তে বলল, খুব তো দয়ামায়া করতে মনে হতো! এখন? এখন ছুরি শানাবার শক্তিটা দাও।

স্টেশন থেকে ফিরে অলক টেবিলে মাথা নামিয়ে বসেছিল।

পুরুষ মানুষের কান্না মানায় না, তাই কাঁদছিল না। শুধু সেই বেমানান কাজটা অলক একবার করে বসেছিল। যখন প্রিয়তোষের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে তার কলেজ থেকে দিয়ে গিয়েছিল। আর ডাক্তার এসে ঘোষণা করেছিল, এ সংজ্ঞা আর ফিরবে না। তখন অলক সেই বেসামাল কাজটা করে উঠে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'সুনয়নী এখন আমাদের কী হবে?'

শুনে সুনয়নী যেন অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

সুনয়নী তো অনুচ্চার চীৎকারে বলে চলেছিল, 'এখন আমার কী হবে! এখন আমার কী হবে?' এ ছেলেটা বলল 'আমাদের কী হবে?'

অথচ সুনয়নী তখন, সে স্টেশন থেকে ফিরেছে দেখে ছুরি শানিয়ে বট গাছের গোড়ায় কোপ দিতে এল।

বলল, বাড়িটা কী রকম লাগছে? বেশ ভূতের বাড়ি ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে না?

অলক মুখ তুলে তাকাল।

সুনয়নী বলল, চটপট এই ভূতুড়ে বাড়ি থেকে কেটে পড় হে আর্টিস্ট, তোমার তল্পিতল্পা নিয়ে।

কেটে পড়ব!

অলক প্রায় বোকার মত তাকাল।

সুনয়নী বলল, পড়বে না তো কী করবে? তোমার আশ্রয়দাতা তো বিনা নোটিশে তোমায় পথে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি একা মেয়েমানুষ, কোন শক্তিতে ঘরে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করে রেখে দেব বল?

অলক একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে বলল, ধরে নিতে হবে সংসারে 'মানুষ' শব্দটার কোনো মূল্য নেই।

সুনয়নী বলল, কানাকড়াও না।

ক'দিন ধরে সারাক্ষণ কোথায় না কোথায় ঘুরে অলক একদিন এসে বলল, আমার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, যাচ্ছি। শুধু এই জিনিসটাকে রাখি এমন জায়গা জুটল না। এটাকে একটু

জায়গা দিতে হবে।

সুনয়নী তাকিয়ে দেখল, এ সেই পুরনো কালো রঙা ট্রাঙ্কটা, যাতে অলকের প্রথম যুগের অসংখ্য স্কেচ। হাত পাকানোর নমুনা। যাদের মধ্যে জমানো আছে সুনয়নী নামের মেয়েটার কৈশোর যৌবন, প্রথম তারুণ্য, প্রথম মাতৃত্বের ঔজ্জ্বল্য।

সুনয়নী সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, গঙ্গায় তো অনেক জল, এটার একটু জায়গা হল না ?

অলক বলল, খেয়াল করিনি। ইচ্ছে হলে তুমিই দেখো আছে কি না ততো জল। চাবিটা রাখো।

পাগল না কি ? চাবি নিয়ে কী করব ?

কোথায় যাচ্ছি, জিজ্ঞেস করলে না যে ?

সুনয়নী বলল, 'পাষণ্ডী' বলে কি পুরো কসাই ?

অলক হাসল। বলল, 'পাষণ্ডী' ভাবলে কি আর তোমার কাছে আমার এই যথাসর্বস্ব গচ্ছিত রাখতে আসতাম ? ঠিকানাটা রেখে যাচ্ছি, বাবলিকে দিও। নইলে কেঁদে মরবে!

কতদিন পরে যেন বাবলি এল একদিন কলকাতায়। ঠিকানাটা পেয়ে ও কেঁদে ফেলে বলল, এতো খারাপ ব্যবহার করা হল অলককাকুর সঙ্গে, তবুও ক্ষমা করেছেন। ভেবে পাই না মা, সামান্য কিছু টাকার জন্যে চিরদিনের স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক! ছোটবেলা থেকে সমবয়সী—

কেউ কি কোথাও ফস করে দেশলাই জ্বাললো ? সুনয়নীর চোখে তার আঁচ ঝলসে উঠল ?

সুনয়নীর গলার স্বরে এসে লাগল সেই আঁচ ?

যেন দীর্ঘদিনের জমাট হয়ে থাকা দুঃখ যন্ত্রণা লজ্জা হাহাকার আগুন হয়ে ফেটে ছড়িয়ে পড়ল। সেই আগুন-ঝরা গলায় বলে উঠল সুনয়নী, এই পৃথিবীকে তুই জানিস না বাবলি! না কি জেনে বুঝে ইনোসেন্ট সাজছিস ? শুধু টাকার জন্যে ?

তোদের বাবা আমায় একা ফেলে দিয়ে চলে গেল, বলে গেল না আমি কী করব! এই একা বাড়িতে আমি যদি আমার ওই চিরকালের ভালবাসার চিরকালের সমবয়সী বন্ধু মামাতো দ্যাওরটাকে নিয়ে যেমন ছিলাম তেমনি থাকতে চাইতাম তোদের সমাজের চোখ কপালে উঠতো না ? বন্ধু বলে মানতো ? সুনজরে দেখতো সে বন্ধুত্ব ? কালি ছিটোতে এগিয়ে আসতো না ? স্নেহ ভালবাসা মায়া মনুষ্যত্ব এসব প্রকাশের অধিকার মেয়েদের নেই বাবলি।

বাবলি থতমত খেল। তবু বাবলি তার সেই ইনোসেন্টের ভূমিকাটাই আঁকড়ে থেকে বলে উঠল, ইঃ! এই বয়েসে, জামাই হয়ে গেছে, কে তোমায় কী বলতে আসতো শুনি ?

সুনয়নী বিদ্রূপের হাসি হেসে তেতো গলায় বলল, নিজের মা বোনই আসতো! চল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, আর জামাই হয়ে গেছে বলেই কি কেউ ছেড়ে কথা কইতো ? শুনে

তোরাও ছাড়তিস না কি ? 'মা' বলে রেহাই দিতিস ? মেয়েমানুষই মেয়েমানুষের গায়ে এক কথায় কালি ছিটিয়ে বসে বাবলি। আর সেটা আপনজনেই করে। মেয়েরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে জানে না, ভালবাসতে জানে না। এতবড় সত্যিটা এতদিন জানা ছিল না, তোদের বাবা জানার জানলাটা হাট করে দিয়ে গেল।

সত্যিই এই নির্লজ্জ সত্যটা আগে জানা ছিল না সুনয়নী নামের সধবা আহ্লাদে ভাসা মেয়েটার, প্রিয়তোষ মারা যাবার আগে। সুনয়নী চিরদিন জেনে এসেছে জীবন মানে 'সুখ', জীবন মানে 'ভালবাসা'। জীবন মানে নিশ্চিন্ততা।

হয়তো সেই জানাটার এমন নিষ্ঠুর মৃত্যু ঘটতো না যদি প্রিয়তোষ নামের লোকটা এমন অসময়ে মারা না যেতো।

❑

ছুটি নাকচ

চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল।... একটা ? একটা দুটো তিনটে চারটে।... হাঁ করে তাকিয়ে দেখে মালতী। যেন এ রকম স্বর্গীয় দৃশ্য জীবনে দেখেনি।...

দেখেনি। পুরো তিন তিনটে বছর দেখেনি মালতী রাস্তা, গাড়ি, পথচলতি মানুষ ! ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না। তিন তিনটে বছর মালতী তার জানা পৃথিবীর বাইরে একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে কাটিয়েছে।.... আর এখন আরো অবাক লাগছে আবার সেই পুরনো পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে।... হঠাৎ নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে নিল মালতী ঘটনাটা সত্যি না স্বপ্ন।

কাল রাত্তিরেই সেই পাজিটা—মালতী জানে না তাকে কী বলে চিহ্নিত করতে হয়। সর্দার ! না কর্তা ? কে জানে। জানতে ইচ্ছেও হয়নি কোনোদিন। মনে মনে তাকে মালতী 'পাজি'টাই বলে। তা, সে কাল রাত্তিরে খ্যাক খেকিয়ে হেসে বলেছিল, 'কাল সকালে তো তোর ছুটি হয়ে যাবে রে মালতী।'

ছুটি। ছুটি হয়ে যাবে ! মালতী এই গারদ থেকে ছাড়া পাবে ? বিশ্বাস হয়নি।... সারারাত ভয়ানক একটা 'যন্ত্রণা'র মত চিন্তায় জেগে কাটিয়েছে। ঘুমোতে পারেনি। বারে বারে ভেবেছে পাজিটা তাকে খেপিয়ে মজা দেখতে অমন একটা 'সুখবর' দেয়নি তো ? মিছিমিছি করে ?

কাল সকালে মালতী যখন জিগ্যেস করবে,'কই ছুটি হল ?' তখন ওই শেয়াল হাসিটা হাসবে।...কিন্তু আজ সকালে সত্যি সত্যিই এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটলো। কে কোথা থেকে বিশ্রী একটা কর্কশ স্বরে বলে উঠলো মালতীদাসী...ঈ ঈ ছুট্‌টি !...

তারপর কার সঙ্গে কীভাবে জেলখানার মধ্যে থেকে বার হয়ে জেল গেট-এর বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াল নিজেই বুঝে উঠতে পারল না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত চলে এল।...

আসার আগে কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল। তাদের মুখে হতাশা। আবার হয়তো হিংসেও !..কিছু একটা বলে উঠল দু একজন, কিন্তু মালতী ঠিক বুঝতে পারল না। নিজেও কিছু বলতে গেল, তাও বলা হল না। সঙ্গে পাহারাদারটা গরু তাড়ানোর মত 'হেট হেট' করে ঠেলে বার করে নিয়ে এল !

'ছুটি' হয়ে গেছে। ছাড়ান পেয়ে গেছে, তবু এদের এক্তারে যতক্ষণ থাকতে হবে এরা খানিকটা দুর্ব্যবহার করে নেবেই।

সেই তিন বছর আগে—

মালতী যখন শুনেছিল তার 'জেল' হয়ে গেল, মনে করেছিল জেলখানায় ঢুকেই গলায় দড়ি দেবে।... মেয়েছেলে হয়ে জেল ! কী লজ্জা। কী লজ্জা। তাদের বস্তিতে কোন মেয়েটার কপালে এমন ঘটেছে ? মোটামুটি বস্তিটা গেরস্থবস্তি।... মেয়েপুরুষে সবাই খেটে খায়।... ছেলেপুলে নিয়ে 'সংসার' করে।... হয়তো সবক্ষেত্রে পুরুষগুলো 'খেটে' খায় না, অথবা খেটে যা যা রোজগার করে তাতে মদ তাড়ি খায়, এবং পরিবারের রোজগারে ভাতটা খায়।... তবে খাটেও অনেকে। মেয়েগুলো সবাই খেটে খায়। সাত আট বছর বয়েস থেকে মায়েদের সঙ্গে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যায়। ছোট ছেলেগুলোও খাটতে বেরোয়। তবে রাতে ফিরে এসে একটা ডেরায় ঢুকে পড়ে ঘুমোয়।... একখানা মাত্রই ঘরের সম্বল, তবু তার মধ্যেই জন্মমৃত্যু মিলনবিরহ এবং কলহ কোঁদলের লীলা চলে নিজ নিয়মে। আর তার মধ্যেই একটা 'সংসার সংসার' ভাব থাকে।

এইজন্যেই পঞ্চাননতলার ওই বস্তিটাকে 'গেরস্থবস্তি' বলা হয়। এদের মধ্যে যে সব 'যুগলজীবনের' প্রবাহ তাদের মধ্যে তাদের সম্পর্কের 'বৈধতা' নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে আসবার সময় নেই কারো। অতএব বলা যায়, আজকের আমাদের দেশের শিক্ষিত নারী সমাজের মধ্যে 'নারীমুক্তি'র পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহবন্ধনের ফাঁস থেকে মুক্ত হয়ে যে 'লিভ টুগেদার' প্রথার প্রবর্তনের দাবিতে আধুনিক পত্রপত্রিকা সোচ্চার, এরা সেই প্রথায় 'বিশ্বাসী' বহু আগে থেকেই। 'নিরক্ষর' এবং 'নারীমুক্তি' শব্দটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও।

এদের কাছে বর্তমানটাই সত্য।

কিন্তু মালতীরা এমন নয়। মালতী আর অমূল্য রীতিমত বিবাহিত দম্পতি ! 'জেলা হাওড়া সজনেপোতা'র অনন্ত গড়াইয়ের ছেলে অমূল্য গড়াইয়ের সঙ্গে পাশের গ্রাম চন্ডীখোলার কেতু দাসের মেয়ে মালতী দাসের বিবাহ কালে নাপিত পুরুত, শঙ্খধ্বনি, কলাতলা, ছাঁদনাতলা সব কিছুই হয়েছিল। অথচ সেই মালতীরই এমনি কপাল, মেয়েছেলে হয়ে জেল হল। কী লজ্জা ! কী ঘেন্না।...

সরকারি জেলখানায় মেয়ে কয়েদীর অভাব নেই। কিন্তু এতটা জানা ছিল না মালতীর। তাই, যখন হুকুমটা শুনতে পেল তখন তার মনে হয়েছিল, ভূভারতে এমন ঘটনা বুঝি এই একটাই ঘটনা...অতএব গারদের মধ্যে ঢুকেই গলায় দড়ি।...দড়ি না জোটে পরনের শাড়িখানা তো আছে ? ওর ফাঁসেও কাজ হয়।

কিন্তু ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে এসে তাজ্জব বনে গিয়েছিল মালতী। এতো মেয়েছেলে জেলে ভর্তি ?...বুড়ি থেকে যুবতী গাদাগাদা মেয়ে।

দেখে শুনে 'শাড়ি দড়ি' ওগুলো আর তেমন ঠ্যালা মারল না মালতীকে। ভাবল তাড়া কী ? দেখাই যাক। শাড়িটাতো হাতে রইলই।

আর সেই দেখাটা দেখতে দেখতে দিনরাত মাসগুলো পার হতে হতে তিনটে বছরও কেটে

গেল। অবশ্যই ঝরঝরিয়ে কেটে যাওয়া নয়, প্রতিক্ষণ কাটতে কাটতে কাটা।

তবু কাটল।

জেল গেট-এর বাইরে এসে মালতী উদভ্রান্ত হয়ে চারদিক তাকালো। কোথায় সেই চিরপরিচিত মুখটা ?... খাঁড়া নাক চওড়া কপাল পেটানো শরীর ঢ্যাঙা গড়ন তামাটে রঙ মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ? মালতী যে আজ ছাড়া পাবে সে খবর তার জানা নেই !

অবিশ্যি ইদানীং আর অনেকদিন আসেনি অমূল্য। যা এসেছিল গোড়ায় গোড়ায়। তা বলতো আসতে যেতে অনেক সময় যায়, কাজের ক্ষতি হয়। পয়সাও তো কম খরচ হয় না ? মালতী নিজেই বলেছিল 'তো নিত্যি আসায় কাজ নাই।' একেবারে সেই ছাড়ার দিনটাতেই চলে এসো। ফেরার কালে দুজনায় মা কালীর থানে পূজো দিয়ে ঘরে ফিরব।

কিন্তু কোথায় অমূল্য ?

ও কি তা'লে তারিখটা জানেনি ?

বড় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকায় মালতী। জেল কর্তৃপক্ষ তার হাতে একটা পুঁটুলি ধরিয়ে দিয়েছে বেরোবার সময়। এটা নাকি মালতীর নিজস্ব সম্পত্তি, জেলখানায় ঢোকবার সময় ওর সঙ্গে যা ছিল।... কী বা ছিল ? তখন ভবিষ্যুক্ত হতে গায়ে একখানা চাদর দিয়েছিল আর অমূল্য একখানা নতুন গামছা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। আর ছিল হাতে পরা একগোছা প্লাষ্টিকের চুড়ি। এগুলো যে কেন খুলে রাখতে হয়েছিল জানে না মালতী।... তবে এরা কিছু পয়সাও দিয়েছে রাহা খরচ বলে।

অমূল্য এল না। অনেকদিনই আসে নাই।

শরীর গতিক ভাল আছে তো ? ছেলেটাই বা কেমন থাকল ?...তিন বছরের ছেলেটা এতদিনে ষেটের ছ বছরেরটি হবার কথা।

ছেলেটাকে একবারও আনেনি অমূল্য।

মালতী যখন লোহার গরাদে মুখ চেপে কেঁদে ফেলে বলেছিল, গোপালটারে একবার আনলে নাই ?

অমূল্য উদাস ভাবে বলেছিল, ওরে বলি নাই। বলেছি তোর মা বাপ-ঘর গেছে।

অন্যজনেরা কী আর না বলে ছেড়েছে ?

বলেছে। সব্বাই ফিসফিস গুজগাজ করে আবার বলেও নিয়েছে। আমি গোপালকে বুঝিয়েছি, তোর মা বাপ-ঘর গেছে। বাপের ব্যামো।

কিন্তু বাপের ব্যামো কতদিন থাকে আর যদি সেই ব্যামো থেকে মুক্তি হয়, তখনো মাকে বাপ-ঘর থাকতে হয় কেন ? এ প্রশ্ন গোপাল তার বাপকে করেছিল কিনা সে-খবর পায়নি মালতী। মুখ্যু আর অভাগাদের ধৈর্য বেশি। তারা আপন জন বিদেশে গেলে দু-ছমাসে লোকমুখে একটা বার্তা পেলেও নিশ্চিন্ত থাকে। জানে, সেই যথেষ্ট। ভাগ্যবানেদের মত সাগরপারে যাওয়া আপনজনেদের সঙ্গেও হরঘড়ি যোগাযোগের কথা ভাবতে পারে না।

মালতী মনিববাড়িতে দেখে শুনে হাঁ হয়ে যেত। মনিবগিন্নী টেলিফোন তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতো। আর পরে বলতো ছোটবোনের সঙ্গে কথা কইছিলাম।

কিন্তু কোথায় সে ছোটবোন ? কখনো তো দেখি না ?

ওমা দেখবে কোথা থেকে ? সে তো বিলেতে থাকে ।

বিলেতই বলত। মুখ্যুদের বোঝাতে সাগরপারের সকল দেশকেই বিলেত বলতে হয়। ওটাই ওরা বোঝে।

তা ভাগ্যমন্তদের তো—আবেগ ভালবাসা 'মন কেমন' সবই বেশি বেশি। বিলেতের ছোটবোনকে ডেকে যখন তখন কথা না কয়ে থাকতে পারে না।

মালতীদের কথা আলাদা।

মালতীদের অপেক্ষার শিক্ষা আছে। মালতী তাই দিন গুনেছে, আর ভেবেছে গিয়ে গোপালটারে কতটি ডাগর দেখব কে জানে। তেমন কী আর হয়েছে ? কে যত্নআত্তি করেছে ? অমূল্যর হাতেই তো হাঁড়ির ভার পড়েছে ! কী বা রেঁধেছে কী বা খেয়েছে বাপ বেটায়।... তার রঙ মিস্ত্রীর কাজটাও তো বজায় রাখতে হয়েছে।... মালতী মনিববাড়ি মাস মাস আশিটাকা করে পেতো। প্লাস দুবেলা বাড়ির চা রুটিটাও বাঁচতো। সেটা তো গেছে।...

মনিবগিন্নীর সুখ্যাতিতে শতমুখ হতো মালতী। বস্তির সবাইকে ডেকে ডেকে গল্প করতো। মনিবগিন্নীর বদান্যতায় মালতী কত রঙবেরঙের ভাল ভাল শাড়ি পরেছে।...আধপুরনো হলেই দিয়ে দিতো।... মালতী বলতো, ওরা তো আমাদের মতন বাঙালী না, বুড়োগিন্নীও রঙচঙা কাপড় পরে।

বাঙালী নয় বটে তবে কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে আমাদের মতনই কয়। বরাবর এইখানেই তো। অমন মানুষ হয় না।

কিন্তু এখন ?

এখন মালতী দু বেলা সেই মনিবগিন্নীকে শাপশাপান্ত না করে জলগ্রহণ করে না। মালতীর জীবনটা ধ্বংস হল তো তার জন্যেই !

অবশ্য মিথ্যে বলবো না মালতীরও 'লোভ' হয়েছিল। কিন্তু এও বলতে হবে তার থেকেও বেশি হয়েছিল মায়া আর সমীহ।... অমন মান্যিমান মানুষটা মালতী হেন তুচ্ছ মানুষটার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করছে ! চোখের জল ফেলছে ! এ দৃশ্য তাকে বিচলিত করেছিল।

নাঃ কোনোদিকে কোথাও অমূল্যর ছায়া নেই।

আস্তে আস্তে একলা একলা এগোয় মালতী। তাদের দিকে বাসের রাস্তাটা কোন দিকে ? অনেকদিন পথে পা দেয়নি, এই সকালের আলোতেও কেমন গা ছমছম করছে।

হঠাৎ একটা লোক-এর ছায়া পড়ল সামনে। ছায়াটা দীর্ঘ।... কে ? অমূল্য আসছে না কি ?

নাঃ। ক্ষণিকের আশার-আলোর ঝিলিকটা নিভে গেল।

অমূল্য নয়। তবে গড়নে পেটনে যেন অমূল্যের ধরন। তেমনি লম্বা পেটা শরীর, মুখ চোখ কাঠ কাঠ, একটুখানি গোঁফের বাহার। তবে গায়ের রঙটা নিকষ কালো।

লোকটা মালতীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল, ছুটি হয়ে গেল ?

মালতী চমকে উঠল।

মালতী যে এতদিন গারদে ছিল, আর আজ ছুটি হয়ে গেল, তা জানলো কী করে লোকটা ?

মালতী তাই সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, চিনতে পারলুম নাই তো !

লোকটার হাতেও একটা পুঁটুলি। সেটাকে শরীরের সঙ্গে চেপে একটা আড়ামোড়া ভেঙে বলল, চিনতে আর পারবে কেমন করে ? এক সঙ্গে তো আর থাকা নাই। দেখা দেখি তো নাই। তুমি হলে গে ফিমেল ওয়ার্ডের।... আমারও আজ ছুটি হয়ে গেল।

মালতী আবার একবার চমকালো। এই লোকটাও তাহলে কয়েদী ?

আশ্চর্য, মালতীর কিন্তু লোকটাকে মোটেই সগোত্র মনে হল না। ভাবল, ও বাবা। এ তাহলে একটা চোর ডাকাত। বেজার মুখে নেহাত সৌজন্য বজায় রাখতে বলল, অ।... কতদিন পরে ?

লোকটা বলল, কে জানে। অত হিসাব নাই। তা বছর চার হবে। মেয়াদের সময় বোধহয় তাই বলেছিল।

মালতী ভাবল, চার বছর। তার মানে আমার থেকে বেশি পাপী।...তারপর ভাবল, আমি তো আর সত্যি পাপী নই। কপাল ক্রমে–

লোকটা আবারও বলল, তোমার তো দেখছি আমার মতন কপাল।... গেট-এ কেউ নিতে আসে নাই। তা তুমি মেয়েছেলে, কেউ একজন তো– কেউ নাই বুঝি ?

মালতী মনে মনে 'ষাট' দিয়ে বেজার মুখে বলে, থাকবে নাই ক্যানো ? স্বামী আছে ছেলে আছে। আসতে পারে নাই। কে জানে শরীলগতিক কেমন রয়েছে ?

কতদিনের মেয়াদ ছিল ?

লোকটার জিগ্যেস করায় মালতীর হাড় জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু মেজাজই বা দেখায় কী করে ? এর কাছ থেকেই হয় তো জেনে নিতে পারা যাবে পঞ্চাননতলার বাসে চাপতে হলে কোন দিকে দাঁড়াতে হয়। কত নম্বরে চাপতে হয়। তাই অনিচ্ছের সঙ্গে বলল, তিন বছর।...

অ।... তা যাবে কোনদিকে ?

মালতী হাতে চাঁদ পেল। তাড়াতাড়ি বলল, পঞ্চাননতলা। তো কোন বাসে চাপতে হবে ?

লোকটা আবার আড়মোড়া ভেঙে বলল, শহরে 'পঞ্চাননতলা' তো একটা নাই, গোটাকতক আছে।

ওমা ! শোনো কথা। হাওড়া পঞ্চাননতলা আবার কটা আছে ?

অ। হাওড়া পঞ্চাননতলা ! সে তো বেশিদূর হবে না। যাবে তো, চলো দেখিয়ে দিই !

মালতীর মনে হল হঠাৎ লোকটা এমন নেই আঁকড়াপনা করছে কেন ? কোনো বদ মতলব নেই তো ? উল্টোপাল্টা বাসে চাপিয়ে অন্য কোনোখানে নিয়ে গিয়ে ফেলার তাল করছে না তো ? দেখছে বেওয়ারিশ একটা মেয়েছেলে ফ্যালকা মুখো হয়ে ঘুরছে।.. আবার ভাবল, তা বাস গাড়ি তো আর ফাঁকা যাবে না ? আর যারা চেপেছে দেখবো তাদের শুধোবো।..

তাই বলল, তুমি আবার আমার লেগে কষ্ট করবে ? তোমার কোন দিক ?

আমার ?

লোকটা কালো কুচকুচে মুখে শাদা দাঁত মেলে হাসলো, আমার কোনো দিকবিদিক নাই। যে কোনো একটা দিক বেছে নিলেই হল।... চলো ওই দিক বাগে–

কিন্তু দু চারপা এগিয়েই বলল, আমার কিন্তু বিস্তর খিদে লেগেছে।... একটু কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয়। ওই ও দিকে একটা চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে–

শুনে মালতীরও মনে পড়ল তারও তো খুব খিদে পেয়েছে। অন্তত চা একটু খেতে পারলে মন্দ হয় না।... বিনা প্রতিবাদে ওর সঙ্গে এগোলো।

চায়ের দোকান না, চায়ের দোকান রাস্তার এলাকা ছাড়িয়ে একটা এবড়ো খেবড়ো জায়গায় একখানা ছাউনি। সামনে টানা লম্বা একটা ফাটা চটা কেঠো বেঞ্চি পাতা।

লোকটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে হাঁটুর কাছে গুটিয়ে থাকা পায়জামাটা টানটান করে দরাজ গলায় বলল, দুটো চা, দুখানা করে নেড়ো বিস্কুট !...

মালতী পুঁটলির মুখ খুলবার চেষ্টা করতে করতে বলল, আমার পয়সাটা আমি দেবো !

লোকটা হাত নাড়া দিয়ে বলল, থাক না। বেটাছেলে সঙ্গে থাকলে, মেয়েছেলেকে চা খাবারের দাম দিতে নাই।

মালতী আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

খুব ঘুঘু নয়তো ? আস্তে আস্তে ফাঁদে ফেলতে চায় ? কিন্তু মুখটা তো তেমন দেখাচ্ছে না। কেমন যেন উদাস উদাস আলগা আলগা ভাব। তবু মালতী একটু ঝাঁজ দেখিয়ে বলল, জানা নাই চেনা নাই, তোমার পয়সায় খাবো ক্যানো ?

জানা চেনা নাই। তা বটে।

লোকটা একটু হেসে বলল, শাস্তর পড় নাই, না ?

শাস্তর।

হ্যাঁ তো। শাস্তরে লেখা আছে–দুই মনিষ্যি যদি একসঙ্গে আড়াই পা হাঁটে তো বন্ধু হয়ে যায়। তো কত পা তো হাঁটা হল।... হল না ?

মালতী অতএব শাস্ত্রবাক্য মেনে নিল।

বিস্কুটে কামড় দিতে দিতে লোকটা বলল, কেসটা কী ?

অ্যাঁ। কী বললে ?

বলছি, তোমার কেসটা কী ছিল ?

লোকটাকে দেখে যেন আর তেমন সন্দেহ আসছে না। শাস্ত্রবাক্যের প্রভাব কি না কে জানে।

মালতী আস্তে বলল, সে অনেক কথা। একের পাপে আর-এর দন্ড। তো কেসটা ছেলেচুরি।

ছেলেচুরি!

সেই তো—দুদিনের বাচ্চা! হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে এসে—

হঠাৎ যেন মালতীর প্রাণের ভেতরটা উথলে উঠল। নিজের কয়েদের ইতিহাস জেলখানায় দুচারটে মেয়ে কয়েদীর কাছে করেছে বটে। তবে তারা তেমন বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয়নি।...এ লোকটা মনে হচ্ছে বিশ্বাস করবে। ভিতরের আবেগ দুঃখ জ্বালা হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। আর অদ্ভুত একটা কাহিনী শোনালো!...অথবা অদ্ভুত নয়, ইহ সংসারে এমন আকছারই হয়। পঞ্চাননতলার মালতীর সেটা জানা ছিল না।

মালতী কাজ করতো এক মস্ত বড়লোকের বাড়ি। কর্তার বড়বাজারে গদি আছে। গাড়ি আছে দু'দুখানা।... কিন্তু নেই একটা জিনিষ! তার নাম হচ্ছে শান্তি।

দু দুটো ছেলে। তারা বাপের বিজনেস না দেখে বেশি লেখাপড়া শিখে পরের দোরে চাকরি করাই ভাল মনে করে একজন দিল্লি আর একজন বোম্বাই গিয়ে বসে আছে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে।.. তো একটা মাত্র মেয়ে সেও দূরে। বিকানিরে তার শ্বশুরের মস্ত ব্যবসা। কিন্তু মেয়েটার বছর ছ-সাত বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়নি।...

মেয়ের চিঠিতে জানতে পারছে এই জন্যে মেয়েটার শ্বশুরবাড়িতে গঞ্জনার শেষ নেই। স্বামী সুদ্ধু অনাদর অবহেলা করছে এবং শাশুড়ি শাসাচ্ছে আর একটা বছর দেখবে, তারপর ছেলের আবার বিয়ে দেবে।... ছেলেমেয়ে নাহলে ডির্ভোস দেওয়া আইনে আছে।... এইরকম চলছিল। আর সে মেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল। তো ভগবানের দয়ায় এতদিন পরে তার সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।...শরীর খুব খারাপ। শাশুড়ি বৌকে মা বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং শাসিয়েছিল...'মেয়ে' কোলে করে ফেরা চলবে না। ছেলে চাই। বংশের বংশধর! এত সম্পত্তির মালিকটা কে হবে, যদি বৌ ফেলিওর হয়?

কিন্তু ভাগ্যের নির্লজ্জ পরিহাস!

সেই উৎপীড়িতা মেয়ের পুত্র সন্তানই হল, কিন্তু অকালে মৃত!

মেয়ে হয়তো তখনই আত্মহত্যা করে বসতো। যদি তার উঠে বসবার ক্ষমতা থাকতো। আগলে আগলে রেখেছেন বৃদ্ধা মহিলা। তখনই তিনি বাড়ির বাসনমাজুনি ওই মালতীর কাছে কেঁদে পড়লেন, যেমন করে হোক একটা সদ্যোজাত ছেলে বাচ্চা এনে দিতে হবে তাঁকে।

এর জন্যে তিনি মালতীকে নিজের গলার একছড়া দশভরির পাকা সোনার হার করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যেখানে যত ঘুস লাগে তা দেবেন।...

তোদের বস্তি থেকে হোক,কোনো অখ্যাত হাসপাতাল থেকে হোক! হাসপাতালের

আয়ার সঙ্গে আঁতাত করে অথবা জমাদারনীদের ঘুস খাইয়ে।

মালতীর বিবেক চিন্তাকে প্রশমিত করতে যুক্তিও দিয়েছিলেন, আরে বাবা, হাসপাতাল থেকে কুকুর শেয়ালে 'বাচ্চা' তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অসাবধান আয়াদের অবহেলায় কত বাচ্চা মরেই যাচ্ছে। আর যদি বা টিকছে তো ওই সব দীন দুঃখীর ঘরের বাচ্চারা কুকুর বিড়ালের মত 'মানুষ' হচ্ছে।... এদের একটাকে যদি ওই আস্তাকুড় থেকে তুলে এনে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দাও, সেটা পাপ না পুণ্যি ?...

যে ঘরানার মহিলার পা ছুঁতে সাহস হবার কথা নয় মালতীর মত দরের লোকের, তিনি মালতীর হাত ধরে আবেদন করলেন এবং মিনতি করলেন যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়।

মালতী অবশ্য কাকপক্ষী জনসমাজ কাউকে টের পেতে দেয়নি। শুধু জানিয়েছিল স্বামীকে। বলেছিল, ভেবে দেখো সত্যি পাপ না পুণ্যি ?...তাছাড়া ওই দশভরি সোনা হাতে পেলে তুমি এই রঙ মিস্তিরীর কাজ আর পঞ্চাননতলা বস্তি ছেড়ে দিয়ে দেশে ঘরে গিয়ে আগের মতন দোকান দিয়ে গুছিয়ে বসবে।

লোকটা অবাক হয়ে বলেছিল দেশ, ঘর আছে না কি ?

এ প্রশ্নেরও উত্তর অনেক কথায়।..'আছে' নয় বটে, তবে ছিল। চিঁড়ে মুড়কি খই বাতাসা আর গুড়ের দোকান ছিল।... কিন্তু বছর দশেক আগের সেই আকালের বছরে অন্ন অন্ন করে হাহাকার। কোথায় চিঁড়ে মুড়ি খই মুড়কি ?.. তার উপর আবার অভাবের সময় যা হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে জমির ধান চালের ভাগ নিয়ে বচসা। আর এদিকে জায়ে জায়ে কোঁদল।

ধুত্তোরি। রোজ রোজ এই অশান্তি ! এর থেকে শহরে গিয়ে 'দুই মনিষ্যি হাতে পায়ে খেটে জেবন কাটাবো—' বলে বৌকে নিয়ে চলে এসেছিল অমূল্য।

তখনো গোপাল জন্মায়নি, তাই দুই মনিষ্যি।

তা চলছিল তো ভালই।

যদিও অমূল্য মাঝে মাঝে বলতো, দূর এই বস্তির কিচকিচিনি আর ভাল লাগে না।... তবে রঙের কাজটা ভালই শিখে নিয়েছিল। হঠাৎ ওই মনিবগিন্নীর রূপ ধরে কালগ্রহ এসে আছড়ে পড়লো মালতীদের জীবনে।

মনিবগিন্নীর দেওয়া(খরচা বাবদ) এক হাজার টাকার অর্ধেকটা অমূল্যর কাছে রেখে বাকি অর্ধেকটা দিয়েই কাজ ম্যানেজ করে ফেলেছিল মালতী। সাঁতরাগাছির এক নেহাত দীনহীন হাসপাতাল থেকে।

জমাদারনীরই মাধ্যমে। তো সে পরমানন্দে টাকাটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে যা বলেছিল তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ এতে মালতীর অধর্ম নেই। ওই যে আধুবুড়ি মেয়েছেলেটা ? কুলিবুস্তির বাসিন্দে ! পাঁচসাতটা ছেলেমেয়ের মা ওটা। তো নেই ঘরেরই তো খাঁই বেশি ? তাই আবার এসেছে হাসপাতালে ছানা পাড়তে।... বছরে বছরে একবার করে আসে, কিন্তু ছানা পাড়ে যেন বেড়ালছানা। ফুটফুটে নাদুসনুদুস।...তারপর সেগুলো হাড় চামড়া সার হয়ে আধ উলঙ্গ

মূর্তিতে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। নিয়ে যাও এবারেরটাকে। কুকুরে নিয়ে গেছে বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

তো হয়ে গিয়েছিল সবটাই।

ন্যাকড়া মোড়া দিন দুইয়ের বাচ্চাটাকে নিয়ে রিকশায় উঠেওছিল মালতী সন্ধ্যে সন্ধ্যে সময়। রিকশাওলার কাছে 'নিজের বাচ্চা' বলে চালিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বোধহয় ওই জমাদারনীদের মধ্যেই কারো সঙ্গে বখরার ভাগ নিয়ে বচসা হওয়ায় সে ফাঁস করে দিল।...

মনিববাড়ির কাছ বরাবর এসে ধরা পড়ে গেল মালতী।...

কিন্তু মালতী মন্ত্রগুপ্তির শপথটি পালন করেছিল। বলেছিল, নিজেরই লোভ হয়েছিল।

স্বীকারোক্তির পর আর তাকে কেউ ছাড়ে ?

মালতীর দণ্ডাদেশ হয়ে গেল।

এই রকম সব ছোট খাটো আসামী দিয়ে জেল ভরতে পারলেও জেলখানার একটা মান মর্যাদা বজায় থাকে।...

আরো এক প্রস্ত চা নেওয়া হয়েছিল। তারপর উঠে পড়া মালতী চলতে চলতে বলল, কথাগুলো তবু একজনার কাছে বলতে পেরে মনটা একটুক হালকা হল। তো নিজের কথাই সাতকাহন।...তোমার বিত্তান্ত তো কিছু জানা হল নাই।

আমার আবার বিত্তান্ত। 'জেল' আমার জল ভাত।

অ্যাঁ। আরো হয়েছে ?

তবে আবার কী ? ভাড়াটে গুন্ডা। কোনোখানে জমি নিয়ে লাঠিবাজি করতে দরকার পড়লেই এই নিকুঞ্জর ডাক পড়ে। তো এবার ভুলক্রমে একটা বড় পার্টির লোকের মাথা ফাটিয়ে মরে কয়েদটা হয়ে গেল। কেউ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না।

মালতী অবাক হয়ে দেখল। লোকটা কত সহজে দোষ কবুল করল।

নাম তাহলে নিকুঞ্জ ?... দেশ ঘর কোথায় ?

দূর ! দেশও নাই, ঘরও নাই।

আহা কোথাও তো একদিন জন্মেছিলে ? মা বাপও ছিল ?

নাঃ। ওসব কিছু দেখি নাই। নিজেকে ভুঁই ফোঁড় বলেই জানি।.. নাও চলো চলো কোথায় তোমার পঞ্চাননতলার নন্দীবাবুর বস্তি !...

কিন্তু কোথায় সেই পরমধাম ?

মালতীর চোখের ওপর যার ছবিখানি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।... সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে বেড়ার গায়ে নিজের যে ফুলছাপ ব্লাউজটা আর গোপালের নীলরঙা হাফ প্যান্টটা মেলে দিয়ে এসেছিল সেটাও বুঝি দেখতে পাবে এই ব্যগ্রতা নিয়ে বাস থেকে নেমে হনহনিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কোথায় কী ?

রাস্তা ভুল করে অন্য কোথাও চলে এল না কি মালতী ?

নিকুঞ্জ বলল, তোমার বোধহয় বিস্মরণ হয়ে গেছে গো। অন্যদিকে হবে।

বিস্মরণ ? বললেই হল ? এইতো এই ইস্কুল বাড়ি তারপর যদুর মুদিখানার দোকান...তারপর

তারপর ? তারপর আর কী উঁচু উঁচু বাড়ি।... নতুন রঙ করা জানলা দরজা, বারান্দায় রঙিন শাড়ি ঝুলছে। জানলায় জানলায় পর্দা।... এইসব দরজা জানলা রঙ করেছে কে ?

মালতী দিশেহারা হয়ে উর্ধ্বমুখে সেইখানেই পাক খেতে থাকে।

নিকুঞ্জই দোকানী পশারিদের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে জেনে এল খবরটা।

নন্দীবাবুরা বস্তি উঠিয়ে জমি বিক্রি করে চলে গেছে। সেখানে এই সব ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে।

আর বস্তিতে যারা ছিল ?

তাদের সন্ধান কে রাখতে গেছে ?

কাউকে কিছু বলে যায় নাই ?

কে কার জামাই বোনাই ? অ্যাঁ ?... কে কার কড়ি ধারে ?

মালতী রাস্তার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠে বলল, এতো গুলান গেরস্থ ছানাপোনা নিয়ে উচ্ছেদ হয়ে গেল কেউ একবার কারো ঠিকানাটাও জানতে চাইলে না ? এমন পাষাণ পাড়া ? মায়া নাই ? রিদয় নাই ?

যাদের কানে গেল তারা 'পাগলি' ভেবে ফ্যাকফেকিয়ে হেসে চলে গেল।

এখন কী করবে ?

নিকুঞ্জ পথের ধারে একটা পুরানো বট গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বিড়ি ধরিয়ে বলল, তোমার নন্দীবাবুর বস্তি তো ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে একটা পরীর রাজ্য বসিয়ে দিয়েছে। এখন ?

মালতী এখন হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, ওরে গোপালরে !... তোরে কে কমনে কোথায় নিয়ে গেল রে ?

নিকুঞ্জ নীরবে বসে বসে বিড়িটা শেষ করতে লাগল। কোনো সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করল না।

একসময় নিজেই থামল মালতী।

তারপর বলল, তবে আর জেবনধারণে কাজ কী ? যাই মা গঙ্গার কোলে জুড়োইগে। শেষমেশ তুমি আমারে গঙ্গার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। তারপর তোমার ছুটি।

নিকুঞ্জ বলল, তো চল। আমারও মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা ডুব দিয়ে নিইগে।

তা ডুব দিয়ে কি শুধু নিকুঞ্জই উঠল ?

মালতী উঠল না ?

তা অবশ্য হল না।

নিকুঞ্জ বলল, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয় ? ডুবটা সেরে দুজনাই এই পৈঠেয় বসে ভিজে কাপড় জামা গায়ে শুকয়ে নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি, কাছ পিঠে কোথাও ভাতের হোটেল আছে কিনা।

পয়সা আছে অত ?

হয়ে যাবে।

তো আমার কাছে যা আছে ন্যাও। আড়াইটে টাকা দিয়েছে দেখছি।

নিকুঞ্জ হাসল, বাকি আড়াইটে মেরে দিয়েছে আর কী !

ভাত জুটল। ডাল ভাত আর একটা ঘ্যাঁট। তো,তাই অমৃত। একটা করে পানও খাওয়া হল।

মালতী কী যেন একটা কারখানার শেড-এর ধারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ন্তবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—এতক্ষণ তো যা হোক হল। এইবার ? রাত হলে কোথায় আচ্ছয় ? জেলখানার মধ্যে তো তবু এ ভাবনা ছিল না।

নিকুঞ্জ সেই কালো কুচকুচে মুখে শাদা দাঁত বিকশিত করে হেসে উঠে বলল, যাবে না কি আবার ? বলো তো চলো হাজতে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে পারি।... আমার অনেক দোস্ত স্যাঙাত আছে।

মালতী বলল, গলায় দড়ি।

তারপর মালতী এক আকাশ ছোঁওয়া আবদার করে বসল।

এই দিনভোর আমায় নিয়ে অনেক 'নাটাঝামটা' খেলে। চেনা নয় জানা নয়। আপনজনের অধিক করলে। তো শেষমেশ আমায় একটা ঠাঁই পৌছে দাও। তারপর তোমার ছুটি।

কোনখানে ? অ্যাঁ ?

কোনখানে আর ? সেই জেলা হাওড়া, গ্রাম সজনেপোতা, 'ঈশ্বর অনন্ত গড়াইয়ের বাটি।' ওই একটা ঠিকানাই তো মুখস্ত মালতীর।

আঁচলে চোখ মুছে বলে মালতী, মন নিচ্ছে বস্তি উচ্ছেদের জ্বালায় ছেলেটাকে নিয়ে সেখানেই গেছে মানুষটা। তবু তো সেখানে খুড়িটা জ্যেঠিটা রয়েছে। ছেলেটাকে দেখবেই হেলায় ছেদ্দায়।.... তো, এখান থেকে খুব দূর না। ওই হাওড়ার গুমটি থেকে বাস ছাড়ে। বাস গাড়ির গায়ে লেখা থাকে—চন্ডীতলা, সজনেপোতা, বাকুলি—

জানি, জানি। ওসব জায়গা আমার খুব চেনা আছে।

অ্যাঁ ? তাই বুঝি ? তবে তো ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। সেখানে আমারে একটুক পৌছে দাও।... বুঝছি তোমার ওপর খুব জুলুম হচ্ছে। কিন্তুক আমার একটা ব্যাবোস্তা না করেও তো তোমার ছুটি নাই।

অমূল্য গড়াইয়ের পরিবার মালতী গড়াইয়ের একটা ব্যাবোস্তা না করে ভাড়াখাটা গুন্ডা

নিকুঞ্জ দাসের ছুটি নাই কেন ? এ প্রশ্ন মাথায় আসে না মালতীর।

নিকুঞ্জ বলল, জুলুমের কথা হচ্ছে না। তবে তোমার সজনেপোতার গঁড়াই বাড়ি যদি নন্দীবাবুর বস্তির মতন উবে গিয়ে বসে থাকে, সেই ভাবনা।

মালতী আশ্বাসের গলায় বলে, গাঁয়ে ঘরে অমন শহর বাজারের মতন দুমদাম চেহারা পাল্টায় না। বিশ পঞ্চাশ বছর একই ভাবে থাকে।

তবে আর কী করা ? রাতটুকু এই বন্ধ কারখানার মোড়-এর ধারে পাশে একইভাবে বসে থেকে ভোরবেলা বাস ধরা। যে বাসের গায়ে লেখা থাকে চন্ডীতলা সজনেপোতা বাকুলি।

তা মুখ্যু হলেও একটা বিষয়ে বোধ বুদ্ধি আছে বৈকি মালতীর।....

গ্রাম গঞ্জের চেহারা যে বিশপঞ্চাশ বছর প্রায় একইভাবে থাকে সেটা খুব ভুল নয়। বাইরের দিকে যদি বা এদিক ওদিক হচ্ছে ভেতরের দিকটা একই রকম রয়ে যায়।

বাস থামবার মুখোমুখি মালতী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, দ্যাখো দ্যাখো আমি বলি নাই 'এক রকম ভাব থাকে'।.. ওই তো শেতলাতলা পার হয়ে গেল ওই তো 'বুড়োশিবের থান'... ওই তো সেই হেলে পড়া বটগাছটা—

নামবার জায়গায় কিছুটা ভিড় কিছুটা কোলাহল। চায়ের দোকানের সামনে মাটির ভাঁড়ের তৎপরতা।

নিকুঞ্জ বলল, এবার পথ চেনার ভার তোমার। চিনে যেতে পারবে ?

মালতী সভয়ে বলল, তুমি আমায় এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে ?

না তা যাবো নাই।... এখানেই আছি ফেরত-বাস ছাড়া পর্যন্ত। গাঁয়ের বৌ এতদিন বাদে একটা পরপুরুষের সঙ্গে ফিরলে এটা লোকে ভাল চক্ষে দেখবে না।

ঠিক। কথাটার যৌক্তিকতা আছে।

মালতী দু পা এগিয়ে বলল, তুমি নয় ততোক্ষণ দোকানের ধারে গিয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও।

সে আমি বুঝবো।... ঘন্টা দুই বাদে ফেরত-বাস ছাড়বে। তুমিও ততোক্ষণে যদি ফিরে না আসো বুঝবো তোমার শ্বশুরের ভিটেটা উপে যায়নি।...

তবু মালতী একটু দাঁড়ায়।

কী হলো ? পথ মনে পড়ছে না ?

না না। সে খুব মনে পড়ছে। বলছি, তালে তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে নাই ?

নিকুঞ্জ বিড়িতে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে, আর দেখা হওয়ায় কাজ কী ? একদিনের বন্ধু বৈ তো না।

মালতী তথাপি ইতস্তত করে বলে, তা বটে। তবে তুমি আমার এতটা উপগার করলে আর বাড়ির দোর থেকে অমনি মুখে ফিরে যাবে ? যতই হোক গেরস্থ বাড়ি—

নিকুঞ্জর কাষ্ঠ-কঠিন মুখে একটু সূক্ষ্মহাসি ফুটে ওঠে। তবে বেশ স্বচ্ছন্দ গলায় বলে,

বেশ তো গিয়ে যদি তেমন জুত বরাত দেখো, জলপানির রেকাব সাজিয়ে কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিও।... এখানেই তো রইলাম।

সে তোমায় চিনবে ?

ভাবতে হবে না আমিই চিনে নেব।

বলে একটা খুঁটি ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।...

কিন্তু শ্বশুরের ভিটেটা উপে গেছে কিনা, সেটা দেখবার জন্যে কি মালতীকে ভিটে বরাবর যেতে হল ?

হঠাৎ সামনেই শ্বশুরবংশের বংশধর। মালতীকে দেখে প্রায় ছিটকে উঠে বলল, কে ?

মালতী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিগলিত গলায় বলল, যা মন নিয়েছিল তাই ! ঠিক বুঝেছি, নন্দীবাবুর বস্তি উচ্ছেদে ছেলে নিয়ে এখানেই এসেছ।... বলে কিনা গড়াইবাড়ি উপে যায় নাই তো ? কাল ছাড়া পেলাম।

অমূল্য গড়াইয়ের মুখটা কঠোর কঠিন হয়ে ওঠে। দাঁতে পেষা চাপা গলায় বলে, কাল 'ছুটি' হয়ে গেল তাই আজই ছুটতে ছুটতে এখানে এসে ধাওয়া করা হলো ? আচ্ছা আসপদ্দা তো।... কয়েদখাটা মেয়েছেলে, গড়াইবাড়ি ঢুকতে এসেছ ?

মালতী কেমন ফ্যালকা মুখো হয়ে তাকায়, লোকটা অমূল্যই তো ? আস্তে বলে, তো আর কোথায় যাবো ?

কেন যমের বাড়ি ছিল না ? যমের বাড়ি ? গলায় দড়ি দিতে পারনি ? যাও যাও। খবরদার আর এগোতে চেষ্টা করবে না।

আমারে তাড়িয়ে দেছ ?

আরো চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে অমূল্য, না তো কী, ঘানি ঘুরিয়ে আসা চোরচোট্টা পরিবারকে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যাব ? যাও। যাও।

আসলে ভয়ানক অস্বস্তি পাছে কেউ দেখে ফেলে। লোক জানাজানি হবার আগে ঠেলে পার করে দিতে পারলে বাঁচা যায়। অন্য সময় এখানে তেমন লোক চলাচল নেই, কিন্তু এ সময় যথেষ্ট আছে। বাস থেকে লোক নামে, এখান থেকে কড়েয়া আনাজপাতি শাকসব্জির ঝাঁকা নিয়ে কলকাতামুখো ট্রাকে তুলে দিতে যায়।... মালতী যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বিছে কামড়াবে অমূল্যকে !

মালতী কেঁদে ফেলে বলে, চুরি চোট্টামি আমি নিজের জন্যি করি নাই। তোমার জন্যিই করেছিলুম। তা বেশ ঘানি ঘোরানো পরিবারকে ধুলো পায়ে বিদেয় দেওয়া যদি ধর্মে হয়, তো দাও। তো আমার গোপালকে আমারে দাও।

গোপালকে। বটে বটে। সাধে বলছি আসপদ্দা। ঈশ্বর অনন্ত গড়াইয়ের নাতিকে তোমার হাতে তুলে দেব ? বেশি দিক বোকো না বলছি। যাবে ? না গলাধাক্কা দিতে হবে ?

মালতী চোখ মুছে শক্ত হয়ে বলে, অতটা করতে হবে না। গোপালকে একবার চোখের

দেখা দেখে যাই।

আঃ। এতো ভাল ঝামেলায় পড়া গেল। গোপাল জানে, তার মা মরে গেছে। গাঁয়ের লোকও তাই জানে। এখন হঠাৎ তার মরা মায়ের পেত্নী নামিয়ে নাটক করতে বসব নাকি ? তুমি যাবে কিনা ?

ততক্ষণে দু একটি লোক এসে জুটে গেছে।

কী হয়েছে ? অ্যাঁ ? কী হয়েছে ?

আর বল কেন ? কোথা থেকে একটা পাগলি এসে— যত বলছি সরে পড়ো নড়ছে না।...

তাই না কি ? তাই না কি ?

এগিয়ে আসে ওরা উৎফুল্ল ভাবে। আহা 'পাগল' 'পাগলি' বড় খাশা জিনিস। বিনি খরচে কিছুক্ষণ আমোদ করে নেওয়া যায়।... কিন্তু সে সুযোগ হয় না তাদের। ততক্ষণে মালতী উল্টো পাক খেয়ে হন হন করে বাসগুমটির কাছে এগিয়ে যায়।

নিকুঞ্জ একটু হেসে বলল, কী হল ? শ্বশুরের ভিটে উপেই গেছে তো ?

মালতী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, হ্যাঁ !

নিকুঞ্জ অনাসক্ত গলায় বললো, এক্ষুনি একটা কাঁচাবাজারের ট্রাক ছাড়বে। ড্রাইভারটাকে পটিয়ে রেখেছি । কচু কুমড়ো ঝোড়ার খাঁজে খাঁজে একটু বসতে দেবে।

বাজার ট্রাক। খোলা ব্যাপার।

নিকুঞ্জ আগে নিজে উঠে পড়ে শির ওঠা কেঠো হাতখানা বাড়িয়ে মালতীর একখানা হাত ধরে হিঁচড়ে ওপরে তুলে নিয়ে একটু খাঁজ দেখিয়ে বলে, বসে পড়ো।

মালতীর মনে পড়ে না লোকটা ওই কেঠো হাতখানা দিয়ে একটা মানুষের মাথা ফাটিয়ে বছর চারেক জেল খেটে বেরিয়েছে। মালতীর এখন দড়ি কি শাড়ি এ-ও মনে পড়ল না। আস্তে বলল, তোমার তালে আর ছুটি হল নাই ?

কই আর হলো ?

আবার একটা বিড়ি ধরালো।

চারদিকে নানা কোলাহল। তার মধ্যেই মালতী আবার এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে আপনমনে বলে, একদা এই সজনেপোতা থেকেই দুই মনিষ্যি মনের খেদে বেরিয়ে পড়েছিলুম যা আছে ললাটে বলে, আজও আবার সেই ঘটনা, সেই বিত্তান্ত।

❑

ত্রাণকর্তা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করো দেবু, জগতে সবাই সত্যি অসৎ নয়। হয়তো পরিবেশের চাপে—

সত্যব্রত তাঁর স্বভাবগত ভারী আর খাদে-নামা গলায় বললেন, আমি বলছি ছেলেটা জাত অপরাধী নয়। পরিবেশের চাপেই—

সত্যব্রতর গলার স্বর যেমন গভীর গম্ভীর, পুত্র দেবব্রতর গলার স্বর তেমনি হালকা আর চড়া। দেবব্রত অনেকটাই তার মার মত। মায়ে ছেলে দুজনেই সত্যব্রতকে 'মিনমিনে' এবং ভাববিলাসী বলে অভিহিত করে থাকে।

অতএব এখন বাপের এই মানবিকতায় আশাবাদী বাক্যটি দেবব্রতর কাছে 'অমৃতং বালভাষিতং' এর মতই মনে হল। এবং নিজস্ব স্বাভাবিক চড়া গলাকে আর একটু চড়িয়ে বলে উঠল দেবব্রত, আপনার ওই সত্যযুগমার্কা মহৎ চিন্তাটিন্তা এযুগে অচল বাবা। পাজিটাকে থানায় জমা দিয়ে তবে আমার কাজ! বিশ্বাস!! মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখবার চেষ্টা করতে হবে! কোথায় আছেন আপনি এখনো? কোন স্বর্গীয় স্বপ্নলোকে বাস করছেন?

সত্যব্রত একটু হাসলেন। বললেন, হয়তো মূর্খের স্বর্গেই। তবু 'স্বর্গসুখটা' তো লাভের খাতায় জমা পড়ছে। অগাধ অনন্ত নরকের থেকে এমন কী খারাপ?

দেবব্রত আরো চড়ল। বলে উঠল, আমি বলি— খুব খারাপ। একটা মিথ্যে রঙের রঙিন চশমা পরে সংসারটাকে দেখে সন্তোষ পাওয়া শুধু বোকামিই নয়, মিথ্যাচারও! আপনি কি বলতে চান আজকের পৃথিবীতে আপনি সব মানুষকে বিশ্বাস করেন?

সত্যব্রত আবারও হাসলেন। বললেন, 'করি' এমন কথা বলতে পারব না, তবে বিশ্বাস করার, বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করি। অবশ্য আজকের 'কেসে' চেষ্টা করে নয়, আমি সত্যিই বিশ্বাস করছি, ছেলেটা জাত অপরাধী নয়।

দেবব্রতর গলার স্বরে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে উঠল। দেবব্রতর ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে গেল।

দেবব্রত বলে উঠল, যদিও ছেলেটা পাকা চোরেদের মতই রেন্‌ওয়াটার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছে।

আহা সে তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—

'কথাটা কী হচ্ছে' সেটা আর বলে উঠতে পারলেন না সত্যব্রত। রান্না ঘরের দিক থেকে

চলে এসেছেন নীহারকণা। পিতা পুত্রের বাক্যালাপের কিছুটা তাঁর কানে ঢুকেছে। তাই এই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

নীহারকণার হাতে একটা ভিজে গামছা, সেটাকে ঝাড়তে ঝাড়তেই চলে এসেছেন, এবং সেটাকে অহেতুকই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ওঠেন, কী কথা হচ্ছে রে দেবু ? ওই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে ?

দেবব্রত ব্যঙ্গ আর ক্ষোভের গলায় বলে ওঠে, ছেড়ে দিতে হলেও তো ছিল ভাল ! ওকে বাড়িতে রাখতে হবে, মহৎ ব্যবহারের দ্বারা ওকে সংশোধন করা হবে।

নীহারকণা চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, তাই তুই শুনবি ? লোকটার মাথাটা যে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, তা টের পাচ্ছিস না ? রাখ ওর কথা। এই দণ্ডে মিচকেটাকে থানায় জমা দিয়ে আয়। কে বলতে পারে, ওর সূত্র ধরেই একটা বড় গ্যাং ধরে পড়ে যাবে কি না ! নে, চা খেয়েই বেরিয়ে পড় সন্তোষকে নিয়ে। হাতের বাঁধন খোলার আগে একবার দেখে নিস, পকেটে ছুরিফুরি আছে কিনা ?

সতব্রত চমকে উঠে বললেন, হাত বেঁধে রাখা হয়েছে না কী ?

নীহারকণা জোর গলায় বললেন, তা হবে না ? হাত খোলা থাকলে কী না কি করতে পারে ঠিক আছে ?

সত্যব্রতর খাদে নামা গলা থেকে একটা কথা উঠে এলো, ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়েছিল না ?

তা তো ছিল। বলি তালা খোলা মাত্তর যদি ছুরিফুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাপকে বিশ্বাস করতে আছে ? দেবু যা ! বৌমা চা নিয়ে বসে আছে। খেয়ে নিয়েই, ওই পাপকে বিদেয় করে আয়।

নীহারকণা যত সহজে বলতে পারলেন, 'লোকটার' মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর কথা ছাড়, দেবব্রত অবশ্য তত সহজে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

স্ত্রী যত সহজে দাপুটে কথা বলতে পারে, পুত্র তা পারে না। কারণ একজনের হতমান্য হলেও অপমান নেই, অপরজনের এতটুকু এদিক-ওদিকেই অপমান। বিশেষ করে বিবাহিত পুত্রের।

তাই দেবব্রত মায়ের এই জোরালো নির্দেশের পরও বাঁকা গলায় বলল, বাড়ির কর্তার হুকুম না পেলে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়।

বলে চলে গেল। বোধহয় চা নিয়ে অপেক্ষারতার উদ্দেশে।

ব্যাপারটা জটিল।

গতকাল রাত্তিরে, প্রায় মাঝ রাত্তিরেই, এক ঘুম থেকে উঠে নীহারকণার মনে হলো, জানলা দিয়ে যেন আসন্ন বৃষ্টির মত জোলো জোলো হাওয়া আসছে। এইটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যাবেলা কুলের আচারের থালাটা ঘরে তোলা হয়নি।

বুকের ওপর দিয়ে বৃষ্টি বয়ে গেলে, কুলের আচার যে, 'কুলাঙ্গার' হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। ত্যাজ্য করা ছাড়া উপায় থাকবে না। মনে হতেই নীহারকণা আলস্য ত্যাগ করে সেই রাত দুপুরেই মরতে মরতে ছাদে উঠেছিলেন।

সিঁড়ির দরজায় ভেতর থেকে ছিঁটকিনি দেওয়া থাকে। সেটা খটাং করে খুলে ফেলে যেই না দরজাটা হাট করেছেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন চোখের সামনে থেকে কে যেন একজন ফস করে সরে গেল।

নীহারকণা এমন ভীতু নন যে ভূত ভাববেন। অতএব ফট্ করে ছাদের সামনের আলোর সুইচটা অন্ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে র‍্যা ? কে ওখানে ?

ওখানে 'যে', সে অবশ্য সরে এসে বলে উঠল না, 'আমি !' নীহারকণা তাই পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠলেন 'চোর ! চোর !'

অতএব আশেপাশে 'বাতায়ন খুলি যায় ঘরে ঘরে, ঘুমভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে—' আর এদিকে বাড়ির সবাই হন্তদন্ত হয়ে (শব্দ লক্ষ্য করে) ছাদে উঠে এসেছে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার ! কর্তার ছেলের বৌমার এবং ভৃত্য সন্তোষের।

বেচারি চোরটার আর পালাবার উপায় রইল না, হাতে হাতে ধরা পড়ল।

বছর বারো তেরোর একটা কাদাখোঁচা চেহারার হ্যাংলামার্কা ছেলে। পরনে একটা সুতো ঝুলে পড়া হাফপ্যান্ট আর গায়ে একটা পিঠছেঁড়া গেঞ্জি।

সন্তোষ তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে আলোর মুখোমুখি দাঁড় করাল। আর সেই সময় সকলেরই মনে হল, মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

কে তুই ?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে সন্তোষের বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, কেউ না।

কেউ না ! ব্যাটা পাজি শয়তান ! বল কে ?

বলানো অবশ্য গেল না। তবে নীহারকণার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রশ্নের উত্তরটা আবিষ্কার করে ফেলল। নীহারকণার চাঁচাছোলা গলার প্রশ্নটা রাতের আকাশকে বিদীর্ণ করে ঠিকরে উঠল, তুই পারুলের ছেলে কানাই না ?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে থেকেই এবং হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে কিছুক্ষণ পরিচয়টা অস্বীকার করার চেষ্টা করল। 'পারুল' কে তা কস্মিনকালেও জানে না, বলল, তার পরই হঠাৎ কেঁদে ফেলে গর্জন করে উঠল, হাতটা ভেঙে দেবে নাকি ? ছেড়ে দ্যাও বলচি।

সত্যব্রত বললেন, ছেড়ে দাও সন্তোষ। ওই পাকাটির মত হাড় ভেঙে যেতেও পারে।

সন্তোষকে অতএব ছাড়তেই হল।

ছেলেটা হাতটায় ফুঁ দিতে দিতে বলে উঠল, উঃ। এমন মোচড় দেবে ! যেন ইস্কুরুপের প্যাঁচ মারচে ! আঙুল না সাঁড়াশি !

নাঃ ! এ ছেলে পারুলের ছেলে কানাই না হয়ে যায় না ! কথার ভঙ্গিই সঠিক চিনিয়ে দিয়েছে।

পারুল একদা এ সংসারে বাসনমাজুনি ছিল। কানাই নামের বছর আড়াই তিনের ছেলেটাকে নিয়ে কাজ করতে আসতো। এবং ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দেওয়া বাসি রুটি অথবা শুকনো পাউরুটির টুকরোটা শেষ হওয়া মাত্রই এমন চেঁচাতে শুরু করতো যে, সত্যব্রত হাতের খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে বিপন্ন গলায় বলতেন, ওরে বাবা, এ কানাই না সানাই ! তো ওকে কিছু দাও না।

নীহারকণা রেগে বলতেন, আসা মাত্তরই দেওয়া হয়েছে।

তবু আবার দিতেনও চারটি মুড়ি মুড়কি, কি দুখানা মিয়োনো বিস্কুট। না দিয়ে উপায় কী ? ছেলের চেঁচানির জ্বালায় যদি কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে বাধ্য হয় পারুল। ভারী পেয়ারের লোক ছিল পারুল নীহারকণার। যেমন পরিষ্কার কাজ, তেমনি নম্র ব্যবহার। যত বেশী কাজই পড়ুক, কখনো বেজার হতে জানত না।

নীহারকণা বলতেন, তোর ছেলেটা আর একটু বড় হলে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব পারুল, চেঁচানি কমবে।

তা বড় হয়ে চেঁচানি ক্রমশ কমেছিল। তবে ইস্কুলে ভর্তি করে নয়। ইস্কুলের নামে কানাই শতহস্ত দূর। সেই ভয়ঙ্করের হাত এড়াতে কানাই, 'গেরস্থর' কাজ করতে বসতো টেনে টেনে।

ইঃ। দাদুর জুতো জোড়া কী ধুলো ধুস্কুত্তি। বাড়িতে কী একখান বুরুশও নাই ?

খুঁজে পেতে বুরুশ এনে ঝাড়তে বসতো।

ইস। খবরের কাগচগুলো সিঁড়িতে ডাঁই করে কে রাকে ? দেকতে বিচ্ছিরি নাগে না ? বসে বসে চোস্ত করে কাগজগুলো পাট করে, থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখতো সিঁড়ির জানলায়। চটজলদি কাজও করতো।

ওরেব্বাস। এখেনে জল ফেলে ঢেউ দিয়েচে কে ? মানষের আচাড় খেতে খুব মজা হবে কেমন ?

কোথা থেকে একটু ন্যাতার টুকরো জোগাড় করে মুছতে বসতো !

তো এই ছেলেকে কে ইস্কুলে পাঠাতে যাবে ? ক্রমেই বালক ভৃত্যের পোস্টটা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল। তখনো এ সংসারে সন্তোষের আবির্ভাব ঘটেনি। আবির্ভাব হয়নি 'বৌমার'ও । বড় আরামেই দিন যাচ্ছিল নীহারকণার। কিন্তু এমনি কপালের ফের নীহারকণার, ভরন্ত বয়েস জলজ্যান্ত পারুলটা কিনা একদিনের 'ভেদবমি' হয়ে মরে গেল।

নীহারকণা কপালে করাঘাত করে লোকের কাছে আক্ষেপ করতে লাগলেন, 'বাসনমাজুনি কাপড়কাচুনি কাজের লোকেরা ছেড়েই যায় জানি, 'মরে' যায় এমন শুনেছ কখনো ? মনে মনে ভাবতুম, এবার ওর মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দেব।'

তা বেচারী পারুল তার স্নেহময়ী মনিবানীর মনের এই শুভবাসনাটির খবর না জেনেই

চলে গেল। নীহারকণার চোখে সর্ষেফুলের ক্ষেত ! কানাইয়ের মা মরায় পিসি এসে নিয়ে গেল। তখন কানাইয়ের বছর সাতেক বয়েস।

এতদিন পরে সেই কানাই।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। প্রবল জেরার মুখে।

চোর হয়ে উঠেছিস পাজি ? আর এই বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিস ? নেমকহারাম পাজি।

পাজিটার জোর গলার প্রতিবাদ, কখনো সে চুরি করতে ঢোকেনি। শুধু—

কী শুধু ? বল ! বল শয়তান শুধু কী ?

ওরা বলল, তুই এ বাড়ির সন্দান সুলুক জানিস, কোনো প্রেকারে বাড়ির মদ্যে ঢুকে পড়ে দুয়োরটা খুলে দে। তালে পাঁচটা ট্যাকা পাবি। উঃ ! খুব শিক্ষে হয়েচে। ট্যাকা তো জুটবে কাঁচকলা, লাবের মদ্যে হাতখানাই গেল।

এহেন বাক্যিবুলির পর ছোঁড়াটা যে চড়চাপড় গাঁট্টা খাবে না, এমন তো হতে পারে না। বিশেষত যেখানে দেবু এবং সন্তোষ উপস্থিত। বেশ মোক্ষম মোক্ষম থাপ্পড়ই পড়েছে। এবং তার সঙ্গে পুলিশে দেবার শাসানি।

প্রহারের বহর দেখে সত্যব্রত না বলে পারেননি, এখানেই যদি হতভাগাকে ফিনিশ করা হয় দেবু, তো কাকে আর পুলিশে দেবে ? আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াও একটা অপরাধ জানো তো ? পুলিশ যদি ওর গায়ে মারের দাগ দেখে, হয়তো আমাদেরও ধরে চালান করে দিতে পারে।

পুলিশের ভয়ে না হোক বাবার প্রতিবাদে বিরক্ত হয়েই প্রহারটা ছেড়ে দিয়েছিল দেবু। অগত্যা সন্তোষও। এবং তখনি নীহারকণা নির্দেশ দিয়েছিলেন নেমকহারামটাকে এখন সিঁড়ির নীচে কয়লার ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দে দেবু। সকালে পুলিশে দিয়ে আসবি।

তখনো পাপিষ্ঠ কানাই সতেজে প্রতিবাদ করে উঠেছিল, পুলিশে ক্যানো ? আমি তোমার কিছু চুরি করিচি ?

এ সময় সত্যব্রত বলে উঠেছিলেন, চুরি না করেছিস, চুরির সাহায্য করেছিস কি না ? দরজা খুলে দেওয়ার মানে কী ? জানিস না, মানে ? ছি ! ছি পাঁচটা মাত্র টাকার লোভে তুই—

কানাইয়ের তেজের আগুনে জল পড়ে গিয়েছিল। আর সেই জলের কয়েক ফোঁটা তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়েছিল।

'পাঁচটা মাত্তর ট্যাকা।' আহা ! তিন দিন পেটে দানা না পড়লে বুজতে ঠ্যালা।

নীহারকণা কড়া গলায় বলেছিলেন, দেখছো আস্পদা। বলি পেটে তিনদিন দানা পড়ে নাই বা কেন ? তোর বাপটাও মরেছে নাকি ?

তা একপ্রেকার মরেইচে। কোতা থেকে একখান খান্ডারনীকে নিয়ে এসে সংসারে পিতিষ্টে

করেচে। নিজেরই হাড়ির হাল। তো আগের পক্ষের ছেলে।

ওঃ! কথার জাহাজ। বলি বয়েস তো হয়েছে, কাজকর্ম করিস না কেন কিছু?

কানাই অবজ্ঞা ভরে বলেছিল, ওঃ কাজ। দেশসুদ্ধু সবাই আমার জন্যে 'কাজ' নিয়ে বসে আচে। দ্যাওনা একখান কাজ জুইটে। দেকি কত বাহাদুর।

এই বাচালতা আর যার হোক নীহারকণার বৌমার সহ্য হয় না।

সে এই জটলাকে উদ্দেশ করে অথবা আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, সারারাত ধরেই এই মুক্তাঙ্গন নাটক চলবে নাকি? আমার আর ধৈর্য নেই বাবা! শুতে যাচ্ছি।

বলে হাই তুলে নেমে যায়।

পরক্ষণেই নাটকে যবনিকা পড়ে যায়। দেবু সন্তোষের সাহায্যে তড়িঘড়ি ছেলেটাকে সিঁড়ির তলার সেই ঘরটায় ঢুকিয়ে দিয়ে তালাবন্ধ করে দিয়ে আসে। যে ঘরটায় একদা কয়লা ঢালা থাকতো বলে এখনো কয়লার ঘর নামেই চিহ্নিত।

ঘরটায় এখন কী আছে?

কী নেই? কয়লা বাদে, সবই আছে অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ফালতু মাল। যে সব জিনিস কোনো কালেও কাজে লাগবে না অথচ, কোনো কালেও প্রাণ ধরে ফেলা হবে না। তবে ঘরটায় সব থেকে যেটা বেশি আছে সে হচ্ছে আরশোলা।

সত্যব্রত একবার ক্ষীণ স্বরে বলেছিলেন, আরশোলায় রাতারাতি সাবাড় করে ফেলবে না তো ছেলেটাকে?

দেবব্রত বলেছিল, তবে না হয়, আপনার ঘরেই নিয়ে গিয়ে শুতে দিন।

বেহায়া সত্যব্রত এরপরও (অধিকতর ক্ষীণ স্বরে অবশ্য) নীহারকণার কাছে আর্জি করেছিলেন, তিনদিন খায়নি না কি বলছিল, ঘরে কিছু নেইটেই?

নীহারকণা ভস্ম করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, কী? ওকে এখন পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়াতে হবে? বলিহারি যাই। তিনদিন খায়নি। সেই কথা বিশ্বাস করলে তুমি? খলের ছলের অভাব আছে?

এই হচ্ছে গতরাত্রির ইতিহাস।

আর সকালের ইতিহাস এই, সত্যব্রত তার পুত্রের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কানাইকে থানা পুলিশ না করে, পূর্বকালের মত ফাইফরমাসের কাজেই লাগিয়ে দেখা হোক!

দেবব্রতর চড়া গলার নিরীহ উক্তি, কী দেখবেন? কোনো একদিন ওর সেই গ্যাংকে ডেকে এনে বাড়িসুদ্ধু খতম করে দিল কিনা?

আর সন্তোষ ঝেড়ে জবাব দিল, ওটাকে রাখলে আমায় ছাড়তে হবে দাদাবাবু। শেষে ওর অপকর্মে চোরের দায়ে পড়ে মরব?

তথাপি হায়াবিহীন সত্যব্রত বলে উঠেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করো দেবু। জগতে সবাই 'সত্যি' অসৎ নয়। পরিবেশের চাপেই হয়েতো—

আরও বলেছেন, আমি বলছি ছেলেটা 'জাত অপরাধী' নয়। ওকে একটা চান্স দিয়ে দেখাই যাক না। হয়তো একটা জীবন শুধরে উদ্ধার হয়ে যেতে পারে।

নীহারকণা অবশ্য একথা পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু দেবু ঘোষণা করে গেল বাড়ির কর্তার হুকুম না পেলে তার দ্বারা কিছু সম্ভব নয়।

কিন্তু কেউ ভাবেনি এহেন মোক্ষম সময়ে সত্যব্রত এমন একটা দুঃসাহসিক কথা বলে বসবেন। কিন্তু বসলেন। একটু হেসে বললেন, 'বাড়ির কর্তা' এই বদনামের দায়ভারটা যখন বইতেই হচ্ছে, তখন একবার না হয়, সেই ভারের কিছুটা উসুল হোক।

অর্থাৎ ?

তার মানে ?

তার মানে কানাই এ বাড়িতেই থাকুক।

ওঃ। কিন্তু এর পর যদি—

যদি তেমন কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় তোমাদের, তো চোর গুন্ডার সহায়ক বলে আমাকেও ওর সঙ্গে থানায় চালান দিও।

নীহারকণা অনুভব করলেন হঠাৎ ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। অতএব আর কিছু করার নেই, একমাত্র দর্পহারীর কাছে আপ্রাণ প্রার্থনা করা ছাড়া।

কানাই রয়ে গেল।

তাকে পরবার জন্যে জোগাড়যন্ত্র করে কিছু দিতেও হল, এবং সকলের আগে তাকে পেট ভরে চা পাঁউরুটি খাওয়ানোও হল। হাড়গিলে মুখটায় পরিতৃপ্তির ছাপটা হল দেখবার মত।

পরাজিতা নীহারকণা দর্পহারীকে কাতর প্রার্থনা জানালেও সন্তোষকে নির্দেশ দিলেন, তুই একটু চোখে চোখে রাখবি।

সন্তোষ উদাসীন গলায় বলল, আমি আর কী চোখে চোখে রাখব ? যা দেখছি—ওতো বাবুর চক্ষের মণি হয়ে উঠবে। যা 'কানাই-কানাই' রব চলছে।

আর বললে বিশ্বাস হবে না, কানাই রীতিমত অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, আমার খাবার সেই কলাই থালাটা নাই ? ফেলে দেচো ? কী কামড়াতেছিল সেটা তোমায় দিদ্‌মা ? ন্যাও এখোন আবার অন্য থালা খুঁজে মরো। একখান ফাটাচটা কলাই থালা, ওই তোমার কয়লার ঘরের মধ্যে রাখলেই হতো। শুদু শুদু কাজ বাড়া।

এই হচ্ছে কানাইয়ের বাকভঙ্গি।

সত্যব্রত নামের এক আত্মস্থ প্রৌঢ় ব্যক্তি কি ওর ওই বেপরোয়া বাকভঙ্গিতেই আকৃষ্ট হয়ে মরছেন ? না কি এ তাঁর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান ?

তবু তাই বলে এতো তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় নেমে পড়াটা কি বেশি দুঃসাহস নয় ? এখন তো নীহারকণা তাঁর দর্পহারীর ক্যাপাসিটি দেখে উল্লসিত হচ্ছেন। ছেলে বৌ আড়ালে হাসাহাসি করছে। এবং সন্তোষ নামক পাজি ছেলেটা সামনেই দাঁত বার করে বলছে, কচি শশা খেতে

এখন আপনাকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে মেসোমশাই। আপনার সাধের নাতি গেরামে গিয়ে শশাগাছ লাগাবে, জল সেঁচবে, গাছ বাড়িয়ে মাচা বাঁধবে, তাপর গিয়ে কচি কচি শশা এনে আপনাকে খাওয়াবে।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা ওই কচি শশা নিয়েই। তিন চারটে দিন না যেতেই সত্যব্রত কানাইকে ডেকে জিগ্যেস করেছিলেন, শশা চিনিস কানাই ? কচি কি পাকা বুঝতে পারিস ?

ওমা। শোনো কতা। চিনব না আবার কেন ? ফুলকচি হলে দুধে রং নোখ ফোটালেই বিঁদে যাবে। আর বুড়ো পাকা হলে—

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝেছি চিনিস। তো যাদবপুর বাজারটা চিনিস তো ?

শোনো কতা। ওইখানেই বলে বলতে গেলে জম্মোকম্মো।

বেশ। দেরি করবি না তো ?

মোট্টেনা। যাবো আর আসবো। দ্যাও ট্যাকা দ্যাও।

সত্যব্রত ওর উৎফুল্ল মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে একখানা কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিলেন।

কানাই একটু থমকে বলেছিল, উরিব্বাস। এ যে অনেক ট্যাকা। অ্যাতো শশা কে খাবে দাদু ?

দূর বোকা। সব টাকারই আনবি নাকি ? পাঁচ টাকার নিবি। তো হিসেব মিলিয়ে বাকি টাকাটা ফেরৎ আনতে পারবি তো ?

কেন পারবনি ? শশা কিনে নিয়ে অগ্রে বাঁ হাতে পনেরোটা ট্যাকা দোকানির কাচ থেকে নিয়ে তবে ডান হাতে এই নোটটা ধরে দেব।

দেখিস। দোকানি তোকে ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে না তো ?

ইস। ঠকালেই হলো আর কী।

ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার ঘুরে দাঁড়াল, দাদু, একটা শক্ত দেকে ঠোঙা দিতে পারবে ? দোকানিরা যা বিছিরি ঠোঙা দেয়। মাজ পতেই হয়তো ছিঁড়ে ছইড়ে যাবে।

সত্যব্রত বলেছিলেন, সেরেছে। ঠোঙা আবার কোথায় পাবো আমি।

তারপরই সদ্য আসা একখানা বিদেশী ম্যাগাজিনের মোটা ব্রাউন খামটা খুলে কানাইয়ের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

পরক্ষণেই কানাই হাওয়া।

বলা বাহুল্য, এই নাটকীয় দৃশ্যটি নীহারকণার অগোচরে থাকেনি ! ওত পেতেই বসেছিলেন তিনি। ছেলেটা ছুটে বেরিয়ে যাবার পর খুব শান্ত গলায় বললেন, হঠাৎ কচি শশা খাবার এতো ইচ্ছে হল যে ?

সত্যব্রত হেসে বললেন, এমনি। মনে হলো শশা দিয়ে মুড়ি খেলে মন্দ হয় না।

তাই পাঁচ টাকার শশা।

আহা আমি কি আর একা খাবো ? সবাই খাবো। পাঁচ টাকায় অনেক হবে না কি ?

নীহারকণা অগ্রাহ্যের গলায় বলেছিলেন, সবাই খেলে এমন কিছু না। তো সন্তোষ আনতে পারতো না ?

পারবে না কেন ? ভাবলাম, ছেলেটাকে একটু তালিম দেওয়াও তো দরকার।

হুঁ। তা পাঁচ টাকার নোট ছিল না বুঝি ?

হাতের কাছে ছিল না।

ভালো। দেখো এখন কানাকুঁজো দুটো শশা এনে খালি হাতে এসে না বলে, দোকানি বাকি ট্যাকাটা ফেরৎ দিল না।

সত্যব্রতর বুকটা যে একটু দমে যায়নি তা বলা যায় না। ছেলেটা যে রকম তীর বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ব্যাস। গেল তো গেলই। সকাল গেল, বিকেল গেল, রাত গেল, না শশা, না কানাই।

এর মধ্যে সন্তোষ বার দুই তিন যাদবপুর বাজারের পুরো তল্লাটটা ঘুরে এসেছে। এবং আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে বলেছে, কানাইবাবুর টিকিটিও দেখলুম না মাসিমা।

এই দেড়দিন ধরে সত্যব্রত এখন সংসারের একটা হাসির খোরাক হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু সে সব গায়ে মাখছেন না সত্যব্রত। শধু ভাবছেন, এতোটা হার হল তাঁর ? একটি নিশ্চিত বিশ্বাসের এমন শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটলো ? তবে মানতেই হবে মস্ত একটা ভুলই করেছিলেন সত্যব্রত।

আশ্চর্য। সামান্য কুড়িটা টাকার লোভে, একটা নিরাপদ আশ্রয়, একটা নিশ্চিত অন্নের আশ্বাস, সব চুলোয় গেল ? এদের মূর্খ বলা হবে, না অপরাধী বলতে হবে ? না কি এরাই জাত-অপরাধী ?

সত্যব্রতর বড় বেশি মুষড়ে পড়া ভাব দেখে, দেবুও আর বিদ্রূপহাস্যরঞ্জিত মুখে বাবাকে জ্ঞান দিতে আসতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। শুধু নীহারকণা এক একবার বলে উঠছেন, আখের বুঝলি না মুখপোড়া ? কুড়ি টাকায় তোর কদিন চলবে ? অ্যাঁ ? রামরাজত্ব করে খাচ্ছিলি। নাতির আদরে থাকছিলি।

কানাইকাহিনী এইখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। নতুনও কিছু না। এমন তো কতই হয়।

কিন্তু জের টানলো সেই ব্রাউন পেপারের মোটা খামটা।

একেই হয়তো বলে 'দৈবচক্র।'

না হলে গাড়ি চাপা পড়া রোগা হ্যাংলা ছেলেটাকে রাস্তার যে লোকেরা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিল, তারা এতো কর্তব্যপরায়ণ হলো যে, ছেলেটার বুকে আঁকড়ানো ঠোঙাটা থেকে ছড়িয়ে পড়া চারটি ধূলোমাখা শশাকে কুড়িয়ে তুলে, আবার ঠোঙায় ভরে সেটাকেও হাসপাতালে জমা দিয়ে রেখে গেলো।

আবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও এতো এনার্জি হলো যে, সেই খামটা থেকে নাম ঠিকানা পেয়ে সত্যব্রত সেন নামের লোকটাকে জানিয়ে দিলেন, দেখতে চান তো চটপট চলে আসুন। আর বেশিক্ষণ নয়।'

এ সবই দৈবক্রম নয় ?

তো 'বেশিক্ষণ' না হলেও ছিল কিছুক্ষণ।

সত্যব্রত কাতরভাবে বললেন, যাদবপুর বাজারে না গিয়ে ঢাকুরেয় এলি কেন কানাই ?

কানাই কষ্টে উত্তর দিল, ওখেনে যে তেমন কচি শশা ছেলো না দাদু। তো একটা লরি পাজি—

সত্যব্রত কি নিজের মাথায় নিজে কিল মেরে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করবেন ? তা তো সম্ভব নয়। তাই শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন ওই মৃত্যুমলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে। নিশ্বাসটা পড়ছে এখনো। আর বেশিক্ষণ পড়বে না।

বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছিলেন সত্যব্রত তবু মুখের রেখায় যেন একটি প্রশান্তির আলো। এ আলো বুঝি কৃতজ্ঞতার। ছেলেটার কাছেই হয়তো কৃতজ্ঞ হচ্ছিলেন সত্যব্রত, যে নিজে মরে সত্যব্রত নামের মানুষটিকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সত্যব্রত আর কোথায় আশ্রয় পেতেন ? হয়তো পেতেন না আশ্রয়। দিনে দিনে শুধু ক্রুদ্ধ, রুক্ষ আর তিক্ত হতে থাকতেন।

❑

আহাম্মুক

ভুজঙ্গো ভুজঙ্গোর মতনই আচরণ করেছে— ঝাঁটা আছড়ে আছড়ে উঠোন সাফ করতে করতে বংশীর দিদি বিশাখা ভাইয়ের দিকে ধিক্কারহানা দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, দুধকলা দিয়ে তোয়াজের বিনিময়ে শিরে ছোবল হেনেছে! তুই যেমন নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, বেকুব গাড়োল! তাই ডাইনের কোলে পো সমোর্পোণ করে নিচ্চিন্দি হয়ে ক্যাঁতামুড়ি দিয়ে শুতে গেলি।... উচিত ফল ফলেছে। এখন বসে বসে আঙুল কামড়া!

বিশাখার কথাবার্তা এই রকমই বেপরোয়া, ভাইয়ের যে বয়েস হয়েছে, সেটা সে গ্রাহ্য করে না। তাছাড়া আজ তো মেজাজ তুঙ্গে! গতকাল রাত্তিরে খুব ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে, উঠোন ভর্তি ঝরা পাতার জঞ্জাল। বিশাখা সেগুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে জব্দ করে নিয়ে জড়ো করছে। এখন উঠোন রোদে ফাটছে, বিশাখার মেজাজও ফাটছে। এতোখানি বেলায় বাসিপাট সারার কথা নয়, আর কাজটা বিশাখারও করার কথা নয়। বিশাখা ভোরবেলা ঘাটে ডুব দিয়ে এসে পুজোপাঠে বসে, তার পর রান্না চাপায়। বাঁধা নিয়ম। কিন্তু আজ সবকিছুতে ছন্দপতন।

বংশী দিদির গলার দাপটে বিছানা ছেড়ে এসে দাওয়ার খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করে বলে, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিস ক্যানো? অ্যাঁ? শিরে ছোবল হেনেছে। একদন্ডে—জজের রায়। কাল ঝড়ের কালে মানুষ দুটোর কোনো বিপদআপদ হল কিনা সে চিন্তা নাই! —কিনা—

কী? ঝড়ের কালে? বলি প্রেলয়ের ঝড় হয়েছিল বুজি কাল। চৈত্তিরের বাতাসে দুটো শুকনো পাতা ঝরেছে, তাতেই দুদুটো দস্যির বিপদআপদের চিন্তে? তুই আর শাক দিয়ে মাচ ঢাকতে চেষ্টা করিস না বন্‌শা। যা ঘটেচে, তা তুইও মনে জানচিস, আমিও মনে জানচি।

বংশীর মাথা ঘুরছিল, পা দুটো কাঁপছিল, কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ। বংশী আর দাঁড়াতে পারে না, খুঁটির গোড়ায় বসে পড়ে মাথাটা টিপে ধরে বলে, না। তোর মন যা জানচে, বংশীর মন তা জানচে না। বংশীর মনে অমন পাপ নাই। কত কারণে বিলম্বো ঘটতে পারে।...এমনও হতে পারে মাজ রাত্তিরে দোর ধাক্কিয়ে, দোর খোলা না পেয়ে ফিরে গেছে—

কী বললি, দোর ধাক্কিয়ে খোলা না পেয়ে ফিরে গেচে? বনশা!

বিশাখা ঝাঁটাটা আছড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, তোর নয় জ্বরাসুরের তাড়সে জ্ঞানগম্যি ছিল না, শুনতে না পেয়েচিলি। এই বিশাখা লক্ষ্মীছাড়ি কি মরণ ঘুম ঘুমিয়েছেলো?

বংশী মিনমিনে গলায় বলে, তোর কাল উপুসের শরীর ছেলো—

ওঃ। উপুস। দিদি আজ নতুন উপুস করচে কেমন ? কবে দেকেচিস দিদি একাদশীর উপুস করে দল্‌কে পড়েচে ? তো সেই অনাছিষ্টি কতাই যদি মানতে হয় তো—শুদোই ফিরে গিয়ে গেলো কোতায় ? আবার সেই যাত্রাতলায় ? তারা এখনো এই চৌপর বেলা অবদি আসর পাতিয়ে বসে আচে ?

বংশী দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কানের ভোঁ-ভোঁটা কমছে কি না। বুঝতে পারে না। তবু তর্কের ভঙ্গিতে ক্ষীণ সুরেই বলে, তো ভুজঙ্গর খুড়োর ঘর তো অ্যাকটা আচে গাঁয়ের মদ্যে !

ভুজঙ্গোর খুড়োর ঘর।

বিশাখা হঠাৎ ঠাঁই ঠাঁই করে নিজের কপালেই দু'ঘা থাবড়া মেরে খেরাকাটা গলায় বলে ওঠে, তোর বুদ্ধির বালাই নিয়ে যে আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে বন্‌শা ! অ্যাঁ ! ভুজঙ্গোর খুড়োর ঘর ? খুড়োর ঘরের ক্যাঁতায় আগুন দিয়ে যে ছেলের মামার ঘরে গিয়ে বসবাস, সেই ছেলে হঠাৎ করে মাজরাত্তিরে একটা যুবোতি পরনারী নিয়ে খুড়োর ঘরে গিয়ে ঠেলে উটবে ? আর তারা ধান দুব্বো দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলবে ?

আঃ।

বংশী চিঁ-চিঁ ছেড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, কেবল গুচ্ছির কথার ভনিতে ! ...ধান দুব্বোর কতা আসে কিসে ? অসুবিদেয় পড়েচে দেখলে মানুষ এটুকু করে না ? ওর খুড়ো খুড়ি তোদের বৌকে চেনে না ? যদি দ্যাকে যাত্রাতলা থেকে ফিরে —দোরটা খোলা পায়নি—

বংশী ! তোরে গড় করি। আর রাগ বাড়াসনে আমার। যাত্রাতলা থেকে তো তখন সারা গাঁ সুদ্ধ মানুষ ফিরচে সারা পথ গজানি করতে করতে !

আরে খেলে যা ! কেবল কুতর্কো। গজানিই করে। কে কার কড়ি ধারে ? অ্যাঁ ? কে জানচে কার ঘরে দুটো মনিষ্যির মধ্যে একটা ম্যালোয়ারি দাপটে কোঁকাচ্চে, আর অন্যটা উপুসের শরীরে—

ফের উপুস উপুস করচিস বনশা ? নিষেদ করে দিচ্ছি ওকতা তুলবি না ! বলি ভোররাত্তির থেকে বস্তা খানেক বিচিলি কুচিয়ে গোয়ালের গরুগুলোকে জাবনা দিয়ে এলো কে ? গোয়াল মুক্ত করল কে ? বলি তেমন গোলোক বৈকুণ্ঠোর ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, ভুজঙ্গোবাবু বন্ধুর পরিবারকে নিয়ে যাত্রাতলা থেকে ফিরে খুড়োর ঘরেই উঠে থাকে, তো দুজনার একজনারও এখনো খোঁয়াড়ি ভাঙেনি ? অ্যাতোক্ষণে নিজের ঘরে ফিরবে না ? সাদে বলচি—শাক দিয়ে মাচ ঢাকার চেষ্টা ! হুঁঃ ! বুদ্দির গলায় দড়ি !

বংশী মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, নে, যতো পারিস মুক খারাপ কর ! ...মনে শুদু বিষপুঁটুলি ! বলি মানুষ কি গরুছাগল ? যে তাই অ্যাক দন্ড বেড়ার আগল আলগা দেকলেই, গেরস্থর শাকের ক্ষেত মুড়োবে ? ... বলি মেয়েছেলের মন, মান অভিমানও তো হতে পরে ? ভাবতে পারে ভাইবোনে যুক্তি করে ওদের জব্দ করতে ইচ্ছে করে দোর খোলেনি।

বিশাখা এখন সেই পাতা ছড়ানো মেটে উঠোনের মধ্যিখানে বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, একতাও ভাবতে পারে ? এও তোর মনে এসেচে বংশী ?

বংশী দু হাতের আঙুলগুলো মটমটিয়ে মটকে শরীরের আড় ভাঙতে ভাঙতে বলে, তা যেটা সম্ভবের মদ্যে সেটা মনে আসবে না তো কি তোর মতন পাপ কথা মনে আসবে ? দু' বেলা তো জপের মালা ঘোরাস, মন একটু শুদ্ধ হয় না ক্যানো ? অ্যাঁ ? আমার যে নেহাত গা মাথা কাঁপচে, পা দুখান লটপট করচে তাই পতে বেরোতে সাহোস পাচ্চিনে। নইলে—

গা মাতার আর অপরাদ কী ? ... বিশাখা জড়ো করা ঝরাপাতাগুলো কুড়িয়ে চুপড়িতে ভরতে ভরতে বলে, চৌপর রাত জরে কাট ফেটেছে, ধান ছড়িয়ে দিলে ফুটে খৈ হয়ে যেতো ! তায় আবার পিত্তি উটেচে রাত ভোর ! সেই শরীল নিয়ে তুই বিছানা ছেড়ে উটে এইচিস কী করে, তাই ভাবচি !

বংশীর সঙ্গে তার দিদির বাক্যালাপের ভঙ্গিই এই। ভিতর দু'জনে পরস্পরের প্রাণতুল্য। কিন্তু ব্যবহারে দু'জনাই যেন দুজনের প্রবল প্রতিপক্ষ ! তাই চিঁ-চিঁ করা বংশী হ্যানস্থা প্রকাশের গলায় বলে ওঠে, উঠে কি আর সাদে আসতে হয়েচে ? তোর চেঁচানিতেই হয়েচে। মানুষ দুটোর হলোটা কী সে খোঁজের গরজ নাই—যাতোসব অকতা কুকতা ! আমি বলচি নিঘ্ঘাত দোর ধাক্কিয়ে ফিরে গিয়ে ওই ভুজঙ্গোর খুড়োর ঘরেই—

বিশাখা জঞ্জালের ঝুড়িটা কাঁখে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, ঠিক আচে ! আমিই যাচ্চি খোঁজ নিতে। তবে সেটা হবে— নিজের মুকে নিজে চুনকালি দেওয়া— স্বেচ্ছায় ঘরের কেলেঙ্কার ছড়ানো ! বৌ হারিয়ে গেচে খুঁজে বেড়াচ্চি— বলে তল্লাস করতে গেলে— পরে আর অন্যো কিচু রটোনা করে ঘটোনাটা চাপা দিতে পারা যাবে ? যাকগে তোর বুদ্ধিই খাটুক !

এখন বংশী একটু হতভম্ব হয়ে হাত নেড়ে নিষেধের ভঙ্গি করে। ... কথাটা তো ঠিক। যদি বংশীর ধারণা ভুল হয়, ওরা অন্য কোথাও আটকে পড়ে থাকে, খুঁজতে বেরোলে সত্যিই টি-টি পড়ে যাবে।

কিন্তু এখন আর বিশাখা নিষেধ মানে না। হনহনিয়ে চলে যায় অগ্রাহ্যের ভঙ্গিতে !

রাতভোর জ্বরের মাতনে ক্লান্ত, খিদে তেষ্টায় কাতর বংশী উঠে আর ঘর পর্যন্ত যেতে পারে না, দাওয়াতেই লম্বা হয়।

মাথার মধ্যে যেন ডাংগুলি খেলছে। দিদির তীব্র তীক্ষ্ণ সন্দেহতিক্ত কথাগুলো যেন বুকের মধ্যেটা ফালাফালা করে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। যে কথা বংশীর স্বপ্নের মধ্যেও আসবার নয়, দিদি অনায়াসে সেই কথাটা নিশ্চিত সত্যের ভাবে বলছে ! কী আশ্চর্য ! দুর্বলতায় ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা... তার মধ্যে গত সন্ধ্যার ঘটনাটা ছায়া ফেলছে।

ছন্দা বংশীকে গা ছুঁইয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছিল— আজ মেলার মাঠে যাত্রা দেখতে নিয়ে যাবে বংশী ! 'গণেশ অপেরার' এই 'কলঙ্কিনী রাধা' পালা আজ ক'দিন ধরে গোটা মেদিনীপুর জেলাটা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কাল এই চন্দ্রকোনায় এসেছিল, আজই অন্যত্র কোথায়

চলে যাবে।

বংশী একটু ঘুমকাতুরে, রাত জেগে যাত্রাগান শুনতে যাওয়ার তেমন ঝোঁক তার নেই, তবে ভুজঙ্গর আছে। তার ঠ্যালাতে গেছে কখনও কখনও। এখন আবার এই বছর তিনেক হল ছন্দার ঠ্যালা ! নতুন বিয়ের বৌ, (এখনো কোলে কচিকাঁচা আসেনি, নতুনই রয়ে গেছে) তার আবদার না রেখে উপায় কী ?

কিন্তু বংশীর কপাল ! বিকেল থেকে গা শিরশির শুরু, আর সন্ধ্যেমুখোই কাঁপুনি। হবেই তো অমাবস্যে পূর্ণিমে একাদশীতেই যে ওই সর্বনেশে জ্বরের যত ভিরকুটি। বেচারা বংশী ! মানিনী বৌ বলে কিনা, জ্বরকে তুমি সেদে সেদে ডেকে আনচো যাতে যেতে না হয়। বুজেচি। একটা চাদর কম্বল মুড়ি দিয়ে গেলে, কিছুই হতো না।

ওই রকমই অবুঝ ছন্দা।

হলেও অবুঝ, ছন্দার জল টলটলে চোখ দুটো দেখে ভারী মায়া হয়েছিল বংশীর। আহা কত সাধ করে ফুলছাপ শাড়ি আর লাল টুকটুক জামা পরে সাজগোজ করে রেডি, আর এখন কি না বংশী তার আশার মুখে ছাই দিতে বসল।

বংশী কাতর হয়ে বলল, চাদর কম্বল ? অবস্থা তো দেকলি ক'বার ? কী অসুর জ্বর ! তায় আবার পিত্তি ওঠার দাপট। ভিড়ের মদ্যে সেদিয়ে পড়লে পাঁচজনা দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবে রে !

ছন্দা বলল, ঠিক আচে ! তুমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানা নাও গে। ছন্দাও ভূতবাগানের আমগাছের ডালে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে যাবে ! বে' হয়ে পর্যন্ত তো কেবল সংসারের কন্না, আর তোমার দিদির মুখনাড়া ! সাদ আহ্লাদের কোনো সোয়াদ পেয়েচি ?

কথাটা অবশ্য ছন্দার অন্যায়ই। এ তল্লাটে যত বৌ-ঝি আছে তাদের থেকে ছন্দা অনেক আরামে আহ্লাদে আছে। ছন্দার সবসময় সাজগোজটি টিপটিপ, ছন্দা ভালটি ছাড়া মন্দটি খেতে চায় না, এবং ছন্দাকে এখনো বিশাখা হেঁসেলের ধারেকাছেও যেতে দেয় না। দেয় না—হয়তো স্নেহে নয় নিজের শুচিবাইতে, তবু ছন্দার তো তাতে সুবিধে। তাছাড়া—মামার দোকান বন্ধর দিনে— বেস্পতিবারে বেস্পতিবারে ভুজঙ্গ আসে, সে তো রীতিমত উৎসব। খাওয়ামাখা আড্ডা হল্লোড়ের ব্যাপার ! তাসখেলাও চলে, আবার বংশী আর ভুজঙ্গ দুই বন্ধু গান বাজনার আসরও বসায়। যদিও সে আসর হেঁড়ে গলার গান আর বেতালা তবলায় চাঁটি ! তা হোক তাতে আহ্লাদের তো ঘাটতি ঘটে না ! সে আসরের শ্রোতা বলতে তো এক ছন্দাই।

বিশখা রেগে গনগন করে আড়ালে দাঁত কিড়মিড় করে, কখনো বা বাড়ি ছেড়ে পাড়া বেড়াতে চলে যায়। ...ভাই আর ভাইয়ের বন্ধু ডাকাডাকি করে, ঠাকুর দেবতার গান হচ্ছে দিদি, এসে শোনই না বসে।

দিদি মুখ বাঁকায়, তোরাই শোন। আমার অত ভক্তি নাই।

ছন্দা অবশ্য তাতে বাঁচে। বাবাঃ ! ননদিনী না বাঘিনী। খাওয়ায় মাখায় বটে খুব, সে

নিন্দে করতে পারা যাবে না, তবে রাত দিন ওই কড়া চোখের পাহারায় থাকা ! বাবাঃ !

বংশীর কপাল মন্দ, আবার ভালও !

কাল বেস্পতিবার ছিল না, তবু ভুজঙ্গ এসেছিল। এসেছিল যাত্রপালার টানেই। দেখে হাতে চাঁদ পেয়েছিল বংশী ! ভগবান প্রেরিত হয়ে এলি তুই ভুজং।এই ছন্দা বেচারার পালা দেখা পন্ড করছিলাম আমি—জ্বর তো এসে গেল ! তোরা দুজন যা।

ভুজঙ্গ অবশ্য জোর আপত্তি করেছিল। বংশীকে এই অসুখ অবস্থায় ফেলে তারা যাবে যাত্রা শুনতে ? এ হয় না। কিন্তু বংশীর নির্বেদে সে আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকল না। বংশী বলল, আরো বাবা এ তো আর মিত্যু রোগ নয় ? রাত ভোর শরীরের মধ্যে ড্রাম পিটবে, ভোর রাত্তিরে কুলকুলিয়ে ঘাম ছুটিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে। এইটুকুর জন্যে এতো দিনের আকাঙ্ক্ষাটা পণ্ড হবে ? আহা কবে থেকে দিন গুনছে বেচারা।

তোর কাচে থাকবেটা কে ?

বংশী বলেছিল, কে আবার থাকবে ? দিদিই থাকবে। এখন হরিমন্দিরে গেচে পাঠ শুনতে। একাদশীতে একাদশীতে পাঠ বসে তো ?

তবু ভুজঙ্গর খুঁতখুঁতুনি, একা আমার সঙ্গে—

ধমক দিয়ে উঠেছিল বংশী, বলি, ও তোর বোন সম্পর্ক না ?

অতএব আহ্লাদে ডগমগিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ছন্দা, ভুজঙ্গর সঙ্গে। ...বোন সম্পর্ক ? তা মামার বাড়িতে বসবাসকারী ভুজঙ্গর মামাতো ভাইয়ের মাসতুতো বোনটাও বোন সম্পর্কের বৈকি !

ভুজঙ্গ আর বংশী তো এক পাড়ারই ছেলে, সেই উদোম বয়েসের বেলা থেকেই দুজনে প্রাণের বন্ধু। দুজনাই যতরকম সৃষ্টিছাড়া খেলার সঙ্গী এবং ঈষৎ বয়েস হওয়ার পর গান বাজনার ব্যর্থ চেষ্টারও সঙ্গী। তা ব্যর্থ হোক, আহ্লাদের কিছু কমতি ছিল না। বংশীর বাপ মরেছিল, মা ছিল। আর ছিল ওই বিয়ের বছর না ঘুরতেই বিধবা হওয়া দিদি বিশাখা। ভুজঙ্গ কোন অকালেই মা বাপ মরা। প্রায় বেওয়ারিশ অবস্থা। তাই বলতে গেলে তার আসল আস্তানাটি ছিল এই গড়াইবাড়ি। বংশীর মাও খুব স্নেহ করতো। বংশী বলতো, তুই এ বাড়িতে এসে থাকলেই পারিস। তোর খুড়ি যখন অতো পাজি !

ভুজঙ্গ ওর মুখে হাত চাপা দিতো, চুপ ! চুপ ! ... তারপর বলতো—মামা তো ডাকে আমারে, তো চিরদিনের ঠাঁই ছেড়ে অন্য কোতাও যেতে মন চায় না !

তা শেষ পর্যন্ত চলেই গিয়েছিল মামার ডাকাডাকিতে। অবশ্য মামার ডাকটা নিঃস্বার্থ স্নেহের নয়। তার দোকানটায় বসবার জন্যে একটা বিশ্বাসী লোকের দরকার ছিল জরুরী আর মামার নিজের ছেলেটি, বাপের ওই কাঁসা পেতলের বাসনের দোকানে বসতে একদম নারাজ ! অতএব মা মরা ভাগ্নের ওপর স্নেহ উথলোলো। ...মামী অবশ্য বরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, তা তো নয়। এই যে আমার একটা মা মরা বুনঝি সংসার কবল থেকে বেরিয়ে এসে আমার

সংসারে খাচ্ছে পরছে, তাতেই তোমার হিংসের নাড়ি জ্বলে উঠেছে—তবে আমার বুনের ছেলেও এসে থাকুক, থাক।

তবে শেষ অবধি মামী ছেলেটার গুণে বশ হয়েছিল। বলতো, ভুজঙ্গোটা যদি একটুক ফর্সা হতো তো ওটার সঙ্গেই বে দিতুম ছন্দির।

দুর্ভাগ্য ভুজঙ্গর যে, সে ফর্সার ধারে কাছে যায় না।

তা শেষ অবধি কী হতো বলা যায় না। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই জলজ্যান্ত মামীটা একদিন দুম করে মরে গেল।

দিশেহারা মামা অকূলপাথারে। আঠারো বছরের দস্যি আইবুড়ো ওই শালীঝিকে সে সামলায় কী করে ? মেয়েটার যত রূপ তত স্বাস্থ্য।

মামার সেই বিপদে ত্রাণকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভুজঙ্গ।

বংশীর মায়ের কাছে এসে ধরে পড়েছিল ভুজঙ্গ।

বৌয়ের রূপ দেখে যতটা মজেছিল বংশীর মা, পরে গুণ দেখে ততটা না। তা সে পাটও চুকে গেছে। এখন শুধু দিদি ! দিদি বৌকে বলে, 'রঙ্গিনী !' 'ঢলানি' ! 'আহ্লাদী' ! ...কাজ যেটুকু আদায় করে তার কাছ থেকে—তা 'ঠেশ পাড়া' কথা দিয়ে দিয়ে। নচেত নিজেই সব কাজ করতে বসে। দেখে বংশীই বৌকে ঠ্যালে— যাও না তুমি একটু হাত লাগাও না। দিদি একা মরচে।

ছন্দা চোখে জল ভরিয়ে বলে, মাসি সাত জন্মে আমায় জলটুকুন গড়িয়ে খেতে দেয়নি। ভুজুংদাকে শুদোও। সাক্ষী আছে।

তা তোর মেসোর বড়মানষের সংসার, দাসী বাঁদিতে কাজ করতো, আমার ঘরে তো আর—

সেই তো। আমার কপাল। মাসি আমার সঙ্গে বেইমানি করে বিনে নোটিশে মলো। আর ওই ভুজুংদার ভুজুঙ্গে মেসোও—

তা এই ভাবেই চলে আসছে ক'বছর। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবন।

বিশাখা দেয়ালকে শুনিয়ে বলে, বাঁজা মেয়েছেলের এতো দাপট !

ছন্দা আকাশকে শুনিয়ে বলে, কে বাঁজা কে জানে। ...মাসি তো বলতো, পুরুষ ব্যাটাছেলেও তা হয়।

বিশাখা ধেই ধেই করে ওঠে, ওমা। ওমা কোথায় যাব আমি। সাত জন্মে শুনি নাই এমন কতা।

বৌ অবলীলায় বলে, অবোধ অজ্ঞানরা এমন কতো কথা না শুনে থাকে !

এই বৌয়ের ওপর বিশাখার যদি ভালবাসা না উথলোয়, দোষ দেওয়া যায় না। ...কাজেই বংশী ভাবল, দিদি এখন ছন্দার ওপর আক্রোশের বশে যা নয় তাই মুখে আনছে।

ভাইয়ের নিষেধে নিরস্ত হয়ে বিশাখা ভুজঙ্গর খুড়োর বাড়ি তার নিখোঁজ ভাই-বৌয়ের

তল্লাস নিতে গেল ?

পাগল না কী ? বিশাখা তার ভাইয়ের মত নির্বোধ নয়।

বিশাখা ভুজঙ্গর খুড়োর বাড়ির উঠোনের ধারে জন্মানো 'থানকুনি'র পাতা তুলতে গেল। ... দ্বাদশীর দিন থানকুনি পাতার ঝোল খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে ! এ আর কার অজানা ?

ভুজঙ্গর খুড়ি বলল, অপেরা দেখতে গেছলে নাকি দিদি ?

বিশাখা বলল, মরণ আমার। আমি নইলে আর অপেরা দেকতে যাবে কে ?

তোমাদের বৌ তো গেছল ? সঙ্গে ভুজঙ্গ। বংশীকে দেখলুম না।

বংশীর কতা আর বোলো না ভাই। সেজেগুজে বেরোতে যাচ্চে—তিথির কোটালে তেড়ে জ্বর এসে গেল। তো বৌও যেতে চাইছিল না, বংশীই জোর করে পাঠায়ে দিল। বলল, 'কতদিন থেকে আশা করে রয়েচে।' ...তো বেরোনোই সার ! দেকা তো হলো লবডঙ্কা। মেলার মাটে নাকি কে এসে খবর দিয়ে গেছল, মেসোর 'যায় যায়' অসুখ ! সেখান থেকেই দুরদারিয়ে—। কে জানে বুড়ো মরল না রইল।

তা ভুজঙ্গও যে সঙ্গে যাবে সেটা আশ্চয্যি কথা নয়। ছন্দার মেসো লোকটা ভুজঙ্গরও নিজের মামা !...

পরে ফাঁস হয়ে যাবে মামা অথবা মেসো জলজ্যান্ত ঘুরছে ! তা তাতে আর বিশাখার দোষ কী ? কেউ যদি শত্তুরতা সাধতে ভুল খবর দিয়ে যায় ? বিশাখা যা শুনেছে আর দেখেছে তাই বলেছে। ...মেলার মাঠ থেকে ছুটে এসে খবরটা দিয়েই ছন্দা চোখ মুছতে মুছতে, আর ভুজঙ্গ হন্তদন্ত হয়ে বাস ধরতে ছুটল না ?

বংশী ? সে তো জ্বরে কোঁ-কোঁ করছে !

ফিরতি পথে একেবারে ঘাট থেকেই ডুবটা সেরে বিশাখা এসে দেখল, বংশী দাওয়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। মনে মনে তার লক্ষ্মীছাড়ি বৌ আর হতছাড়া বন্ধুর মুন্ডুপাত করে বিশাখা ভাইকে ডেকে তুলে জোর করে নিজের জন্যে ভিজিয়ে রাখা বাতাসা ভিজের শরবতটায় কাগজি নেবুর রস মিশিয়ে খাওয়ালো তাকে। তারপর ঘোষণা করল, ভাত পেটে না পড়লে এ দুর্বলতা যাবে না, এই চললুম দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে আনতে। তুই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে বাসি কাপড় ছেড়ে বোস দিকি।

বংশী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, গিয়েছিলি ?

গেছলুম তো। এই কাগজি নেবু তো ভুজঙ্গোদেরই গাছের। খুড়ি দিল কটা।

নেই ওখানে ?

থাকলে আমি রেখে আসতুম ?

কোনো কারণে মামার ওখানে চলে গেলো না তো ?

বিশাখা তো সেই ধাপ্পাই দিয়ে এসেছে। তবু বলল, এও ভাবছিস ? তো সে খোঁজ

নেওয়াটা তো আমার দ্বারা হবে না !

পটলাকে অ্যাকবার বলে দ্যাকো না ? ও তো বীরসিংহীর ওদিকের বাসেই যায়।

বিশাখা নিমপাতা চিবোনোর গলায় বলল, পটলাকে ? তার থেকে খপরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে আয় না, 'আমার পরিবার ছন্দারাণী হারিয়ে গেচে, তার সাতে আমার প্রাণের দোসর ভুজঙ্গভূষণও নিখোঁজ।'

চুপ মেরে যায় বংশী।

এবং মনে মনে ঠিক করে নিজেই চলে যাবে চুপিচুপি বীরসিংহীতে। জলজ্যান্ত মানুষ দুটো কী উপে যাবে ? আর তাই যেতে দেওয়া হবে নিশ্চেষ্ট হয়ে ?

কিন্তু বংশীকে আর যেতে হল না। মামাই লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে, দু দিন আগে চলে এসেছে ভুজঙ্গ 'অপেরা' দেখবে বলে, এখনো ফিরল না কেন ? অসুখ বিসুখ করেনি তো ?

তারপর আর কী ?

খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়ার চাইতে কম কিছু হল না।

তিন গাঁয়ের লোক জেনে ফেলল, বংশীর আজন্মের বন্ধু ভুজঙ্গ যাত্রা দেখতে যাওয়ার ছুতো করে বংশীর বৌটাকে নিয়ে ভেগেছে !

ছি ছিক্কার আকাশে উঠছে। কেউ আর রেখে ঢেকে কিছু বলছে না। এবং এখন পড়শী পড়শিনীরা সকলেই বিশাখার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, বংশীর মুখ্যুমিতেই এমন ঘটনা ঘটতে পেরেছে।

বৌ নিয়ে আর বন্ধু নিয়ে যা আদিখ্যেতা দেখিয়েছে, এই পরিণাম হবে এ তো জানা কথা !

বংশী অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, সবাইয়ের 'জানা কথা' ! শুধু বংশীরই কিছু জানা ছিল না ? ...তবু বংশী কিছুতেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না ভুজঙ্গ এমন বেইমানির কাজ করতে পারে।...

বংশী সম্ভব অসম্ভব অসংখ্য গল্প বানিয়ে যায়। চোর ডাকাত রোগ বালাই অ্যাক্সিডেন্ট যতরকম দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে সহসা এসে যায়, যেতে পারে, তার মধ্যখানে একটা জোয়ান পুরুষ আর একটা যুবতী মেয়েকে ফেলে, বংশী তাদেরকে লোকচক্ষের সামনে এনে ফেলে, ওই নিন্দুকদেরই ধিক্কার দিতে থাকে। ...বলে, দ্যাকো এখন ? বোজো, কেন ওরা চার পাঁচটা দিন রাত্তির এমনভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছল ?

কার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধবে বংশী ? ভুজঙ্গর না ছন্দার ?...

বুকটা তো দুজনের জন্যেই টনটন করে ওঠে।

ব্যাণ্ডেজ বাদ দিলে ? কলেরা ? অথবা...অথবা...

কিন্তু মেলাতলায় যাত্রা দেখতে দেখতে মেলাই লোকের সামনে হঠাৎ ওই রকম দুর্ধর্ষ কিছু ঘটবে কী করে ? ফেরার পথে ? তা সে পথও তো জনশূন্য ছিল না। ওই ভিড়টাই

তো ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর ওদের বেশি দেরি হয়ে গেছল ভিড় ঠেলে আসতে, সেই সুযোগে হঠাৎ পিছন থেকে ডাকাত এসে—

পথটা এতো সংক্ষিপ্ত যে গল্পগুলো দানা বাঁধতে চায় না। এদিকে গেরস্থর বৌয়ের এই চার-পাঁচটা রাতের অনুপস্থিতিতে একটা সর্বজনসিদ্ধ পাকা গল্প গড়া হয়ে যায়, আগে থেকেই ষড়যন্ত্র ছিল, সুযোগ খুঁজছিল, হয়ে গেল সুযোগ। দেখোগে এখন দু'জনায় কোথায় গিয়ে সুখের ঘর বেঁধে গুছিয়ে বসেছে।

ষড়যন্ত্র না হলে ভুজঙ্গ হঠাৎ বে বারে চলে আসে ? ওদের ওখানে দোকানের বন্ধর দিন বেস্পতিবার। সেই মতই আসে। হঠাৎ সোমবারে এল কেন ?...

তা বংশীর ভাগ্যও তার ওপর বিরূপ। নইলে সেই মহামুহূর্তে জ্বরই বা আসে কেন তার ?

বিশাখার তো এখন দিনের প্রধানতম কাজ হয়েছে—ভাইকে ধিক্কার দেওয়া। যতই দেখে বংশীর মুখটা শুকনো, চোখ দুটো ফ্যালফেলে, বংশী খেতে বসে ভাত নাড়াচাড়া করে 'আর পারচি না' বলে উঠে যায়, ততই প্রাণের মধ্যে জ্বলতে থাকে বিশাখার। আর সেই জ্বালাটা ঝাড়ে সেই বংশীরই ওপর। ... তা এমনিই হয় বৈকি। অসাবধানে রোগ বাধালে লোকে রুগীটাকেই বকে। ছোট ছেলেটা দুষ্টুমি করতে করতে আছাড় খেলে, মা ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে আগেই দু ঘা বসিয়ে দেয়।

সারা সংসারের কাজ তো এখন বিশাখার ঘাড়েই। হলেও দুটো মানুষ, হেঁসেল তো দুটো। গরু বাছুর আছে, গাছপালা আছে। বিশাখা হাতে কাজ করে আর মুখে বাণ ছোঁড়ে, 'ছন্দা ভুজঙ্গো এসে গেচে, চায়ের জল চাপা। ছন্দা, জবজবিয়ে তেল, নুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে জমপেস করে মুড়ি মাখ। ছন্দা, ভুজঙ্গোর জন্যে দুটো ফুলুরি ভাজ দিকি চটপট। ভুজঙ্গো, ডিম-ভরা ট্যাংরা পেয়েচি আজ খেয়ে যেতে হবে।'...

এই সব বাক্যসমূহের স্বরটা অবশ্য বিশাখারই আর সুরটা অবশ্যই বংশীর। সেই 'সুরের' বাণটাই ছোঁড়ে বিশাখা !

প্রথম দু দিন বংশী রেগে উঠেছে। বলেছে, এ সব বংশী নতুন বলে নাই। আর শুধু ছন্দাই জোগান দেয় নাই। তুইও দিয়েচিস, মাও দিয়েচে। মা তো 'ভুজং' এয়েচে বলে—

সে আলাদা বিত্তান্ত। তখন অ্যাতো রঙ্গরসের কারখানা ছিল না। ...অ্যাখোন ? রঙ্গরসের ফোয়ারা ছুটচে। দুটো পুরুষের মধ্যে কে যে রূপসীর সোয়ামী, আর কে যে তার বন্ধু বোঝা দায়।

রূপসীটা একজনার বোন সম্পক্কো তা মনে রাকিস দিদি !

থাম ! আমারে আর সম্পক্কো দ্যাকাতে আসিস না। 'ধান সম্পক্কে যেমন পোয়াল মাসি' এও তেমনি বুন ! ...তাই অজ্ঞান হয়ে বন্ধুতা। ...তোরা দুজনায় গপ্পো কর, আমি একটুক ঘুরে আসি। ...তোরা ততক্ষণ তাস ভাঁজা, আমি দুটো পান কিনে আনি। ...চিরকেলে বিত্তান্ত ঘি আর আগুন ! বেড়াল আর মাচ !'

শুনতে শুনতে বংশী ক্রমশ গুম হয়ে গেছে । ...আর বাদ প্রতিবাদ করছে না । এবং ...ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া দুটো মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে ।

নিতান্ত সরল অবোধ বিশ্বস্ত কোনো হৃদয় একবার যদি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, সেটা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে । হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে বংশী । ...একবার ওদের পেতেই হবে । যাবে কোথায় ? বংশী অন্তত সেই বেইমান ভুজঙ্গকে নিজের হাতে নিকেশ করবে । ...ভুজঙ্গ যদি এত বড় মহাপাপ করতে পারে, বংশীই বা ভুজঙ্গর গলাটা ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়ার মত কিম্বা মাথাটা দু ফাঁক করে দেওয়ার মত পাপটা করতে না পারবে কেন ?

কোথা থেকে একখানা বাঁশ কাটা পেল্লায় কাটারি খুঁজে বার করে পাথরে ঘসে ঘসে শান দিতে থাকে । চোখ পড়ল এক দিন বিশাখার । শিউরে উঠে বলল, ওটা কী হবে ?

বংশী বলল, ভয় নাই, নিজের গলায় কোপ দিতে শান দিচ্চি না । শূয়োর মারবার তরে কসে শান লাগাচ্ছি ।

শূয়োর ! এমা !

দিদির আকাশ থেকে পতন ।

শূয়োর মেরে কী করবি ? মাংস খাবি ? ছি ছি ।

তোকে বলেছি মাংস খাব ? কেবল কতা !

বংশীর দিকে তাকিয়ে বিশাখা একটু ভয় খায় । চোখ দুটো কটকটে আর লাল লাল । মাথা রুক্ষু, হাতে পায়ে খড়ি উঠছে । দাড়ি কামানোর অনিয়মে মুখে জঞ্জাল । পরনপরিচ্ছদের ছিরিছাঁদ নেই । ...সেই সদাহাস্য মুখ 'বাবু বাবু' শৌখিন শান্ত বংশী । যার জানা জগতে ছিল—মানুষ গরু ছাগল নয়, আগল আলগা দেখলেই গেরস্থর শাকের ক্ষেত মুড়োতে আসে না ।

সেই বংশী একখানা ধারালো অস্তরে শান দিচ্ছে ।

পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো ? বিশাখা গ্রামের সব ঠাকুর দেবতার নাম করে করে মানত করে ।

সকল কাজকর্ম ঘুচিয়ে বংশী একটা চটের থলি হাতে ঝুলিয়ে যখন তখন যায়ই বা কোথায় ? ...বংশীর অনুপস্থিতিতে একদিন সেই শান দেওয়া দাটা সরিয়ে ফেলবে বলে খুঁজে বেড়াল বিশাখা, পেল না ।

তা পাবার কথাও নয় । বংশীর তো সেটা সঙ্গের সাথী । বংশী যত 'বাস'-এর গুমটির ধারে কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । একদিন না একদিন কি দেখতে পেয়ে যাবে না ? শয়তানও কোনো সময় নিজের দুষ্কৃতকর্মের জায়গাটায় উঁকি মারতে আসে । সেও আসবেই ।

এলে ?

এলে যা করবে তা মুখস্থ হয়ে আছে বংশীর । দেখামাত্রই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠবে, 'নেমকহারাম বেইমান শয়তান । তোরও যদি কোনো ভগবান থাকে তো তাকে স্মরণ

কর। এই তোর জীবনের শেষক্ষণ।' ঝোলা থেকে টেনে বার করবে, প্রতিদিন একবার করে শান দেওয়া ঝকঝকে অস্ত্রখানা।

বংশীর হিসেবে ভুল নেই। শয়তান এসে পদার্পণ করে তার দুষ্কৃতির জায়গায়। তমলুক থেকে আসা বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

তা একা যে ? পাপের সঙ্গিনীটাকে সঙ্গে আনার সাহস হয়নি বুঝি ? তা না আনুক আসল পাপী তো কাল ভুজঙ্গ। যে না কি নিত্য দুধকলা ভোগের বিনিময়ে একদিন শিরে ছোবল হানতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু এটা কী হল ? বংশীর সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে কেন ? রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে মুখস্থ করা সংলাপগুলো গুলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে কেন ? বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার বদলে বংশী চোরের মত আড়ালে সরে যাবার চেষ্টা করছে কেন ? চোখাচোখি হলে পাছে পাজিটা ছুট মারে তাই এই সতর্কতা ?

ব্যাপারটা কী ? সব উল্টেপাল্টে গেল নাকি ? ও কোন সাহসে হনহনিয়ে বংশীর এই আড়ালের দিকেই চলে আসছে ? তার মানে দেখতে পেয়েছে ? তাহলে বংশীই কি ছুট মারবে ? তার যে জ্বর আসার মত কাঁপুনি ধরছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। এই দিকেই আসছে। ...তো চেহারার এ কী হাল হয়েছে বাছাধনের, 'সুখের ঘর' পাতিয়ে ? রঙটাই কালো ছিল, কী চেকনাই ছিল সেই রঙে। আর নাক মুখ চোখ ! মা বলতো 'বাটালি দিয়ে কুঁদে কাটা'। যেটা এগিয়ে আসছে সেটা তো একখানা পোড়া কাঠ ! ধুলোয় ধুস্কুড়ি হাত পা ! মুখ চোখও যেন বোঝা যাচ্ছে না। ...সেই লোকটাই তো ? আর একটু না দেখে ঝাঁপিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না।

'আর একটু' দেখবার আগেই সামনে ধ্বনিত হল, বংশী। তুই তালে বেঁচে আচিস ? ওঃ কী মনপ্রাণ নিয়েই যে—

বংশী আত্মস্থ হল।

ব্যঙ্গের গলায় বলল, বেঁচে আচি দেকে বড্ড আশা ভঙ্গো হল কেমন ?

ভুজঙ্গ থতমত খেয়ে বলল, তার মানে ?

'মানে' এখনি টের পাবি ! আগে বল্ তাকে কোতায় রেকে এয়েচিস ?

এখন বংশীর স্বর পাথর। দৃষ্টি পাথর। ঝোলা থেকে জিনিসটা একটু বার করে দেখিয়ে বলে, চিনিস এ জিনিস ?

ভুজঙ্গও পাথর হয়ে যায়। খুব স্থির আর শান্ত গলায় বলে, ঠিক আছে। তবে একটু নির্জনে যেতে হবে। এখানে কোনো ঘটনা ঘটলে পাঁচজনের চোখে পড়ে যেতে পারে। তোর হাতে দড়ি পড়ে যাবে।

ও ! আমার জন্যে বড্ড দরদ, না ?

ভুজঙ্গ আরো শান্তভাবে বলে, তোর একটা বিধবা দিদি আছে বংশী। জগতে তার আর কেউ নাই!

ওসব মহৎ কথা রাখ! 'সে' কোথায় আগে জবাব দে।

জবাব দেবার কিছু নাই।

কী? তাহলে পাঁচজনে যা বলচে তাই সত্যি! তাকে মোটা টাকায় মেয়ে কেনাদের কাচে বেচে দিয়ে এয়েচিস।

ভুজঙ্গ নিরুত্তাপ গলায় বলে, পাঁচজনে এ কতাও বলে?

দিন পেলে বলবে না? বলার জন্যেই তো বিশ্ব সংসার মুখিয়ে থাকে।

ভুজঙ্গ সোজা দাঁড়িয়ে ধারালো গলায় বলে, ঠিক আছে। সব কতার অবসান হয়ে যাক। বার কর ওটা। ঘাড়ে বসিয়ে দে। হতভাগা ভুজঙ্গর মিত্যু যন্তন্না শেষ হোক।

বা! বা! খুব অ্যাকটিং করচিস তো। তোর আবার কিসের যন্তন্না?

মাথার ঠিক থাকলে বুঝতিস বংশী, কিসের যন্তন্না। দেখে মনে হচ্ছে মাথার ঠিকঠাক নাই।

কী? কী বললি মাতার ঠিক নাই আমার? শালা নেমকহারাম বেইমান! তোর এ অবস্থা হলে—।

অ্যাই! বেইমান বলবি না বংশী। তোর পরিবারকে আমি ভুজং দিয়ে বার করে নিয়ে গিয়ে ভেগে যাইনি। তুইই জোর করে আমার ঘাড়ে তোর রঙ্গিনী পরিবারখানিকে গছিয়ে দিয়েছিলি!...আর সে আমার মুণ্ডুপাত করে—থাক ও সব কথা। তুই কোপটা বসিয়ে দে। জ্বালা জুড়োক! বার কর বার কর! দেখি নিজেই নিজের গলায়—

'বংশী তাড়াতাড়ি ঝোলাটা মাটিতে ফেলে, তার ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, তা আর না? হাতে পেয়ে তাপর তুমিই শালা আমার ঘাড়ে কোপ বসিয়ে দাও!

এ সন্দেহ হচ্ছে তোর বংশী?

হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে ভুজঙ্গ।

বংশী হতভম্ব হয়ে তাকায়। তারপর ফস করে সে রামদাখানা ঝোলা থেকে টেনে বার করে ছুঁড়ে খানিক দূরের একটা পচা ডোবার মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, ভুজঙ্গ! তুই আমায় সাত ঘা জুতো মার!

ভুজঙ্গর হাত দুটো চেপে ধরে বংশী।

ভুজঙ্গ একটু মলিন হাসি হেসে বলে, তোকে মারার প্রশ্ন আসে না বংশী। নিজেকেই নিজে দু'বেলা দশ বিশ ঘা জুতো মেরেছি রে। এই দু'দুটো হপ্তা বিশ্ব বিস্মরণ হয়ে সকল কর্ম ভাসিয়ে সাধনা করে, একটা মতিচ্ছন্ন হওয়া ঠ্যাটা মেয়েছেলেকে বাগে আনতে পারলাম না! হাতে পায়ে ধরে বলেছি, কোন মুখে একা আমি ফিরে গিয়ে বংশীকে মুখ দেখাব ছন্দা? একবারও অন্তত ফিরে চল, তারপরে নয় আবার যা খুশি কর্‌িস।...তো ভ্যাঙচ্যানি কেটে বলেচে—হ্যাঁ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসা পাখি আবার খাঁচায় গিয়ে ঢুকবে? তোমাদের মতন

বুদ্ধু নই !

বংশী আস্তে বলে, আর কারুর সঙ্গে ভেগে বুঝি— ?

আর কারো সঙ্গে ? না অতো নিচু নজর নয় মহারানীর। মগডালের ফলের দিকে তাঁর হাত !...তোরে কী বলব রে বংশী অপেরা'র পালার হিরোইনটাকে দেকে পর্যন্ত বলতে থেকেছে, ও আমার ছেলেবেলার সই। চিনতে পেরেচি। পালার শেষে ওর সাতে দেকা করে যাব।...

তারপর ?

তারপরের কথা এই—তারপর এক অদ্ভুত অবস্থা ভুজঙ্গর। মেলার মাঠ খালি হয়ে গেল, যে যার চলে গেল। ভুজঙ্গ সেই যাত্রাদলের তাঁবুর বাইরে হা পিত্যেসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছন্দা ভেতরে ঢুকে বসে আছে তার সইয়ের কাছে।...তারপর একটা লোক দিয়ে খবর পাঠালো—ভুজঙ্গবাবুকে ফিরে যেতে বল, আমি এদের দলের সঙ্গে ভোরবেলা ঘাঁটাল যাচ্ছি, আর একটা নতুন পালা হবে সেখানে।

বোঝ তুই বংশী আমার অবস্থা !

ভুজঙ্গ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বলে, আমি একা বাড়ি ফিরে আসবো গালে মুখে চুনকালি মেখে ? বলব, 'বংশী তোর বৌটা আমার হাত ফসকে পালিয়ে গেচে !'...ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চললাম সেই ঘাঁটালে।...দেকাই করতে চায় না। বলে পালার দলে নাম লেখাব। অথচ ছেড়ে চলেই বা আসি কি করে ?...ঘাঁটাল থেকে দাসপুর, মহিষাদল, সেখান থেকে তমলুক ! দেখা হলেই দৈ-দস্তর করি, ছন্দা ফিরে চল। শেষ পর্যন্ত—অধিকারীকে পুলিশের ভয় দেখাই পর্যন্ত। তো ওরা হল গিয়ে দুঁদে ওস্তাদ। বলে কিনা, 'যান যান মশাই কত পুলিশ আনতে পারেন আনুন। ছন্দাদেবী নাবালিকা নয়, সাবলিকা। ওঁর নিজের জীবন নিয়ে যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা আছে।'...ছন্দাও এসে খরখরিয়ে শুনিয়ে দিল, কেন হত্যে দিয়ে পড়ে আছো ভুজঙ্গদা ? আমার আর সেই পচা সংসারে গিয়ে হাঁড়িকুড়ি নাড়ার বাসনা নাই। পয়লা নম্বরেই আমায় একটা পালায় হিরোইনের রোল দেবে বলে অধিকারী মশাই পমিস করেচে !...তবু মান খুইয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে বললুম, 'ধর্মের দোহাই ছন্দা, এতে তোর স্বামীর মুখটা কীরকম পুড়বে, আর আমার মুখটা কোথায় থাকবে তা একটু ভেবে দেকবি না ?' তা বেহায়া লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল কিনা, 'ভুজঙ্গভূষণ আর বংশীবদনের মুখরক্ষের দায়ে কি ছন্দা খত লিখে রেকে দিয়েছিলো কখনো ?'...

বলল এই কথা ?

হঠাৎ বংশী ভুজঙ্গকে চমকে দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠে বলে, আর সেই মুখপোড়া বংশীবদন ওই বেহেড বেহায়া বুদ্ধিভ্রষ্ট মেয়েছেলেটার কারণে 'শুম্ভনিশুম্ভর' রোলে নেবে চিরকালের 'তোকে' খতম করার তালে অস্তর শানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ! দিদি সাধে বলে, 'নিবুদ্ধির ঢেঁকি !' 'আহাম্মুখের রাজা' !...হা হা হা !!

❑

বড়রাস্তা হারিয়ে

এই যে সরোজদা চাবিটা—

অনেকগুলো চাবিগাঁথা বড় একটা চাবির থোলো এগিয়ে ধরল ধ্রুব সরোজের দিকে।

গলির মুখেই সামনে ট্যাক্সীতে মালমোট ওঠানো হয়ে গেছে। বাড়ির আর সকলেও গাড়ির মধ্যে আসন সংগ্রহ করে বসেছে, ধ্রুব ছুটে চলে এসেছে চাবিটা দিতে।

জানা ব্যাপার নতুন করে বলবার কিছু নেই।

সরোজ স্নেহের গলায় বললেন, বেরোচ্ছিস ? সাবধানে যা। ভালয় ভালয় ঘুরে আয়। গাড়ির তো এখন অনেক দেরি মনে হচ্ছে। এক্ষুণি—

ধ্রুব বলল, আর বলবেন না ! মার কাণ্ড তো জানেনই। পাঁচ ঘন্টা আগে থেকে তাড়া লাগাতে থাকেন। বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যেতে কী কী বিঘ্ন ঘটে দেরি হতে পারে তার লিস্ট বেড়েই চলেছে।

কাকীমার বরাবর একরকমই গেল।

হাসলেন সরোজ।

বললেন, আচ্ছা !

ধ্রুব একটু হেঁট হয়ে প্রণামের মতো করল।

সরোজ বললেন, আরে বাবা এ সবের পালা তো হয়ে গেছে তখন। কাকীমার হাতের গজা খেয়ে এলাম। আচ্ছা এগিয়ে পড়। ভাবনা করিস না, যেমন যা করবার করব। আচ্ছা। আচ্ছা !

এই শেষ দুবার 'আচ্ছা'টি শোনালো প্রায় 'দুর্গা' 'দুর্গা'-র মতোই। স্নেহ ব্যাকুলতার স্নেহস্পর্শ।

গাড়ির জানলায় ধ্রুবর ছোটমেয়ের মুখটা দেখা গেল। বললো, সরোজদা টা টা !

সরোজ নিজ মনে হাসলেন, এই এক মেয়ে কিছুতে আর জেঠু বলানো গেল না। বাবা যা বলে, ও তাই বলবে।

তা কারুর ব্যাপারেই যায় না। বাবা যাকে যে সম্বোধনে কথা বলে মৌও তাই বলে। তাই ঠাকুমাকে বলে 'মা' পিসিদের 'বড়দি ছোড়দি'। নিজের মাকে আগে নাম ধরে ডাকতো 'শর্মিলা শর্মিলা'। মায়ের অনেক বকাবকিতে এখন বলে 'ভালো মা' !

সরোজ আরো একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিজের বাড়ির মুখোমুখি তালাবন্ধ হয়ে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকালেন। ভাল চেহারার দোতলা বাড়ি সম্প্রতি আবার নতুন রং

অজন্তার ছবির ছাঁদে লীলায়িত ভঙ্গিতে অভ্যাগতদের হাতে তুলে দিচ্ছে একটি করে রক্ত গোলাপ।

এই সব দৃশ্যসমূহ অবশ্য কোনওটাই নতুন নয়। বিভিন্ন মঞ্চে একই নাটকের পুনরাভিনয় দেখার মতই। তবু মনোহর, মনোরম। যেমন ছাঁদনাতলায় অভিনীত 'শুভদৃষ্টি' নাটকের বহুদর্শিত বহুপরিচিত দৃশ্যটি। অহরহই চলছে তবু দেখার জন্যে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলিরও কসুর নেই। কসুর নেই হাসি, হৈ-হুল্লোড় আর চিরকেলে রসিকতার পুনরাবৃত্তির।

তাহলেও মোটের মাথায় এখন এইখানে সবটি মিলিয়ে সমগ্র পরিমণ্ডলটি যেন একটি অলৌকিক মহিমায় অলকাপুরীর সুষমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে না এ ভুবনে কোথাও কোনও মালিন্য আছে। আছে হিংসা দ্বেষ কুটিলতা ক্রুদ্ধ নিশ্বাস, তীক্ষ্ণ ছুরি।

অথচ মাত্র কয়েক গজ দূরেই একটা অন্ধকার গলির মোড়ে জমায়েত হয়ে রয়েছে সেই জিনিস। হিংস্র একটা পূর্বপরিকল্পিত সঙ্কল্প নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ভেলো, রন্টা, মৃণাল, সৌগত আর সব্যসাচী।

এই হচ্ছে পাড়ার পঞ্চরত্ন। সর্বদাই যারা মোড়ের মাথার গুপীর চায়ের দোকানের বেঞ্চ অলঙ্কৃত করে আড্ডা দেয়। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্কুলের গণ্ডি পার হতে না পারা জনও আছে। অথচ সবাই একই ভঙ্গিতে হ্যা-হ্যা, ন্যা-ন্যা করে বসে বসে।

কেমন করে এমনটা সম্ভব হয়েছে ?

বলা শক্ত। বলতে পারা যায়। 'একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে ? কী ছিল বিধাতার মনে।'

পাড়ায় এরা ভীতিকর। লোকে আড়ালে বলে পঞ্চরত্ন। এবং মনের গভীরে ভাবে 'পঞ্চপাপ'। এবং যখন কোনও উপলক্ষে চাঁদা চাইতে বেরোয় পাঁচজনে একসঙ্গে বেরোয়। এবং পাঁচজনের পাঁচ রকম চেহারা আর পাঁচ রকম সাজ থাকলেও, ভঙ্গিতে একটিই ভাব থাকে। যে ভঙ্গিটিকে ভাষায় ফোটালে এই দাঁড়ায়, 'লড়কে লেঙ্গে'।

এরা যে ভয়ানক কোনও খুন-জখম ছিনতাই বা ডাকাতির নায়ক, তা ঠিক নয়, তবে ছোটোখাটো কুকর্ম করেও কোনও কোনও সময়।

তবে এদের বিশ্বনস্যাৎ ভঙ্গিটির এবং নিজেদেরকে অন্যের ভীতিকর করে রাখবার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে দুঃসহ আস্পর্দ্ধা এবং নিজেদের ভবিষৎ সম্পর্কে থোড়াই কেয়ার ভাব।

এককথায় 'মস্তান' চরিত্রে যা যা 'গুণ' থেকে থাকে এরা চেষ্টা করে করে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করে ফেলে এইখানে এসে পৌঁছেছে। কথাবার্তায় চালচলনে কাঁধ নাচানোর কুৎসিত ভঙ্গিতে এমন রপ্ত হয়ে উঠেছে যে বোঝবার উপায় নেই এদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেও আছে।

তবে এর আগে আর কোনওদিন এরা দলবেঁধে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কোনও উৎসব বাড়ির ধারে কাছে ওত পেতে বসে থাকেনি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার ক্রূর সংকল্পে। যাকে

বলা যায় লুঠতরাজের ধান্ধায়।

নাঃ তা নয়। এখানে কেস আলাদা। আজকের এই আক্রমণ হচ্ছে এদের দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা। টাকা পয়সা সোনাদানা লুঠের উদ্দেশ্যে নয়। (অবশ্য ভেলো রন্টা মৃণাল নিজেরা চুপিচুপি বলাবলি করেছে, সেসবও যদি জুটে যায় মাইরি মন্দ কী ?) উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই উৎসববাড়ির মধ্যমণি আজকের কর্মকাণ্ডের নায়িকাটিকে লুঠ করা।

কিন্তু কেন ?

কারণ আছে বৈকি।

ওই মেয়েটা এই পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন দলনেতার সঙ্গে রীতিমতো বেইমানি করেছে।

হ্যাঁ অবধারিত ভাবেই যে কোনও দলেরই একজন কেমন করে যেন দলনেতার আসন পেয়ে যায়, এবং বাকি জনেরা তার ভক্তপ্রজায় পরিণত হয়ে যায়। এদের মধ্যেও যে দলনেতার আসনে সম্মানিত, সেই সৌগত আর আজকের উৎসবের নায়িকা ওই মেয়েটা না কি একদা একপাড়ায় বাস করেছে। এবং একটি খ্যাতনামা সহশিক্ষার স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছে।

কিন্তু শুধুই কি 'পড়েছে' ? বেশ একখানা প্রেমেও পড়েছে। অবশ্য ক্লাস এইট নাইনে যতটা প্রেমে পড়া সম্ভব।

তারপরই অকস্মাৎ পাড়া বদল এবং পালা বদল। কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হয়নি আর। কে কোনদিকে ছিটকে গেল।

হঠাৎ এতদিন পরে দেখা গেল এই নতুন পাড়ার একখানা সুচারু সুন্দর নতুন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসছে ওই মেয়ে। যাচ্ছে গুপির চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে, হাতে বইখাতা। মনে হয় ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।

সৌগত তড়াক করে লাফিয়ে এসে বিগলিত গলায় বলে উঠল, নোটন ! তুই এখানে।

মেয়েটা একটু থমকালো। একবার চোখ তুলে তাকাল তারপর তাকিয়ে দেখল গুপীর দোকান আর ভেলো রন্টাদের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞার গলায় বলে উঠল, আপনি ভুল করছেন আমি নোটন নই।

সৌগতের ভুরু কুঁচকে গেল।

ওঃ ! আপনি নোটন নয় ? সরি। ঠিক আছে। ফিরে গিয়ে সখাদের কাছে বসে পড়ে একটা শেয়াল ডাক ডেকে উঠল।

গুপী বলল, ওটা কী হল মাস্টার ?

ওটা ? ওটা সত্যের জয়গান।

তুমি যে কখন কী বলো, বোঝা দায়।

সেই প্রথম। কিন্তু তদবধি অবিরতই মেয়েটাকে এই পথ দিয়েই ওই বাস ধরতে যেতে হয়, ফিরেও আসতে হয়।

তদবধি চলছে এক স্নায়ুযুদ্ধ।

মেয়েটা এমন মদগর্বচালে চলে, মনে হয় যেন মহারানী চলেছেন। আর চলার পথে এমন চোখে তাকিয়ে যায় যেন চোখের সামনে কৃমিকীট, পচা ব্যাঙ, থ্যাতলানো টিকটিকি কি জুতোয় চেপ্টে যাওয়া আরশোলা দেখছে। বড় অসহ্য এই দৃষ্টি।

কিন্তু সে দৃষ্টির সামনে গুটিয়ে গিয়ে ভব্যতার ভঙ্গি করা তো চলে না। তাতে তো প্রেস্টিজ খতম। অতএব আরো অভব্য অসভ্য হওয়ার নীতিই গ্রহণ। শেয়াল-ডাক, কুকুর-ডাক, গাধার-ডাক, তীক্ষ্ণ, তীব্র মন্তব্য ছুঁড়ে মারা, সিটি মারা পদ্ধতি অনেক। কিন্তু ওইটুকু মেয়ে কী স্ট্রং। যেন ইস্পাত।

মুখ দেখে মনে হয় না এসব ওর কানে ঢুকছে। শুধু দৃষ্টিতে সেই ঘৃণা আর অবজ্ঞার তিক্ত ছাপ।

অথচ এই রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া আসা ছাড়া গতি নেই। এখান থেকে বাস স্ট্যাণ্ড যাবার এই একটাই পথ।

পথের মাঝখানে একটা পচা নর্দমা পড়লে লোকে যেমন নিরুপায় হয়েই ডিঙিয়ে পার হতে বাধ্য হয়, এও যেন তেমনি। নিরুপায় হয়ে গুপীর চায়ের দোকানের সামনেটা পার হয়ে যাওয়া।

তবে তফাৎ একটু আছে। নর্দমার দিকে বোধহয় লোকে তাকিয়ে দেখে না, এই নাক উঁচু মেয়ে এক পলকের জন্যও চোখ ফেলে যায়।

কেন কে জানে। ঘৃণাটা জানাবার জন্যেই ?

কিন্তু মুখে বাক্যি নেই। ওকে আসতে দেখলেই হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা। ওই যে মহারানী আসছেন। আহা হাঁটছেন দ্যাখ ! যেন দুনিয়াখানাই ওর বাপের তালুক।... আহা-হা। রাজহংসী হেঁটে গেলেন দেখলি ? মাইরি কী মদগর্ব !

গানের ধুয়োও ওঠে, ও সই মেরো না আর চোখের ছুরি। বুক ধড়ফড় প্রাণে মরি।

রন্টা আবার গেয়ে ওঠে, 'কুল খেতে রাধে রোজ রোজ তুই যাস বুঝি ইসকুলেএ-এ।

হেলে দোলে না। শুধু অবজ্ঞা। কোনও দিন তেড়ে এসে কিছু বলে ওঠে না, এমন কি কোনওদিন সঙ্গে কোনও বডিগার্ডও নিয়ে আসতে দেখা যায় না।

শুধু হিমশীতল ওই এক দৃষ্টি।

দিনের পর দিন এই 'শীতল' শরাঘাতে শরাঘাতেই এরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে।

পাঁচ পাঁচটা বেহেড ছেলে একটিমাত্র রূপসী তরুণীর অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে ?

হ্যাঁ রূপসী তাতে সন্দেহ নেই। এবং রূপসীদের অহঙ্কার থাকেও। কিন্তু এতো ঠিক রূপের অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে স্ফটিকের মতো কঠিন দৃশ্যমান অথচ অদৃশ্য একটি আভিজাত্যের অহঙ্কার। যেটা সব থেকে জ্বালা ধরায়।

নাঃ ! ওই উঁচুনাক খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই মাইরি। গুরু একবার হুকুম দে,

শালীকে একদিন তুলে আনি।

তুলে আনি।

এমন অবলীলায় বলে যেন ওই তুলে আনাটা কোনও ব্যাপারই নয়। যেন ওটা ওদের একটা নিত্য অভ্যস্ত কর্মের অন্তর্গত একটা কাজ।

বলাটা যত সহজ, করাটা তত সহজ অবশ্যই নয়।

পরিচিত জনেদের চলন পথে প্রকাশ্য দিবালোকে পাড়ার একটি রীতিমতো কেষ্টবিষ্টুজনের মেয়েকে হঠাৎ 'তুলে' নেওয়ার জন্যে যে কাঠখড় পোড়ানোর দরকার ততটা ঠিক মজুত নেই।

অতএব রোজই অঙ্গীকার 'প্রভু একবার হুকুম দাও। ওই রাজহংসীকে ঘাড়টি মুচড়ে তুলে এনে তোমার হাতে সঁপে দিই। হ্যা হ্যা তোমার প্রাণপ্রেয়সীকে'।

গুরু বলে, থাম থাম। শুধু বাকতাল্লা।

প্রধান দুঃসাহসদাতা ভেলো আর রন্টা। রাস্তা থেকে কোনো মেয়ে তুলে নেবার অভিজ্ঞতা ওদের না থাক, বি টি রোডের ধারে রাতবিরেতে ট্রাক থামিয়ে মাল নামিয়ে নেবার অভিজ্ঞতা ওদের আছে। তবু ওই বাকতাল্লাই চলে।

তা ওদেরই একজন একদিন হাঁপিয়ে এসে খবর দিল 'নাকউঁচুর' বিয়ে। বর নাকি দারুণ। জাপানে চাকরি করে। বিয়ে করেই বৌ নিয়ে উড়ো জাহাজে চেপে বসবে।

অ্যাঁ। তাহলে?

তাহলে তো আর অ্যাকশন নিতে দেরি করা চলে না।

কবে বিয়ে?

এই সামনের বাইশ তারিখ। ওই 'শুভদৃষ্টি' বাড়ি থেকে। বুক করা হয়ে গেছে।

তুই এত খবর পাস কোথা থেকে রে রন্টা?

হুঁ বাবা! সোর্স আছে। ওদের বাসনমাজুনির মাসি আমাদের বস্তিতে থাকে।

কী করা যায় বল তো? কালকেই কি তাহলে নেপালের ট্যাক্সিটাকে বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে মোতায়েন রেখে— মানে ফেরার সময়? চল নেপালকে বলে আসা যাক।

কিন্তু ভাগ্যচক্র।

সেই 'কাল' আর নোটনকে, মানে বিয়ের চিঠিতে যার নাম ছাপা হয়েছে—'বন্দিতা' তাকে আর কলেজ যেতে দেখা গেল না।

তার মানে পড়ায় ইতি।

আর পড়বে কেন? বড় গাছে নৌকো বাঁধা হয়ে গেছে যখন।

কিন্তু নৌকোকে ছিনিয়ে আনতে হবে। দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে হবে। এত দিনের শীতল চাউনির ফল পেতে হবে না? হাত ফস্কে পালিয়ে গিয়ে রাজপুত্রের গাঁটছড়া বেঁধে আকাশে উঠবে। আর আমরা পাঁচ পাঁচটা জোয়ান গালে চড় খেয়ে গালে হাত বোলাব।

নাঃ। এ হতে পারে না এ অসম্ভব। জগতে শুধু অহঙ্কারীদেরই জয় জয়কার হবে?

কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না। কিন্তু হবেনাটা কী করে ? ওর বড়লোক বাপের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে টেনে বার করে আনা ? দারুণ রিস্ক। অনেক যুক্তি, অনেক পরামর্শ। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত। এটাই সেফ্।

বিয়ের সন্ধ্যায় গোলমালের আর লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে—রন্টা বলল, দুটো রিভলবারের ব্যবস্থা আমি রেডি রাখব। আর চাকু তো আছেই। নেপালের ট্যাক্সিতে দুটো বাড়তি লোকও রাখব, ক্রোরোফরমের রুমাল আর মুখ বাঁধার কাপড় নিয়ে বসে থাকবে। ওদের এসব জলভাত। টাকা কিছু ছাড়তে হবে অবশ্য। তবে হ্যাঁ গা ভরতি গহনাসমেত 'মাল' পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে বাবা !

সৌগত বলল, অত লোকের মধ্যে আমরা মাত্র পাঁচজন—এটা কী রকম হবে ? দারুণ রিস্ক না ?

রন্টা হেসে উঠল, একখানা চাকু কি একটা পাইপগান হাতে নিয়ে ঢুকতে পারলেই লোকগুলো কি আর লোক থাকে গুরু ? স্রেফ পোকা হয়ে যায়। দেখবি আমাদের দেখামাত্র কীভাবে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা স্বেচ্ছায় গায়ের গহনা খুলে দিয়ে 'প্রাণে মেরো না প্রাণে মেরো না' বলে কাঁদতে শুরু করবে।

আরে বিয়েবাড়িতে আজকাল যে সব গহনা পরে আসেন মহিলারা হে হে, সে আর খুলে দিতে কী ? পাঁচ সিকের জড়োয়াবালা। দেড়টাকার সোনার হার।

সব্যসাচী ধমকে উঠল, আমরা সোনা লুঠতে যাচ্ছি ?

মৃণাল বলল, প্রথমেই অস্ত্র হাতে নিয়ে না ঢুকে জাস্ট নেমন্তন্নি সেজে ঢুকে পড়ে আগে খ্যাঁটটা সেরে নিয়ে তারপর অ্যাকশান নিলে কেমন হয় ?

মারবো থাপ্পড়। খ্যাঁট মারবেন। আজকাল আর সে আমল নেই। পার্টির স্রেফ শকুনের দৃষ্টি, একটা বিজাতীয় আলপিন ঢুকলেও বুঝতে পারে জেরা করে। একেবারে মার মার করতে করতেই ঢুকতে হবে।

কিন্তু কখন হবে সেই ঢুকে পড়াটা ? কোন মহামুহূর্তে ?

হ্যাঁ, 'মুহূর্তটি' নির্বাচন করা বিশেষ জরুরী। একটু আগে-পিছেয় ঘটনার মোড় ঘুরে যেতে পারে।

গলির মোড়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষারত পাঁচজনের মধ্যে চারজনই চাইছে এখুনি ঠিক সময়। এখনো বর এসে পৌঁছায়নি। বর এলেই তো সঙ্গে একগাদা বরযাত্রী এসে হাজির হবে। তার মানে অপরপক্ষের লোকবল আরো বেড়ে যাবে।

কিন্তু বাকি একজন অর্থাৎ নেতার অভিমত ভিন্ন। তার মতে, 'বরং ঠিক উলটো। বর এলেই কনের বাড়ির সবাই তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময়টাই হচ্ছে বেস্ট।

আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না গুরু, যাচ্ছি সুভদ্রা হরণে। চাকু নাচাতে নাচাতে ঢুকে পড়ব। আর তোরা রিভলভারের মুখ ওদের বুকে ঠেকাতে ঠেকাতে হ্যা হ্যা। দু চারটে হতাহত

হলেও হতে পারে। দ্যাখ বিনা রক্তপাতে যদি কাজ মিটে যায় হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী ?

তাহলে ? অ্যাঁ।

বলছি বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিস ? পিছন দিকে সুইপারের জন্যেই বোধহয় তিনতলা পর্যন্ত একটা স্পাইরাল সিড়ি উঠে গেছে। পিছনের ওই প্যাসেজের দরজাটা কেউ একজন পাঁচিল টপকে খুলে রাখ। যেই বর আসবে, দেখবি বাইরে বরকর্তারা তো ব্যস্ত হয়ে উঠবেই, ওদিকে অন্দরের যত মেয়ে গিন্নীগুলো পর্যন্ত 'বর এসেছে বর এসেছে' করে শাঁখ বাজাতে বাজাতে হুড়মুড়িয়ে নিচের তলায় নেমে আসবে, কনেটাকে স্রেফ একা ফেলে রেখে। দেখা আছে অনেক। ঠিক সেই সময় বুঝে ওই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে—কথাগুলো অবশ্য সব স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। হাতের এবং মুখের ভঙ্গিতে বারো আনা বোঝানোর চেষ্টা। অবশ্য চেষ্টা অসফল হয় না।

লাস্ট মোমেন্টে এই ডিসিশান নিচ্ছ গুরু ? আমি বলছি আমাদের এভাবে ঢুকতে দেখলেই নিয্যস খোঁয়াড়ে আগুন লাগার মতন অবস্থা ঘটবে।

বুঝলাম। তবে যদি নিঃশব্দে হয়ে যায়—

ওরে গুরু ভয় পাচ্ছে।

ভয়ের কিছু না। আমি চাইছি গোলমালটা অ্যাভয়েড করতে। চেনা মুখ তো সব।

আহা। মুখে তো মুখোস সাঁটা থাকবে।

কী ? তোর ওই সাঁওতালী মুখোসগুলো। হা হা হা। সত্যিই ওগুলো পরবি না কি ?

পরিকল্পনাটা মৃণালেরই। সে রাগের গলায় বলে ওঠে, কেন নয়। পয়সা দিয়ে কেনা হল, ফালতু ? চেনা মুখগুলো দেখানোর দরকার আছে কিছু ?

ঠিক আছে। পরে নে। ভেলো, সুইপারের ব্যাভারের দরজাটা খুলে রাখগে।

ভেলো বলল, খোলা আছে। ওইখান দিয়ে জঞ্জাল ফেলছে। ও কী ? শাঁখ বাজল না ?

হ্যাঁ বাজল।

এই আলোচনার মধ্যেই হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করে একসঙ্গে অনেকগুলো শাঁখ বেজে উঠল। মুহুর্মুহু বাজতেই থাকল। বাড়তে লাগল।

ততক্ষণে তীরবেগে চলে এসেছে এরা। মুহূর্তে উঠে এসেছে ঘোরানো সিঁড়ির প্যাঁচ কাটিয়ে দোতলার ভিতর দিকের বারান্দায়। যার সামনে স্নানের ঘর। সরু বারান্দাটা 'নানা বাজে' জিনিসে বোঝাই। কিন্তু আশ্চর্য, এইখান থেকেই জানলার মধ্যে দিয়ে সেই অলৌকিক দৃশ্যটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সত্যিই ঘরে কেউ নেই। সত্যি সত্যিই সবাই নেমে গেছে দুদ্দাড়িয়ে।

একা বসে আছে কনের সাজে সাজা সেই অহঙ্কারী মেয়েটা, মাথার ওপর চারদিকের দেওয়ালে হাজার বাতির বাল্ব জ্বলছে। সেই আলোর সমুদ্রে ভাসছে এক অপার্থিব প্রতিমা। মাথায় মুকুট, সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের দ্যুতি।

ভেলো দু'পা পিছিয়ে এসে বাতাসে পাতাঝরা স্বরে বলে, উরিব্বাস ! মহারানী যে আজ একদম নূরজাহান। এ গহনাগুলো নিশ্চয় নকল নয়। অ্যাঁ, এই রন্টা, কুইক !

থাম্।

একটা চাপা গলার নিষেধবাণী চমকে দেয় ওদের। জানলায় দাঁড়ানোদের মধ্যে যে সকলের থেকে লম্বা, সে সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। কারো চোখে পড়েনি কী বিস্ফারিত চোখে সে ওই আলোয় ভাসা প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

কিন্তু নোটন ? ভাল নাম যার বন্দিতা ? সে কেন দেখতে পায়নি ?

নাঃ। তার চোখ আনত। মুখ ওড়না ঢাকা। কোলে চণ্ডীর পুঁথি।

চলে আয়। ভাষা ইশারার, ভঙ্গি কম্যাণ্ডারের। হতচকিত চারটে প্রাণী পাথর হয়ে যায় যেন। চলে আসব ?

হ্যাঁ। নেমে আয়।

চলে যাব। নেমে যাব !

যাবি। আর এক সেকেণ্ডও নয়।

হুমকি দিয়ে হুকুমদাতা নিজেই সেই প্যাঁচানো সিঁড়ির কোণে কোণে এক একবার দৃশ্যমান হয়ে এবং অদৃশ্য হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অগত্যা এদেরও নেমে চলে যেতেই হয়।

হঠাৎ কী দেখল গুরু ?

পুলিশের ব্যবস্থা রেখেছে বুঝি মেয়ের বাপ ? সেটা চোখে পড়ে গেছে ওর ?

কিন্তু কখন ? কোথা থেকে ?

ইস্। এত তোড়জোড়, এত কাঠখড় পোড়ানোর পর জ্বলে ওঠা আগুনে জল নিক্ষেপ।

নিঃশব্দে হন হন করে চলে আসে বাকি চারজন রাগ অভিমান হতাশা আর বিস্ময় নিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে অতঃপর ফেটে পড়ে প্রশ্নে, এটা কী হল গুরু ?

কিছু না।

নেপাল এখনো ট্যাক্সি নিয়ে বসে আছে।

চুলোয় যাক।

হেঁয়ালি হস্‌নে গুরু, খুলে বল।

এবার ফেটে পড়ার পালা অপর পক্ষের। খুলে বলবার কী আছে ? নিজের চক্ষে দেখলি না ? ওই রাজেন্দ্রাণীকে তার সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে এনে কোথায় তুলতুম রে তাকে অ্যাঁ ? কোথায় তুলতুম ? বস্তির ঘরে তো ? বল ! বল তাই কি না ? কী খাওয়াতুম তাকে ? গদাইয়ের হোটেলের ভাত তো ? পচা চাল আর খেঁসারির ডাল ছাড়া যার আর কিছু নেই।

হঠাৎ ভেলো বলে ওঠে, বাঃ তা কেন। ও তোর বৌ হয়ে গেলে রান্না করে খাওয়াতো আমাদের।

ঘুঁসি মেরে খুলি উড়িয়ে দেব রাস্কেল। ও রাঁধত ?

ধাপে ধাপে গলা চড়তে থাকে দলনেতার, ও রাস্তার কল থেকে জল ধরে আনতো, খোলা রাস্তায় বসে চান করতো, সাবান কাচতো, মশলা পিসতো, বাসন মাজতো। এজমালির দাওয়ার ধারে বসে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করতো, কেমন ? কী রাঁধতো, অ্যাঁ ? আমরা এই পাঁচ-পাঁচটা শুয়োর মিলে কী এনে দিতুম তাকে ? বল বলছি ? আর ওর ? ওর একটা দড়ি জুটত না ? কী দু'বোতল কেরোসিন ? ভেবে দেখেছিস সে কথা ? আমরা মানুষ না জানোয়ার ?

বাড়ির নাম শুভদৃষ্টি

মস্ত বড় বাড়ি। তিনতলা। বারান্দাঘেরা সুন্দর। বাড়ির নাম 'শুভদৃষ্টি'।

নামকরা বিয়েবাড়ি। নামও যেমন দামও তেমন। তা বলে পড়ে থাকে না কি ? এ যুগে 'দাম' শব্দটা তো কোনও ব্যাপারই নয়। প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যোগাড় করা। পেয়ে যাওয়া, তাহলেই নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করা। তা এবাড়িকে দু-চারমাস আগে থেকে বুক করে রাখতে না পারলে পাওয়া শক্ত। বিয়েতে পাত্র পাত্রী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার আগেই বাড়িটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেন বিয়ে পার্টিরা।

এখন আলোকমালায় সজ্জিত বাড়িখানির চূড়োর কাছে আলোর অক্ষরে লেখা 'শুভদৃষ্টি'। নামটির নিচে একটি আলোর লেখা শব্দ বিজ্ঞাপনের কায়দায় জ্বলছে আর নিভছে। আসুন। স্বাগত।

এই কায়দা, এই আলোকসজ্জা এবং বিয়ের প্রয়োজনে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমন অনেক কিছু জিনিসই বাড়ির মালিকের ব্যবস্থাপনায় হাতে এসে যায়।

পার্টি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে, 'দাম কি আর শুধু শুধু নেয় বাবা !'

আজকের পার্টিরও অনেকেই বলছিল একথা।

আজ খুব ঘটায় একটি বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে।

বাড়ির সামনের লনে বর ও বরযাত্রীদের জন্যে রাজদরবারের মতো সাজসজ্জা। ডেকরেটারও এরাই সাপ্লাই করে।

ভিতরমহলে কনেকে ঘিরে তার সখিবৃন্দ এবং অভ্যাগত মহিলাবৃন্দের কলোচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে কূল ছাপিয়ে বাইরে এসে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর তাদের সোনার অঙ্গে প্রলেপিত বিচিত্র বিদেশী সব পারফিউমের সৌরভসারের সঙ্গে সদ্যটাটকা ফুল আর ফুলের মালার সৌরভ মিলেজুলে এক হয়ে বাতাসকে গাঢ় করে তুলেছে।

আরো একটি সুঘ্রাণ সুরভি নিমন্ত্রিতদের চিত্তকে বেশি উতলা করছে, সেটি হচ্ছে শহরের সবসেরা 'কেটারার'-এর অবদানসমূহের ঘ্রাণ !

বাড়ির সামনে গাড়ির সারি। অবিরতই আবার এক একখানি এসে ওই সারির পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে পড়ে লাইন লম্বা করে চলেছে। পরে আসা জনেরা একটু বিব্রত মুখে ওই লম্বা লাইন অতিক্রম করে গেটে ঢুকছেন। দুটি সুন্দরী বালিকা ততোধিক সুন্দর সাজে সমৃদ্ধ হয়ে,

হয়েছে। আগাগোড়া জানলা দরজা পর্যন্ত। ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ভাবলেন, এই ঝকঝকে বাড়িটার কোনো একটা জানালা খুলে ঝকঝকে একটা মুখের হাসি ক'দিন দেখতে পাওয়া যাবে না। যে মুখটা থেকে ডাক আসবে, সরোজদা, ও সরোজদা ! তোমার চা খাওয়া হয়েছে ? আমি এখন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি দুধ আর ডিম পাঁউরুটি খেতে যাচ্ছি। ইস্কুলে যেতে হবে তো !

অবশ্য কাল থেকে তো স্কুলের ছুটি হয়ে যাবে। তখন এই বাড়িতেই 'সরোজদা'র রাত্রি যাপন। শূন্য বাড়িতে। পাহারাদার বা 'রক্ষক' হিসেবে।

সরোজ ফিরে আসতেই সুলতা বলে উঠল, সেই চাবির গোছা চাপিয়ে ফাঁদে ফেলে বেড়াতে যাওয়াটি হলো তো ? তুমিও সত্যি ! দেখালে বটে।

অভিযোগের সুরটি শুনলেই বোঝা যাচ্ছে এ অভিযোগ সদা, নতুন নয়। একটি পৌনঃপুনিক বিরক্তির ব্যাপারে যে বিরক্ত অভিযোগের সুর বাজে সুলতার কণ্ঠে সেই সুর। ঝাঁজালো অসহিষ্ণু।

সরোজ যেন চোরটি।

বিব্রত বিপন্ন গলায় বললেন, এর আবার ফাঁদে ফেলাই বা কী, ঘাড়ে চাপানোই বা কী। বরাবরই তো—

জানি জানি। বরাবরই তো দেখে আসছি। একজনের বোকামি আর একজনের দিব্যি সুযোগ নিয়ে চলা। কেন ? বলতে পারতে না এখন তোমার বয়েস হয়েছে, সবসময় শরীর ভালো থাকে না। তোমার বাড়ি পাহারা দেওয়ার চাকরিটি আর আমার দ্বারা হবে না।

বাঃ চমৎকার।

সরোজ এখন একটু গলা চড়ালেন। তাহলে চাও বলতে বসি, আমি একটা বুড়ো হাবড়া অনড় অথর্ব, আমি আর এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে কটা রাত একটু শুয়ে উপকার করতে পারব না। কেমন ?

এঘর থেকে ওঘর ?

তাছাড়া আবার কী ? আলো জ্বাললে ওদের ঘর থেকে রুজু রুজু জানলা দিয়ে তোমাদের চলাফেরা নড়াচড়া সবই তো দেখা যায়। দরকার হলে ডেকে কথাও কওয়া যায়। তবে অসুবিধেটা আমার কোথায় ?

মা বাপের কথার মাঝখানে মনোজ এসে দাঁড়াল। প্রায় এজলাসে জজের গলায় বলে উঠল, মার প্রশ্নটা তোমার সুবিধে অসুবিধের নয় বাবা। প্রশ্নটা হচ্ছে অপর পক্ষের অন্যায় সুযোগ নেওয়ার । একটু চক্ষুলজ্জার দায়ে তুমি জেনে বুঝে একজনের সুযোগ নেওয়ার শিকার হচ্ছো।

শিকার !

সরোজ অবাকই হলেন। এটা আবার কী ধরনের ভাষা। তবু উড়িয়ে দেওয়া গলায় বললেন, এত সব বড় বড় কথাও শিখেছিস বাবা তোরা। এ যেন সেই মশা মারতে কামান দাগা। চিরকালের পড়শী শৈশব থেকে মুখোমুখি বসবাস আপনজনের মতনই, তার একটু

সুবিধে অসুবিধে দেখব না ?

দেখবে সেটা তোমার মর্জি। কেউ বারণ করলেই কি শুনবে ? তবে মতনটা তো আর সত্যিই সত্যি নয়। কই উনি বা ওঁরা তো তোমার দিকটা ভাবেন না কখনো। নিজেদের সুবিধের জন্যে বাড়ির চাকরটিকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যান। আর ওর বাড়ি পাহারা দিতে যাবে তুমি। আশ্চর্য ! বরাবর এইরকম একটা অযৌক্তিক ব্যবস্থা চলে আসছে। চলে আসতে দেওয়া হচ্ছে।

সরোজ একটু রেগে গিয়ে বলেন, আসছে তো কী ? আমার কী ক্ষতিটা হচ্ছে ? গোটা আষ্টেক দিন বাড়ি ছেড়ে অন্য একটা জায়গায় শোওয়া এই তো ! চাকরটাকে যে নিয়ে যায় বাবা সেটা সুবিধের জন্য নয়, 'সেফটি'র জন্যে। একা বাড়িতে ওটিকে রেখে গেলে কী কুমতলব করবে কে জানে। এ বাবা মালপত্তরের সঙ্গে নিয়ে গেলাম চুকে গেল।

হুঁ ! নির্বোধের সব হিসেবই জলের মতো সোজাই হয়। আর এক কথায় চুকে যায়।

সুলতা তীব্র স্বরে বলে, ধ্রুব রায় বছর বছর প্রতিটি বছর মামার বাড়ির পুজো দেখতে রেল গাড়ি চেপে সপরিবারে সফরে যাবেন, আর তুমি যাবে তার বাড়ি আগলাতে। বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। আর বোকারা চিরদিনই নিজের মাথাটা বাড়িয়ে দেয় সেই কাঁঠাল ভাঙাতে। দেখে দেখে-কী আর বলব ! ঘেন্না ধরে গেছে।

ওঘর থেকে বুবুর গলা শোনা গেল, যা বলেছ মা। আমাদেরও।

সরোজ আরো একটু বেশি অবাক হলেন। আচ্ছা বরাবরই তো এ ব্যবস্থা চলে আসছে। প্রতিবছরই তো ওরা মামার বাড়ির দেশের পুজোয় যায়, এবং সরোজ ওদের বাড়ি আগলাতে রাতে থাকেন। মানে কাকাবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই এ ব্যবস্থা চালু। কিন্তু এবারেই বা সরোজের বাড়ির সব্বাই মিলে যুদ্ধে নেমেছে কেন ? কারণটা কী ?

কারণটা যে দীর্ঘদিনের ধোঁয়ানো আগুন, এবং যেটা জ্বলে উঠেছে ওদের অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং বাড়িটাকে নতুন রং করে ঝকঝকে করে তোলায়, সেটা সরোজের বোধগম্য হবার কথা নয়। তাই লড়ে যাবার চেষ্টা করেন, এতে ঘেন্না ধরার কী হলো শুনি ? তোদের ভাবভঙ্গী তো কিছুই বুঝছি না।

বুবু এখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বুবুর পরনে একটা ঢোলা হাতা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল জামা। এটাকে যে কী বলে সরোজের জানা নেই। তবে একদিন বলে বসেছিলেন, কিম্ভূত মতো কী একটা পরেছিস রে ? আলখাল্লা ?

তাইতে মা মেয়ে দুজনে তাঁর গায়ে ধুলো দিয়েছিল 'সেকেলে-গাঁইয়া সব সময় এরকম রিমার্ক করে বোসো না' বলে। তো এখন চোখে সয়ে গেছে। বুবুর ওই বেটাছেলেদের মতো ঘাড় পুঁছিয়ে বয়ছাঁট-টাও অসহ্য লাগলেও মন্তব্য করতে সাহস করেন না আর। কিন্তু বুবুর মুখের কোমল লাবণ্যটি যে এর দরুণ কেমন নষ্ট হয়ে গেছে তা দেখে দুঃখ পান।

তবে আরো দুঃখ পেলেন আজ বুবুর সেই কাঠ কাঠ মুখ থেকে ব্যঙ্গ তিক্ত কথাগুলো শুনে।

বুবুর হাতে একখানা খাতা। সেটা দোলাতে দোলাতে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে উঠল, চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে রেখে সব কিছু দেখতে একমাত্র পি. সি. সরকারই পারে বাবা! তুমি আর কী করে পারবে? তোমার চোখেও সাতপুরু কাপড় বাঁধা।

আমার চোখে সাতপুরু কাপড় বাঁধা!

হ্যাঁ! সেন্টিমেন্টের পুরু পর্দা! তো বাবা এতই যদি আপনজন তো ওই ঘটাপটার পুজোয় আমাদের একবার যেতে বলেন না। চক্ষুলজ্জার ধার না ধেরে শুধু তোমায় দিয়ে বাড়ির কেয়ারটেকারগিরিটি করিয়ে নেন।

শুনে ভারী উত্তেজিত হলো সরোজ।

বলে না? বলছিস কী? কতবারই তো বলেছে। জিগ্যেস কর তোর মাকে বলেছে কি না। অনুরোধ উপরোধ করেই বলেছে। তো তোর মা কখনো সে অনুরোধের মান রেখেছে? জিগ্যেস কর। বরাবরই বলেছে—পুজো তো আর ওদের নিজেদের নয়, মামাদের। ওদের বলায় কার যাবার দায় পড়েছে! কী গো বলনি এ কথা? বল না মেয়ের কাছে?

বলতে হয় না, বুবু আগেই বলে ওঠে, ঠিক কথা। মার বুদ্ধি হ্যাজ। তোমার মতন ন্যালাক্ষ্যাপা নয়।

সরোজ তবু লড়ার চেষ্টা করেন।

তা একবার তো ওদের মামাদের দিয়েও বলিয়ে ছিল। ওর বড় মামা নিজে এ বাড়ি এসে বলে গিয়েছিলেন। তাই বা তোমাদের মা জননীর মর্জি হলো কই? তোদের ঠাকুমাও তো তখন বেঁচে, কত করে বললেন, যাওনা বৌমা, বলছে এত করে। পাড়াগাঁয়ের পুজোবাড়ির আমোদই আলাদা। গেল? বলল, ওরকম ধরে ভদ্দর ঘটানো নেমন্তন্নয় আবার কে যায়? গেলে সব্বাইয়ের কাছে পরিচয় দেওয়া হবে তো আমদের সামনের বাড়ির পড়শী। ধ্যেৎ। হ্যাংলা হ্যাংলা লাগবে।

দ্যাটস রাইট্। কারেক্ট!

বুবু দালানের চৌকিতে বসে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল।

তারপর মুচকি হেসে বলে, তা তুমি যাও না কেন? তোমার তো অত প্রেস্টিজ জ্ঞান নেই। ও! যাবে কী? ওনাদের বাড়ি আগলাবে কে?

কী যে সব বোকার মতো কথা বলিস তোরা! সে কবেকার কথা তখন তো মেসোমশাই বেঁচে। উনি তো আর যেতেন না।

ওমা সে কী! শ্বশুরবাড়ির পুজো! অত ঘটাপটা! যেতেন না? আহা! কেন? শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনতো না বুঝি?

ভারী আহত হন সরোজ।

কী ছেলে মেয়েই তৈরী হচ্ছে তাঁর ? গুরুজন ব্যক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধা সম্মান রেখে কথা বলা তো দূরস্থান যেন হ্যানস্থার ভাষায় কথা বলাতেই সুখ আমোদ, বাহাদুরী। আর তাঁকে ? প্রতিটি পদক্ষেপে বাপকে ডাউন করাই তো ছেলে মেয়ে দুটিরই প্রধান হবি। কোণঠাসা হতে হতে ক্রমেই যেন 'চোর' বনে যেতে বসেছেন সরোজ। তিনি যা কিছু করেন তার সবই হাস্যকর এবং ভুলভাল। এবং তাঁর যেন কোনো কিছুই করবার অধিকার নেই। কখন যে এমনটা হয়ে গেল।

আশ্চর্য সুলতাও যেন ক্রমেই ওদের শিবিরে গিয়ে জুটেছে। একসঙ্গে তিনজন ব্যঙ্গের ছুরি বাগিয়েই বসে আছে সরোজকে কচুকাটা করবার জন্যে।

অথচ সরোজের এমন স্বভাবই নয় যে বলে উঠবেন বেশ করছি, খুব করছি। আমার ব্যাপারে নাক গলাবার তোরা কে ?

নাঃ তা বলতে পারেন না, শুধু অপর পক্ষের কাছ থেকে সমর্থনের ক্ষীণ চেষ্টা চালিয়ে যান। এখনো আহত হয়েও আলগা গলায় বলেন, কী যে সব কথার ধরন হয়েছে তোদের। কাকাবাবু চিরকাল হাঁপানী রুগী মানুষ। হৈ-হল্লোড়ের মধ্যে সহ্যই হতো না। তাই যেতেন না। বলতেন বাড়িতে একা বেশ থাকব। তো তখন তো আর রান্নার লোকটাকে নিয়ে যেতে হতো না। তোফাই থাকতেন। একবার তো আমায় নেমন্তন্নই করে ফেললেন, সরোজ এসো এসো একদিন দুজনে একসঙ্গে খাওয়া যাক। কী চমৎকার মানুষই ছিলেন !

তোমার কাছে তো ওদের বাড়ির সবাই চমৎকার। কুকুরটা বেড়ালটাও চমৎকার !

সুলতা ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে।

'ওদের' বাড়ি সম্পর্কে যে সুলতার কেন চিরকাল এত বিদ্বেষ বিরাগ কে জানে। তবে বরাবরই এটি অনুভব করেন সরোজ। আগে কম বয়সে অবশ্য এর অন্য ব্যাখ্যা করতেন। ভাবতেন ও বাড়ির ওরা এসে গল্প করতে বসলে, অথবা সরোজ ও বাড়িতে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসলে সুলতার প্রাপ্য সময়ের ওপর খাবোল পড়ে বলেই এত গোঁসা।

কিন্তু এখন ? এখন কে সরোজ নামক রিটায়ার্ড বুড়ো লোকটার সঙ্গকামনায় হাঁফাচ্ছে ? মজলিস যা কিছু সে তো সরোজকে বাদ দিয়েই। সরোজের রাজনৈতিক মতবাদ, সমাজনৈতিক মতবাদ, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত টি. ভি প্রোগ্রাম রেডিও প্রোগ্রাম সব কিছুকে নস্যাৎ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই ওদের বলেই সরোজ নিজের মনে থাকেন। নয়তো মাঝে মাঝে ও বাড়ি গিয়ে বসেন।

গেলে কী খুশী হন কাকীমা। ধ্রুবও তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা দিয়ে কথা বলে, শোনে। আর কাকাবাবু যখন ছিলেন ? প্রতিটি ব্যাপারে এই সরোজের সঙ্গেই তো পরামর্শ ! বয়েসে ছোট পড়শী জেনেও, তবু তার মতামতের মূল্য দিতেন।

তা সে কথা একদিন বলতে সরোজের পুত্রটি বলেছিলেন, তা সেটা না করলে আর তোমাকে দিয়ে ভূতের মতো খাটিয়ে নেওয়া যাবে কী করে ?

ভূতের মতন খাটিয়ে নিয়েছেন তিনি আমায়, অ্যাঁ !

না তো কী ? ওঁদের বাড়ির সব কাজেই তো তোমার ডাক। শুনতে পাই কাকাবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তোমারই যেন কন্যাদায়। আর ধ্রুব কাকার বিয়েতেও তো দেখেছি, মনে আছে যেন তোমারই সব দায়। এই তো এখন বাড়িতে মিস্ত্রী লাগল, বাহার করে রং-টং লাগানো হলো, সব তাতেই 'সরোজদা'। সাধারণ একটা রিটায়ার্ড বেকার বুড়ো, তোমার সময়ের দাম কী ?

সরোজ হঠাৎ এখন খুব উত্তেজিত হয়ে যান। বলেন, এ সব কী 'ছোটলোকের' মতো কথা তোদের, অ্যাঁ ! ধ্রুবর দাদা শুভ আমার একবয়সী বন্ধু ছিল। অকালে চলে গেল। সেই অবধি ধ্রুব আমায় নিজের দাদার মতই—

গলাটা ধরে এল সরোজের। এখনো ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় যে বন্ধু চলে গেছে, তার কথা উঠলে গলায় বাষ্প জমে ওঠে সরোজের।

কিন্তু সেই জমাটা কে লক্ষ্য করছে ?

বুবু বাবার কথার মধ্যপথেই ঠিকরে উঠল। কী আমরা ছোটলোক ? ওঃ। আর তোমার সাধের ভাই ধ্রুব ! উনিই বা কী ভদ্রলোক-অ্যাঁ ? কোনকালে মরে যাওয়া দাদাটির নাম ভাঙিয়ে খেয়ে চলেছেন ! আমি একে ছোটলোকমি বলি।

তীরবেগে অন্য ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য ! ওই চোখ মুখ ঝলসে যখন বান্ধবীদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে গল্প করে, তখন মনে হয় না কি সদ্য কিশোরীর মাধুর্য ছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো কিছুই নেই।

মেয়ের চলে যাওয়া দেখেই চমকে উঠল সুলতা।

হলো তো ? সাপের ল্যাজে পা-টি দিলে তো ? এখন দেখো খাব না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসতে গেল কি না। খোসামোদ করে মরতে হবে আমাকেই। তো মিথ্যেও কিছু বলেনি ও। ধ্রুবটি তোমার কম ঘোড়েল ছেলে নয়। সেই মরা দাদাটিকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে দাদার বন্ধুটির কাছ থেকে কেমন কাজ বাগিয়ে চলেছে। শুধু কি বাড়ি আগলানো ? একশো রকম ফরমাস। কবে কোন তারিখে ওনাদের দুধের কার্ড করিয়ে রাখতে হবে, কবে ইলেকট্রিক বিল এল লক্ষ্য রেখে মিটিয়ে দিতে হবে। যদি ধোবা আসে কি করতে হবে, খবরের কাগজের বিল দিতে এলে শোধ করে দিতে হবে, ডাকপিওনরা যদি পুজোর বখশিস চাইতে আসে তো—

সে সব আমার নিজের পকেট থেকে দিতে হয় ?

এখন ছেলে মেয়ে নয়, গিন্নী। তাই সরোজ ক্রোধ প্রকাশে সাহস করেন। হেরে যাবেন জেনেও। বলেন, গুনে গেঁথে হিসেব করে রেখে যায় না টাকা পয়সা ?

রাগ দেখানো সরোজের স্বভাব নয়। কিন্তু আজ ভারী খারাপ লাগছে। এই মাত্র ধ্রুবরা চলে গেল, ছোট্ট মেয়েটার 'সরোজদা টা টা' বলে হাত নাড়াটা চোখের সামনে ভাসছে। আর এখনই সবাই মিলে যত কূট-কচালে কথা। এদের মনের মধ্যে এতো বিষ কেন ?

অবশ্য রাগপ্রকাশ ওই এক লহমাই। ওর বেশি চালাবার সাহস নেই। স্বভাবও নয়।

মনোজ এতক্ষণ খানিকটা দূরে বসে একটা বিগড়োনো কলমের ক্যাপ খুলে কালি ভরবার চেষ্টা করছিল। বাবার কথা শুনে মুখটা একটু তুলে রাজকীয় ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, ওহো হো তাও তো বটে! টাকা-পত্তর সব গুনে গেঁথে তোমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে যান। তবে তো সাত খুন মাপ। কিন্তু দায়টি বা চাপিয়ে যাবেন কেন? নিজের ভাগ্নে টাগ্নে রয়েছে—

ভাগ্নে!

সরোজ আকাশ থেকে পড়ল।

ভাগ্নে! মানে সাধনাদির ছেলেরা? সেই দমদম থেকে এসে এসে এই সব করে যাবে?

লোকেরা তাই করে বাবা! সবাই তো আর এরকম একটি উদার মহান পাতানো দাদা পায় না।

কী আশ্চর্য! এর মধ্যে উদারতা মহত্ত্ব এত কথা আসছে কোথা থেকে? প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে এরকম সামান্য একটু সাহায্য করবে না?

সামান্য?

মনোজ উত্তপ্ত গলায় বলে, এটাকে তুমি তোমার বুদ্ধিতে 'সামান্য' ভাবতে পারো। আমি পারি না।

অর্থাৎ বাবার বুদ্ধির থেকে তার বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে।

সরোজ আর কিছু বলার আগে তাঁর বুদ্ধিগর্বিত পুত্র আবারও বলে ওঠে, শুধুই কি বাড়ির চাবি? বাড়ির যতসব আলমারী বাক্সর চাবি থেকে ব্যাঙ্কের লকারের চাবি পর্যন্ত। এর মানেটা কী?

সরোজ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, মানে হচ্ছে আমায় সত্যি বড় ভাইয়ের মতো বিশ্বাস করে।

সুলতা কোথা থেকে বলে উঠল—

ওই আনন্দেই বুদ্ধু হয়ে থাকো। নিজের দায়িত্বটি অপরের ঘাড়ে চাপাবার সুবিধে পেলে—কেন চাবি নিজেরা নিয়ে গেলেই হয়।

সরোজ আবার কিঞ্চিৎ জোর পান। কারণ এখন আবার প্রতিপক্ষ তবু গিন্নী। বললেন, নিজেরা নিয়ে যাবে? সেটাই খুব সেফ? সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে যাওয়া! শুনতেই কাছে! নলহাটি থেকে কতটা ইনটিরিয়ারে সেটা তো জানো?

ভগবানকে ধন্যবাদ, যে সেটা জানবার সৌভাগ্য হয়নি। তোমারই জানা।

সরোজের মনের মধ্যে একটা সুদূর অতীতের ছবি ভেসে ওঠে!

দুটি বালক চলেছে—গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর হেসে গড়াতে গড়াতে। সঙ্গের অভিভাবকরা মাঝে মাঝে তাদের অতি হাসির জন্যে বকুনি লাগাচ্ছেন। তাতে ছেলে দুটো কিছু মাত্র বিচলিত হচ্ছে না। একটুক্ষণ ফিসফিস খুকখুক হাসি, কনুইয়ের ঠেলাঠেলি। আর

হঠাৎ আবার একটা ঝাঁকুনি খেলেই বাঁধভাঙা ব্যাপার।

খুশি খুশি। ভিতর থেকে উছলে পড়া অকারণ একটা খুশির জোয়ার। কোথা থেকে আসতো সে জোয়ার।

আচ্ছা এখনকার ছোট ছেলেগুলো কি তেমন 'অকারণ পুলকে' উথলোয় ? দেখি না তো।

বরাবরই ওই দুটো ছেলে একসঙ্গে। স্কুলে তো বটেই। তাছাড়া যখন যেখানে। আর ওই পুজোবাড়িতে যাওয়া তো অবশ্যই।

তার পর দুজনের একজন অকস্মাৎ চিরতরে চলে গেল। বাস, তদবধি আর অন্য ছেলেটাও সেই পুজোবাড়িতে যায়নি। তবু এখনো ছবির মতো চোখে ভেসে ভেসে ওঠে সে দৃশ্য ! অবশ্য কাকীমারাও বেশ কয়েক বছর আর যাননি। ক্রমশঃ আবার মা ভাইয়ের কাতর অনুনয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সরোজকে নিয়ে যেতে পারেননি আর।

কিন্তু সে সব কি আজকের কথা ?

কত কত দিন পার হয়ে গেল। তবে এই দুটো পরিবারের জীবনরথ এগিয়ে চলতে লাগল পাশাপাশিই। দুজনদেরই পৈত্রিক বাড়ি, পাড়া ছাড়া হবার প্রশ্ন নেই।

কিন্তু এ যাবৎ কাল তো একদিনের জন্যেও সেই রথের চাকায় চাকায় সংঘর্ষ ঘটেনি। চলার ছন্দে ছন্দে পতন হয়নি। দুটো পরিবারের সুখ দুঃখ তো একই ছিল। একই তারে বাঁধা।

হঠাৎই কিছুকাল থেকে অনুভব করছেন সরোজ অবিরতই যেন একটা ভাঙা চাকার শব্দ উঠছে। ক্যাঁচকেঁচে কর্কশ। উঠছে সরোজেরই বুকের পাঁজরার খাঁজ থেকে।

আশ্চর্য ! ক্রমেই দেখতে পাচ্ছেন সরোজের স্ত্রী পুত্রকন্যা যেন তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর অবিরতই সরোজের একান্ত ভালবাসার জায়গাটিতে আঘাত হানছে।

'ও বাড়িটা' যেন এদের শত্রুপক্ষের।

সরোজের ওদের সম্পর্কে যে ভালবাসার দুর্বলতাটি আছে, সেখানটাই যেন এদের চক্ষুশূল। আর তাতে প্রতিপদে ব্যঙ্গের হুল !

ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সরোজ যেন পরকীয়া প্রেমের নায়ক। তাই সরোজও ক্রমেই নিজেকে সঙ্কুচিত করে চলেন। চলেন ফেরেন অপরাধী অপরাধী ভাবে। ওদের বাড়ি গিয়ে বসে দুটো কথা কইতে গেলেই যেন পিছন থেকে কে ছাট মারে। অথচ এখন হাতে অগাধ অবসর ! রিটায়ার করেছেন।

আশ্চর্য ! কোথায় গেল সেই নিরুদ্বেগ আড্ডার দিনগুলি ? ছুটির দিনে তো বটেই। কখনো কখনো অফিস ফেরতও।

আড্ডার যোগ্য কে ছিল ?

হিসেব মতো কেউ না। শুধু তো কাকাবাবু-কাকীমা আর ধ্রুব, ধ্রুবর বোনেরা যে যখন থাকে। ধ্রুবর বৌ ছেলেও। তা তারাই আকর্ষণের উৎস। সরোজ গেলেই সবাই তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়, বসে পড়ে। ধ্রুবর মা কিছু না খাইয়ে ছাড়েন না।

কিন্তু এই অনাবিল সুখের দিনটি হারিয়ে গেছে সরোজবন্ধু নামের লোকটার জীবন থেকে। সরোজ ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন। কিন্তু তা বলে কি বাড়িতে কেউ তাঁর উপস্থিতিকে মূল্য দেয় ? নাঃ ! কিছুমাত্র না ! সময়ে এক পেয়ালা চা সামনে ধরে দিলেই মনে করে অনেক করেছে।

হাওয়ার গতি কী ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে।

বড় মেয়েটা যে না কি আগে 'ধ্রুবকাকার বাড়ি' বলে প্রাণ বার করতো। শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে আগে ওদের বাড়ি ছুটতো, সেও দেখা যায় এখন এদের সুরে সুর মিলিয়েছে। যেন সবাই এখন ধরে ফেলেছে সরোজ এ যাবৎকাল তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রাপ্য সম্পত্তির অনেকখানিকটা অন্যকে বিলিয়ে এসে এদের লোকসান ঘটিয়েছেন।

সরোজের যুক্তি শুনে সুলতা মুখটা তেতো করল।

ওদের 'সেফ্' 'অসেফ্' নিয়ে তোমার কিসের মাথা ব্যথা ? অ্যাঁ ? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে।

ওরা বুঝবে।

বোকা সরোজ যেন হতভম্ব হয়ে তাকালেন।

মনোজ মা বাপ দু'জনের মুখযুগল একবার অবলোকন করে বলে উঠল, আলবাৎ ! তুমি কোন দরকারে পরের চরকায় তেল দিতে যাবে ? আমি হলে এরকম দায়িত্ব সত্যি নিজের ভাইয়ের হলেও নিতাম না।...ও হো হো ভুল হচ্ছে। উনি যে আবার তোমার ভাইয়ের 'অধিক'।

এই একখানি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছুরি বাপের বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল মনোজ।

সরোজ বসে রইলেন মৃতের মতো চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে। নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখবার জন্যে তো সুলতারই শরণাপন্ন হতে হবে। সরোজের নিজের বলতে কী আছে ? একটা 'হাতবাক্স'ও তো না, আগেকার আমলের কর্তাদের মতো।

অতএব অপেক্ষা করতে হবে সুলতার মেজাজ মর্জির আনুকূল্যের কোনো মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য।

নির্বোধ লোকটা তাই সেই চাবির গোছাটাই নাড়তে নাড়তে ভাবতে থাকে।

কেন ওদের প্রতি এদের এত বিদ্বেষ ! ওরা তো কত নম্র বিনয়ী, আপনজনের মতো। কাকীমা তো সুদূর অতীতে নিজের অকালমৃত ছেলেটার বন্ধুকেই প্রায় সেই শূন্য স্থানে বসিয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা করেছেন, সে ভালবাসা তো এখনো সমানই আছে। আর শুধু কি একাই তিনি ? পরস্পরের মধ্যেই তো সে বন্ধন !

জীবনের চেহারাটা কী অদ্ভুত ভাবে পাল্টে গেল।

এখনো যেন কানে বাজে কাকাবাবুর সেই দরাজ গলার হাঁক—কী রে সরোজ তোর মা বুঝি তালের বড়া ভাজছে ?...জানিস না ? আরে বাবা তুই না জানিস আমি গন্ধে গন্ধে জেনে

ফেলে ছুটে এসেছি। ও বৌদি ! ও বাড়িতে চালান করবার আগে আমার ভাগটি আমায় এই বেলা গরম গরম সাপ্লাই করুন দিকি ! এখান থেকে সেঁটে যাই।...সরোজ একটা প্লেট আন। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার পর কি আর ভোদের কাকীমা তেমন প্রাণ ভরে দেবে রে ? নিজের পোলাপুলিদের জন্যে বেশিটা সরিয়ে রাখবে। হা হা হা !

সরোজ ছুটে গিয়ে একটা প্লেট নিয়ে মার কাছে ধরে দিত। মা প্লেট বোঝাই করে নিয়ে এসে হেসে হেসে বলতেন, আপনি বড় নিন্দেকুটে ঠাকুরপো। বলে দেব ইন্দুকে।

দিন না বলে। আপনার 'ইন্দু'কে আমি ডরাই না কি ? হা হা হা।

আহা ! আপনার হাঁপানির টান ওঠার ভয়েই ইন্দু সাবধান হয়।

ছাড়ুন তো ! ও সব ছুতো। বুঝলেন ছুতো ! হা হা হা হা।

কী সহজ ছিল সেই জীবন। সেই দিনগুলো। সেই সহজতাকে হারিয়ে ফেলে কি মানুষ সুখী হয়েছে ? বেশি সুখী ?

এসব গল্প আগে ছেলেমেয়েদের কাছে করতে গিয়ে বোকা বনে গেছেন সরোজ। আর করেন না।

ছেলে বলেছিল, এসব ন্যাকামির গল্প আমার কাছে করতে এসো না বাবা। শুনতে বিচ্ছিরি লাগে।

আর মেয়ে বলেছিল, পেটুকরা ওইরকম সুযোগসন্ধানী আর অ-সভ্য হয়।

দেখেছেন সুলতাও ওদের দলে।

তবে থাক আপন হৃদয়ের সহজ দিনের গল্পগুলি। আপন হৃদয়ের মধ্যেই চাপা থাক।

সরোজের যা যা নিয়ে আনন্দ, এদের ঠিক সেইগুলোতেই অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য !

মানুষ মানুষকে অকারণ ভালবাসতে যাবে ? কেন ? কী দুঃখে ? খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ? যতসব বোকামি আর ন্যাকামি !

সরোজের মনে হলো মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তবু যেন সংসারের ঠাটটা একই রকম ছিল। ভিতরে-ভিতরে যার যা হোক জীবনযাত্রায় ছন্দপতন ঘটেনি। তখনই তো এই চাবি গছানো পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরোজের মধ্যে তখন কি নিশ্চিন্ততা।

মা আমাকে চটপট খেতে দিয়ে দাও। ও বাড়িতে চলে যেতে হবে। একটু সকাল সকাল যাওয়াই ভালো বাবা। বেশি রাতে গেলে যদি দেখি তালা ভাঙা বাড়ি ফর্সা ! হা হা হা।

মা বলতেন, 'দুর্গা, দুর্গা'।

মাও জানতেন ওরা আপন জন।

ব্যাস তারপরই পালা বদলে গেল।

ধরতে পারেন না কারণটা কী ! হঠাৎ কী ত্রুটি ঘটল বেচারী কাকীমাদের !

লোকটা বোকা তো তাই ধরতে পারেন না কারণটা কী।

ত্রুটিটা তো অপর পক্ষের নয়, ত্রুটি এই প্রজন্মের নিজের মধ্যেই। এই প্রজন্ম বুদ্ধিমত্তায়

আর বিদ্যাবত্তায়—অনেক ক্ষমতা আয়ত্ত করে ফেলেছে। তবে তার মাশুল জোগাতে একটা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ভালবাসবার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা দিনের দিন 'দেউলে'র খাতায় নাম লিখছে। তাই তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ক্ষুদ্রতা তিক্ততা নীচতা আর বিদ্বেষ!

অকারণ বিদ্বেষ!

ভালবাসার সঞ্চয়হীন দেউলে হয়ে যাওয়া এই প্রজন্ম তাই সঞ্চয় করে চলেছে ওই বিদ্বেষ আর বিষের পুঁজি।

নিজেরা ভালবাসতে পারে না, জানে না।

অথচ হয়তো সেই না পারার অক্ষমতা থেকেই-এখনো যারা ভালবাসতে পারে, ভালবেসে সুখী হতে জানে তাদের প্রতি এত ঈর্ষা এই প্রজন্মের। সেই ঈর্ষার বিষ নিয়ে তাই অবিরত ছোবল হানে তাদের প্রতি। ছোবল হানাটাই লক্ষ্য! উপলক্ষ যাই হোক।

যেন জীবনের আলো আলো বড়রাস্তাটা হারিয়ে ফেলে একটা ছায়া ছায়া সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেরাও সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দরাজ হাওয়ায় ফুসফুসটা ভরে নিতে পাচ্ছে না বলেই 'দরাজ' শব্দটাই ভুলে যাচ্ছে।

কিন্তু সরোজবন্ধুর সাধ্য কি যে এ যুগের এই হৃদয় ঐশ্বর্যে নিঃস্ব দেউলে হয়ে যাওয়া হৃদয়ের জটিল কুটিল সর্পিল তত্ত্ব বুঝতে পারেন। পারেন না তাই হতাশ হয়ে ভাবেন, এরা এমন করে কেন? একটু ভালবাসতে পারলেই তো কত সমস্যা কত সহজে সমাধান হয়ে যায়। ভালবাসতে পয়সাও লাগে না খাটুনিও লাগে না। সেইটুকু বোঝার অভাবে 'আহ্লাদ' শব্দটার বানানই ভুলে গিয়ে শুধু নিমের পাঁচন খাওয়া মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে—কাকে কখন কী ভাবে ডাউন করা যায়।

সেই ডাউন হবার আশঙ্কায় সদা সশঙ্কিত সরোজবন্ধু নিচু গলায় সন্তর্পণে বলেন, আমার খাবারটা দিয়েই দাও। আবার হয়তো লোড্‌শেডিং হয়ে বসবে।

তারপর আরো সন্তর্পণে বলেন, আর এইটা রেখে দাও।

সাহস করে 'চাবি' শব্দটা উচ্চারণ করতে পেরে ওঠেন না।

❑

জগন্নাথের জমি

চা খেয়ে খবরের কাগজখানা হাতে নিতে যা দেরি। যথানিয়মে ধূমকেতুর মতোই এসে উদয় হল লোকটা। হাঁটু অবধি ধুলোর স্তর, খড়ি-ওঠা গা, শিরা-ওঠা হাত, খোড়ো বাড়ির চালের মতো মাথা, এবং আগাছার জঙ্গলে ঢাকা মুখটা নিয়ে। এক দৃশ্য !

দেখলে আহ্লাদ হবার কথা নয়। তীর্থঙ্করেরও হল না। তবু বলতেই হল, এই যে !

তা ধূমকেতুরও উদয়-অস্তের একটা নিয়ম থাকে, এরও আছে। উদয়ক্ষণ প্রতিটি রবিবারের সকাল, আর অস্তক্ষণ, ছুটির সকালের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে, ঘড়ির কাঁটাটাকে বারোটায় ঠেলে দিয়ে।

নিয়মের ব্যাতিক্রম নেই। অর্থাৎ যত দিন থেকে লোকটা তীর্থঙ্করের ঘাড়ে চেপেছে। তীর্থঙ্করের ছোটো ভাই শুভঙ্কর বলে, তা ঘাড়ে চাপা-ই। ভূতের মতোই ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তো, তুমি যে দাদা রোজায় রাজি নও। আমার হাতে একবার ছেড়ে দাও, দ্যাখো, ভূত ছাড়াতে পারি কিনা। ব্যাটাকে এই ভোলাপুরের রাস্তা ভুলিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু তীর্থঙ্কর তাঁর ভাইয়ের এই প্রেসক্রিপশনে রাজি নন। ওই পাগল-ছাগল লোকটার মধ্যে তিনি একটা মহত্ত্ব দেখতে পান।

যদিও ওকে দেখলে গা জ্বলেই যায়। যাবে না ? ঝড়ের বেগে এসেই লোকটা ওর ওই মাথাভরতি (কে জানে উকুনভরতিও কি না) খোড়ো-চুল সমেত মুখটা জোর করে তীর্থঙ্করের পায়ের ওপর ঘশটাতে-ঘশটাতে বলে ওঠে, আবার আপনারে একটু জ্বালাতে এলুম উকিলবাবু।

তীর্থঙ্কর যে কস্মিনকালেও উকিলবাবু নন, নেহাতই একটা সওদাগরি আফিসের কেরানিবাবু মাত্র, একথা লোকটাকে বলে বোঝানো যায় নি। বোঝাবার চেষ্টায় কাহিল হয়ে গিয়েই তীর্থঙ্কর এই উকিলবাবু ডাকটাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কে যে ওর মাথায় এই ধারণাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে, তা ও জানে আর ভগবান জানেন। তবে বদ্ধ পাগলের বদ্ধমূল ধারণা ছাড়ানো যায় না।

উকিল নই বললে, ও অক্লেশে বলে, আমি আপনারে ফীজ দিতে পারব না বলে ছলোনা করচেন উকিলবাবু। কিন্তু আমারে ঠকাতে পারবেন না।

অতএব তীর্থঙ্করই ঠকে চলেছেন। মাসের পর মাস রবিবারের সকালটি ওর পায়ে উৎসর্গ করে মরছেন।

অথচ সপ্তাহে এই একটিই তো সুখের সকাল। অন্য সব দিনই তো আটটা-পাঁচের ট্রেন ধরতে ছুটতে হয়।

আরামের আর আয়েসের জন্যে ছিল এই রবিবারের সকালটি। কিন্তু এই এক হতভাগ্য ছিনেজোঁক কিছুদিন যাবৎ জীবন মহানিশা করে তুলছে তীর্থঙ্করের। অথচ দূরছাই করে তাড়াতেও মন চায় না। এই এক দুর্বলতা।

কিন্তু ব্যাপারটা কী ? এই প্রতিটি ছুটির সকালে এসে হানা দেবার কারণ কী লোকটার ?

কারণটা একান্তই হাস্যকর।

ওই চেহারা, ওই সাজসজ্জা—লোকটা আসে নাকি তার উকিলবাবুর কাছে একটা উইল লেখাতে। হ্যাঁ, আবেদনপত্র-টত্র নয়—উইল !

কোথায় কোন্‌খানে নাকি ওর একটা জমি আছে, সেটাকে সে কোনো সৎকাজে দান করে দিয়ে যেতে চায়। তাই এই উইলের বায়না।

গুছিয়ে বসে বলে, বউ নাই, ছেলে নাই, ভাই নাই, বুন নাই, কার তরে রেখে যাব বলেন ? অ্যাঁ ? তো, একটা সৎকাজের জন্যেই রেখে যাওয়া ভালো। কী বলেন ? অ্যাঁ ?

এখন মুশকিল এই, সেই সৎকাজটি পর্যাপ্তপরিমাণে সৎ হচ্ছে কিনা, সেটাই তার অহরহ চিন্তাভাবনার বিষয়। একখানা খসড়া লিখিয়ে নিয়েই, আবার সারা সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করতে থাকে। আর, পরের রবিবার সকাল হলেই ছটফটিয়ে ছুটে আসে, আগের উইলের খসড়াটা ছিঁড়ে ফেলে,নতুন একটা লেখাবার জন্যে।

এই পাগলামির তালে তাল দিয়ে চলতে হচ্ছে তীর্থঙ্করকে। তবে কেন হচ্ছে, সেটাও আর একটা চিন্তাভাবনার বিষয়। কে জানে, উদারতা, না চক্ষুলজ্জা ! তবে, এসে হাজির হলেই, হাতের খবরের কাগজখানা পাশে সরিয়ে রেখে তাপ-উত্তাপহীন গলাতেই প্রশ্ন করেন,আবার কী হল ?

আজও ওই কথাটাই বলে উঠলেন তীর্থঙ্কর পা-দুখানাকে ওর মাথার তলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে।

লোকটা মাটিতে বাবু গেড়ে বসল। বলল, ওই তো বললুম, আবার জ্বালাতে আসা ! গেল হপ্তার উইলখানা তো বদলের দরকার।

কী মুশকিল !

তীর্থঙ্কর বললেন, আরে বাবা, অনেক বারই তো বদল করলে—

লোকটা মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করলুম বটে। তো, আসলে কী জানেন ? জমিখানা য্যাখন একটা সত্যিকার সৎকর্মেই লাগাব ঠিক করেছি, ত্যাখন একটু ভালোমতো ভেবেচিন্তে করাই উচিত নয় কি ? কী বলেন, অ্যাঁ ? এই যে গেল হপ্তায় জমিখানা একটা লাইবেরির জন্যে দেওয়ার কথা হল—

তীর্থঙ্কর অসহিষ্ণুভাবে বলেন, কথা হল কেন ? ঠিকই তো হল ? দস্তুরমতো সবটি লেখা

হল, তোমার টিপছাপও দেওয়া হল--

হ্যাঁ, টিপছাপই।

যদিও উইল তৈরির বয়ানটা সে গড়গড়িয়ে বলে যায়, এবং কথার মাঝখানে-মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ বেশ এক-একটা সাধু শব্দও প্রয়োগ করতে পারে. তবে ওই টিপছাপের ঊর্ধ্বে যায় না।

বেশ গড়গড়িয়ে বলে চলে, আমি শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রোবর্তী অদ্য সজ্ঞানে সুস্থো দেহে লিখিতেছি যে আমার নিজোস্বো যে জমিখানা আছে—

এই আদালতি ভাষাটা যে সে কোথা থেকে রপ্ত করেছে কে জানে, তবে বলেও তো। কিন্তু নামটি স্বাক্ষরের সময় বলে ওঠে, দ্যান, আপনার কালির দোয়াতটা দ্যান অ্যাকবার, টিপছাপটা বসিয়ে রাখি। ব্যাস, কোনো একদিন কোর্টে গিয়ে রেজিসটিরিং করিয়ে আনার ওয়াস্তা। এই শেষ!

গেল সপ্তাহেও বলে গেছে একথা। আবার এ সপ্তাহে এই আবির্ভাব।

রাতভোর সমিস্যের তাড়নায় ঘুমাতে পারি নাই, উকিলবাবু। ভাবতেছি যে, জমিখানা তো জগা লাইবেরিতে দিল; কিন্তু পরে ভবিষ্যতে যদি পাড়ার পাঁচটা মস্তান ছেলে সেখানে আড্ডাখানা বসায়, বিড়ি-সিগরেট খায়, লাইবেরির বইপত্তর ছেঁড়ে, হারায়, তবে তো জগার দানটা অসৎকর্মেই গেল।

তীর্থঙ্কর হেসে ফেলে বলেন, তা উইল তো কার্যকর হবে তোমার মৃত্যুর পরে হে। তুমি তো আর দেখতে আসছ না!

অ্যাঁ! কী বললেন!

লোকটা রুষ্ট হল, ক্ষুব্ধ হল, উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, দেখতে আসব না বলে ভেতরে একটা দায়দায়িত্বো নাই? বিবেকবুদ্ধি নাই? বর্তোমানের ছেলেছোকরাদের মতিবুদ্ধি দেখছেন তো? ভবিষ্যতে আরো কি নিদি হবে বুঝছেন না? না না, লাইবেরির চিন্তা ছাড়ুন আপনি, উকিলবাবু। ওটা আপনি ছিঁড়ে ফ্যালেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রবর্তীর উইলের খসড়া তীর্থঙ্করের ড্রয়ারেই সুরক্ষিত থাকে। জগন্নাথের ভাষ্য— জগা কোথায় থাকে, কোথায় না থাকে, প্যাঁটরা-বাকসের বালাই নাই, তো উইল নিয়ে-নিয়ে কোথায় বেড়াবে? ওটুকুরে আপনি গুছিয়ে রেখে দিন। রেজিসটারি-কালে আপনারেই য্যাখোন যেতে হচ্ছে।

অন্য অনেক দিনের মতো, আজও, তীর্থঙ্করের ড্রয়ার থেকে একখানা রোল -করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করা হল, ছেঁড়া হল। অতঃপর আর-একখানা নতুন কাগজ টেবিলে বিছানো হল।

তীর্থঙ্কর বললেন, তা দেখো জগন্নাথ, তোমার সেই আগের সপ্তাহের ইচ্ছেপত্রটিই তো ভালো ছিল। ওটাই বজায় রাখো। হাসপাতাল। হাসপাতালে দান করার থেকে সৎকাজ আর কী আছে?

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, এটা আবার অ্যাখোন নতুন করে কী বলবেন, উকিলবাবু ! হাঁসপাতালের বিবোরণ তো জানা হয়ে গেছে। হাঁসপাতালে জগোতের যত অনাচার, কেলেঙ্কার আর পাপচক্রো না ? রুগীতে ওষুদ পায় না, পত্যি পায় না, আরো কতো দুর্নীতি। না না, হাঁসপাতালের চিন্তা ছাড়ুন আপনি।

যেন তীর্থঙ্কর সত্যিই চিন্তা করে মরছেন।

এখন তীর্থঙ্কর একটু রাগ-রাগ গলায় বলেন, তা, তোমার তো বাপু কিছুতেই মনঃস্থির হচ্ছে না। গোড়ায় তো বেশ বলেছিলে—একটা শিবমন্দিরের জন্যে জমিটা দিয়ে দেবে। ভালোই হত। পুণ্যকর্মই হত একটা।

বুজলাম পুণ্যকাজ, জগন্নাথ বিরস গলায় বলে। কিন্তু এটা তো দেখছেন আমাদের এই দেশখানায় গাঁয়ে গঞ্জে যেখানে সেখানে কতো কতো শিবমন্দির হাড়মুড় ভেঙে পড়ে আছে, না পুজোপাঠ, না কিচ্ছু। তো, আপনারা আর দেখবেন কোত্থেকে ! রেলে যাওয়া, রেলে আসা। এই জগার মতোন হাঁটা যে পিথিবী চষতেন তো টের পেতেন। তা, শিবমন্দিরের অবস্থা দেখে ও ইচ্ছে ছেড়েছি। যাক গে, আপনিই একটা ভালোমতো ব্যবস্থা দিন।

ওইরকমই বলে, কিন্তু অন্যের ব্যবস্থা নেয় না।

তীর্থঙ্কর আর নতুন গাড্ডায় পড়তে চান না। তাই তাড়াতাড়ি বলেন, আগে-আগে তো বাপু ভালো-ভালো ব্যবস্থাই হচ্ছিল। বলেছিলে, কোনো একটা ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমিটা দেবে—বেশ ভালো ভালো কথাই বলেছিলে—শিক্ষার বড়ো জিনিস নেই, জ্ঞানের আলোকহীন মনিষ্যিজীবন বিগ্রহহীন মন্দিরের তুল্য।

আজ্ঞে, সে তো নিজ্জস। বলতেই তো হবে। এই যে হতভাগা জগা—জ্ঞানবুদ্ধি নাই বলেই না এমন দশা। শিক্ষাই মূলাধার।

তবে আর মন বদলালে কেন ?

জগা উঁচু হয়ে বসে।

কেন—সে কথাটা আবার অ্যাখোন সুদোচ্চেন ?

শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ চক্রবর্তীর কোটরে-বসা চোখ দুটোয় ফস করে দুটো দেশলাইকাঠি জ্বলে ওঠে। আগুনঝরা গলাতেই বলে, বর্তোমানে শিক্ষাবিভাগে কতো দুর্নীতি, আপনারা জানেন না ? খপোরের কাগজে পড়েন না রাতদিন। এসব কথা তো হয়ে গেছে সিদিনকে। তো, এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে জমিটা উচ্ছুগু করব ? তো, চেয়েটেয়ে না দেখে হুট করে অপাত্রে কন্যেদানের মতোন দান করে বসব ?

তীর্থঙ্কর হতাশ গলায় বলেন, তা একটা কিছু ঠিক করে ফেলো। আর কতদিন চলবে ?

জগন্নাথ এই স্বর শুনে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। বলে, কাজটায় আপনি ব্যাজার হন, উকিলবাবু ?

এরপর তীর্থঙ্করকে তাড়াতাড়ি বলেই উঠতে হয়, না না, সে কী কথা ! তুমি একটা মহৎ কাজ করতে চাইছ—এটা তো আহ্লাদের বিষয়। তবে কিনা—

কথার মাঝখানেই জগা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, তাই বলেন, আপনি নিজে মহোৎ মানুষ, বিষয়টা বুজছেন। আর-পাঁচজনা তো শুনতেই চায় না। দাঁত বার করে হাঁসে। তো, একটা কিছু ঠিক এবার আমি করে ফেলেছি! গতো রাত্তিরে, ভেবে-ভেবে ঘুম নাই, তো সহোসা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলুম। এটাই ফাইনাল।

ফাইনাল ? গুড ! তীর্থঙ্কর উৎসাহে মুখর—বলো শুনি তোমার সিদ্ধান্ত।

জগন্নাথ একটু নড়েচড়ে বসে, বলতেছি তো, আগে বরোং চাটুকু খেয়ে—

চা এখানে জগন্নাথের অবশ্যপ্রাপ্য পাওনা। বাড়ির লোকেরা জগন্নাথ সম্পর্কে যতই বিরক্তি পোষণ করুক, গেরস্থবাড়ির ধর্মটা তো লঙ্ঘন করতে পারে না। করলে তীর্থঙ্কর ক্ষুণ্ণ হবেন, সেটাও জানা।

চা এসে গেল বাড়ির খুদে কাজের ছেলেটার হাত দিয়ে। সঙ্গে যথারীতি একবাটি মুড়ি আর কয়েকটা ফুলুরি। ছুটির সকালে সেটা ভাজা হয়ে থাকে।

মুড়ির বাটিতে হাত দেবার আগেই চা-টা ঢকঢকিয়ে খেয়ে নিয়ে জগন্নাথ উদ্দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, অনেক ভেবে দেখে ঠিক করলুম, মনিষ্যির জন্যে কিছু করার দরকার নেই। সেটা নিহাতই তেলা মাথায় তেল ঢালা। তাদের জন্যে চাদ্দিকে কতো ব্যবস্তা, কতো আয়োজন। জমিটা আমি পথকুকুরদের জন্যে উছছুগু করে যাব।

শুনে তীর্থঙ্কর হাঁ— কাদের জন্যে ?

বললুম তো, পথে-ঘুরে-বেড়ানো বেওয়ারিশ নেড়ি কুকুরগুলোর জন্যে। আহা, তাদের জন্যে ভাববার কেউ নাই। জলে ঝড়ে দুর্দশার শেষ নাই, কাঠফাটা রোদে হাঁপিয়ে মরে। যেখানে যাবে দূরদূর ছেইছেই। অথোচো পোষা কুকুরের কতো আদর সোহাগ। ওদের দুঃখু দেখে প্রাণটা ফাটে। তো, ঠিক করেছি, ওদের জন্যে একটা আস্তানা গড়ে, ওইসব অভাগাদের আছুয় দেওয়ার—

তীর্থঙ্কর অসতর্কভাবে বলে ফেলেন, শেষ পর্যন্ত রাস্তার নেড়ি কুকুরদের জন্যে !

এ অসতর্কতার ফল সঙ্গে-সঙ্গেই পান তীর্থঙ্কর। জগন্নাথ ঠিকরে ওঠে, কেন নয়, উকিলবাবু ? ওরা ভগোমানের সিষ্টো জীব নয় ? ওদের দুঃখু-দুর্দশা দেখতে পান না ? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকল প্রাণীকেই ভগোমান গত্তো-টত্তো খোঁড়বার বুদ্ধি দিয়েছে, ওদের দেয় নাই। তবে ? ওদের দিকটা দেখাই তো বেশি দরকার। তা, মানুষের আক্কেলটি দেখবেন—যাকে পুষব তার জন্যে গদি-বিছানা, মাংস-ভাত, আর যেটা পথে ঘুরে মরছে, তাকে দূরদূর। এই চিন্তাতেই—

তীর্থঙ্কর খুব সামলে নিয়ে সাবধানে বলেন, তা যা বলেছ। ওদের কথা কে ভাবে ! ঠিক ! খুব ভালো সিদ্ধান্ত।

এই তো ! এই তো জ্ঞানী-গুণী মানুষের কথা। তো, এটাই গে আপনার শেষ খাটুনি। লিখে ফেলেন চটপট—আমি শ্রীযুক্ত বাবু জগোন্নাথ চক্রোবর্তী অদ্য সজ্ঞানে সুস্থো শরীলে—

তালভঙ্গ ঘটে।

যে লোক সাতজন্মে এ সময় এ ঘরে ঢোকে না, সে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে ওঠে, ভালো ! ভালো ! জগন্নাথবাবু তাহলে এত দিনে দানধর্ম করতে সত্যিকার সৎপাত্রের সন্ধান পেলেন। তো, গুনতিতে তো ওরা দুটি-চারটি নয়। ওদের জন্যে আশ্রম বানানো তো অনেক বিশাল ব্যবস্থা দরকার।

পাগল-ছাগল বলে কি জগন্নাথ বোকাসোকা ? তা বলে তা নয়। কথাটা শুনেই বিরস গলায় বলে, আশ্রমের কথা তো বলি নাই ছোটোবাবু, একটা আছুয়ের কথাই হচ্ছে—

আহা, ও একই কথা। আশ্রয় আর আশ্রম। তা লাগবে তো বেশি। জমিটা আপনার ক বিঘে, ক কাঠা ?

এ প্রশ্নে জগন্নাথ বিচলিত হয়। আর সেটা ঢাকতেই অধিক উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, সে হিসেব জগোন্নাথ জানে ? সময়কালে কোটকাচারির লোক এসে মাপজোপ করে নেবে।

আহাহা ! ঈশ ! জগন্নাথবাবু !

শুভঙ্কর ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, নিজের জমির মাপ জানা নেই ? তা, জমিটা কোনখানে সেটা জানা আছে তো ? দেখিয়ে দিলে এখন থেকেই—

তীর্থঙ্কর তাঁর ভাইকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজ হয় না। শুভঙ্কর আজ বোধহয় বদ্ধপরিকর হয়েই রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মুখে হাসির ঝিলিক।

কই হে, বললে না ? জমিটা কোথায় ? এই ভোলাপুরেই তো ? নাকি, আর কোথাও ?

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলে, এই ভোলাপুরে ? জগন্নাথ ভোলাপুরের মানুষ ? কবে কখন ঘুরতে-ঘুরতে ছিটকে এসে পড়েছে—

ওঃ ! তাও তো বটে ! তবে জানতে পারলে ভালো হত। আশ্রমের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারত। সময় লাগবে তো !

জগন্নাথ সহসা গম্ভীর হয়।

বলে, একটা কথা মনে রাখছেন না ছোটোবাবু, উইল কার্যোকরী হয় মিত্যুর পর।

'মিত্যুর পর' ! এই সেরেছে ! ও জগন্নাথ, তুমি বেঁচে থাকতেই জমির হদিস মিলছে না, তো পরে কী হবে ? হদিসটা জানা থাকলে কার্যকরী করার সুবিধে হত।

তীর্থঙ্কর তাড়া দিয়ে বলে ওঠেন, শুভো, তোর বাজার সারা হয়েছে ?

সে এ ইশারা গায়ে মাখে না। বলে ওঠে, ভালো করে ভেবে দেখো দিকিনি, জগন্নাথ, কলকাতার গড়ের মাঠটাই তোমার নয়তো ? নাকি, হাওড়া ময়দানটাই তোমার ?

জগন্নাথের চোখে আগুন ঠিকরোয়।

পাগল আর শিশু ব্যঙ্গে যতটা অপমানাহত হয়, সহজ বয়স্ক মানুষ বোধহয় ততটা হয় না। ক্রুদ্ধ গলায় জগন্নাথ বলে ওঠে, ছোটোবাবু কি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন ? আমি আপনার মশকরার যোগ্য ?

কী মুশকিল ! মশকরা কেন ? শুধু তো জানতে চাইছি। জমিটা তোমার এই পৃথিবীতেই

আছে তো ? নাকি আকাশে-টাকাশে—

ছোটোবাবু ! কোটরে-বসা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে একঝলক জল।

এই কথাটা বললেন আপনি ? জগার জমিখানা আকাশে আছে ! তার মানে—নাই, কেমন ? অবিশ্বাস ! তো, অ্যাতো বড়ো বিশ্বোবম্ভান্ডে জগার একখন্ড ভূমি নাই ? এই কথাটা মানতে বলেন আমায় ? পাগল-ছাগল মানুষ, বিত্তান্তটা গুলিয়ে ফেলেছি, দলিলপত্তরের হিসাবটা নাই, তাই বলে জমিটাই নাই ? পিথিবী থেকে অ্যাকেবারে আকাশে উড়িয়ে দিছেন ?

ময়লা ধুতির কোণটা তুলে চোখের কোণটা একটু মুছে নিয়ে বলে, জগা ব্যাটা হতোভাগা বলে কি অ্যাতোই হতোভাগা যে ভগোমান তারে সিষ্টি করে নিঃসম্বোল শূন্যে ছুঁড়ে দেছে ? অ্যাকখন্ড ভূমির বরাদ্দো রাখে না ? বলি, এই পিথিবীখানার মানুষপিছু মাটির বরাদ্দো নাই তার ? চুলচেরা হিসাব নাই ? জমিখানা আছেই নিজ্জস কোনোখানে। হক্কের ধন যাবে কোথায় ? আপাততো খুঁজে পাচ্ছি নে, সেটাই দুকখু। জেবনভোর তো খুঁজে মরছি। না পেলে ? তাই বলে হ্যানোস্তা দেখিয়ে, নাই করে উড়িয়ে দিতে হবে ? আপনার শিখ্যিত মানুষ, এই আপনাদের বিচার ? বলি, জমিটুকু তো জগা বেচে খেতে চায় নাই, অ্যাকটা ভালো কাজেই দিয়ে যেতে চায়। চেরোটা কালই তো ট্যাঁক গড়ের মাঠ, কখনো ভিকিরিকে একটা কানাকড়ি দিতে পেরেছে জগা ? থাকার মধ্যে ওই জমিটুকুন, সেটুকু নিয়েই নাড়াচাড়া। তো, দলিলখানা দেখাতে পারছি নে বলে ঠাট্টা, মশকরা সন্দ ! ধুত্তোর পিথিবী ! থাক উকিলবাবু, উইলে আর কাজ নাই আমার ! শিকখা হয়ে গেছে।

সটান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, টেবিলে সদ্য-বিছানো কাগজটা ফস করে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুচিয়ে মেজেয় ছড়িয়ে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে যায়। পায়ের ধাক্কায় মুড়ির বাটিটা ছিটকে গিয়ে মুড়ি ছড়াছড়ি হয়ে যায়। মুড়ির একটি দানা মাটিতে পড়ে গেলে যে কুড়িয়ে খায়, বলে, মা নোকখি, ফেলতে নাই।

তীর্থঙ্করের চোখটা জ্বালা করে ওঠে। মাথা ঝুঁকিয়ে সেই ছড়ানো মুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে থেকে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন, মানুষ এমন অকারণ নিষ্ঠুর হয় কেন ? অহেতুক হিংস্র !

তীর্থঙ্কর বুঝে ফেলেছেন, পাগলা জগাকে আর কোনোদিন এই ভোলাপুরের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে না।

হয়তো আর কোনোখানে ছিটকে গিয়ে তার ন্যায্য পাওনার জিনিসটা খুঁজে বেড়াবে—খড়ি-ওঠা গা, শিরা-ওঠা হাত, খোড়ো চালের মতো মাথা আর হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর স্তর নিয়ে। যেটা সে একটা সত্যিকার সৎকাজে লাগাতে উইল করে যাবে।

❑

স্বর্গের টিকিট

ঘরে অনেক মানুষ ! ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি। মানুষের নিঃশ্বাসের ভারে ভারাক্রান্ত বাতাসে আর একজনেরও যেন নিঃশ্বাস ফেলবার ফাঁক নেই। তবু নিত্যদিনই নতুন নতুন মানুষের জোয়ার এসে আছড়ে পড়ছে সেখানে। থিকথিক করছে সর্বত্র।

তথাপি শহর কাউকে ফিরিয়ে দেয় না।

সেই থিকথিকেদের আশ্রয় দিতে ইটের পর ইট সাজিয়ে আকাশছোঁয়া ইমারত বানিয়ে চলেছে অবিরাম অবিরত, তার নিজের বুকে সব সবুজ ধ্বংস করে, সব জল নিংড়ে শুকিয়ে। তাও কূল পাবে না।

অথচ শহর ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে যাও ? দেখবে রাশি রাশি সবুজ, যেখানে সেখানে জল। হতে পারে সে সবুজ প্রায় সবটাই আগাছার, যে জল বেশির ভাগই পানা পুকুরের, তবু আছে তো ? আছে অনেকখানি খোলা মাঠ আর খুব নীল আকাশ। তবু কেউ সেই আগাছার সবুজের জায়গায় দরকারি গাছের চারা পুঁতবে না, সেই পানা পুকুরের পানা তুলে ফেলে তাকে 'কাকচক্ষু' করে তুলতে যত্নবান হবে না, আর খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে দেখবে না। ছুটবে সেই শহরের দিকে। ভাববেই না একটু চেষ্টা করলে এখানটাকে বসবাসযোগ্য করে নেওয়া যায়।..... একই তো মাটি। একই আকাশ বাতাস। রুজি রোজগার ? তারও কী পথ নেই ? সে পথ খোঁজে না কেউ।

তবু গ্রামে গঞ্জে কি আর আদৌ মানুষ নেই ? তা নয়। আছে গ্রামে গঞ্জে গন্ডগ্রামে। তবে সে যেন থাকা নয়, বাধ্য হয়ে পড়ে থাকা।

পড়ে থাকতে থাকতে, সুযোগ পেলেই জোয়ারের জল বাড়াতে—ছুটছে শহরমুখো হয়ে। আর সুযোগ না পেলে ? তারা পড়ে থাকতে থাকতে বুড়িয়ে চলেছে। বুড়িয়ে চলেছে—সরকারি প্রতিশ্রুতির দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় দিন গুনতে গুনতে, সরকারের দরজায় ধর্ণা দিতে দিতে আর 'স্বপ্নহীন' দিনরাত্রিগুলো কোনোমতে ঠেলতে ঠেলতে।

তবে হিসেব করে বলা শক্ত গ্রামের গরিবরা বেশি দুঃখী, না শহরের গরিবরা বেশি দুঃখী। আর এত হিসেব করা শক্ত শহরের গা ঘেঁষা এই সব গ্রামের লোকসংখ্যা ঠিক কত। সঠিক হিসেব করতে হলে গুনতে বসতে হবে মাঝরাত্তিরে। যখন, সেখান থেকে ভোর সকালে লোকাল ট্রেনে বোঝাই হয়ে তল্লাট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া লোকগুলো আবার দিনান্তে সেই ট্রেনে বোঝাই

দিয়ে ঘরে ফিরে এসে নিজনিজ নীড়ে 'সুখসুপ্ত' থাকে।

অবশ্য সুপ্তিটা সকলেরই সুখের কিনা সেটা বলা শক্ত। কত জনই হয়ত শয্যাকন্টকী হয়ে রাত জাগছে—কী করে এখান থেকে সরে পড়া যায় ভেবে ভেবে।

এই বিনিদ্রদের মধ্যে মহিলাকুলই বেশি। কারণ বিগত যুগের মত এই ডেলি প্যাসেঞ্জার বাহিনী শুধুই পুরুষ সমাজ নয়। এদের মধ্যে দলে দলে 'তরুণী' 'যুবতী' 'মহিলা' এবং 'স্ত্রীলোক'।.... এদের জন্যেও এখন শহরে অনেক কাজের হাতছানি।

নেহাতই অভাগারা গ্রামের মাটিতে পড়ে থেকে দিন রাত্রি দুই-ই কাটায়।

এদের মধ্যে অধিকাংশই 'বালবাছা' 'বুড়োবুড়ি', কিংবা ঘোরতর সংসারী মধ্যবয়সিনী 'গিন্নীকুল' যাঁরা ওই লোকাল ট্রেনে বোঝাই হয়ে 'গ্রামছাড়া' আর 'গ্রামে ফেরা'দের জন্যে দু'বেলার রসদ গোছাবার জন্যে সমস্ত দিনটাই ব্যয় করে মরেন।

শুধু দু'বেলায়ই বা বলা যায় কী করে ? তিন বেলারই। দুপুরের টিফিনটাও তো গুছিয়ে দিতে হয় ওই ভোর সকালেই। এত বেশি পয়সা কার পকেটে থাকে যে শহরের দোকান পশার থেকে আহরণ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারবে ?

এই মহিলাকুল আর বুড়োবুড়ি বালবাছাদের দল ভিন্ন আর যারা গ্রামের মাটিতে বিরাজ করে তারাও দুভাগে বিভক্ত। একভাগের নাম 'অকালকুষ্মান্ড' অপর ভাগের নাম 'বেকার'। এরা মাননীয়। মানে যাদের কোনো একটা চেয়ারে বসা 'চাকরি' করা ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা নেই। বাসনাও নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সারাদিন মা-ঠাকুমার হাড় জ্বালানো ছাড়া আর বেশি কিছু করে উঠতে পারে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে এরা খবরের কাগজ পড়ে রাজনীতির তর্কে উত্তাল হয়ে বুদ্ধি কৌশলে বাড়ির লোকের কাছ থেকে কিছু হাতাতে পারলে দু-চার মাইল দূরের সিনেমা হলে সিনেমা দেখে আসে, এবং যখন তখন যেখানে সেখানে দুচারজনে মিলে গোল হয়ে বসে পড়ে আড্ডা জমায়। পায়ের কাছে একটা ঢিল পড়ে থাকলে বারংবার ঠোক্কর খায়, তবু ঢিলটাকে পা দিয়ে ছুঁড়ে দূরে পার করে দেয় না।

এ আড্ডায় যথানিয়মে ধোঁয়া ওঠে বিস্তর (ভগবান জানেন বেকাররা এমন অনর্গল ধোঁয়া ওড়ায় কার পকেট মেরে), রাজা উজিরগণ নিহত হয় এবং চিত্রতারকাদের ঠিকুজি কুলুজির নির্ঘন্টি আলোচিত হয়।

ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারে এরা এই অর্থহীন গালগল্পে।

বাড়ির মহিলারা হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে গালমন্দ করতে থাকেন এবং মাঝেমাঝেই হয়ত বাড়ির স্কুলের বালাইহীন বালখিল্যদের পাঠান ওদের তাড়া দিতে।

ওরা প্রথম দিকটায় ওই ছাত্রদের 'মারমার' করে ভাগিয়ে দেয়। শেষের দিকটায় অতি অনীহায় বেজার মুখে উঠে পড়ে, আর বাড়ি এসে হাত পা ছুঁড়ে ঘোষণা করে দু-দন্ড শান্তিতে থাকবার জো নেই তাদের। এই তাড়ার জ্বালায় জীবন মহানিশা।

তবে তারপর রাগারাগি অন্তে শহরে 'ছোটদের' দলের থেকে অনেক পরিপাটি করে

মধ্যাহ্নে ভোজটি সমাধা করে।... কারণ এদের পাতে তখন গেরস্থর রান্নাঘরের নৈবেদ্যটির ওপর হয়ত বা ঠাকুমা পিসির হবিষ্যির ঘরের এটা সেটা পড়ে।... হলেও উগ্রচন্ডা মেজাজি, আর নিষ্কর্মার ধাড়ি, তবু নাতি তো ? ভাইপো তো ?

অবিশ্যি তেমন তেমন ঠাকুমা পিসি হলে ডালচাপড়ি নারকেলের বড়া পোস্তচচ্চড়ির সঙ্গে খানিকটা গঞ্জনাও পরিবেশন করেন। 'দুম্বো ছেলেরা' ঘরে বসে থেকে—সংসারের কোনো কাজে লাগে না এমন অনাসৃষ্টি ভূভারতে আর আছে কিনা এ প্রশ্ন না করে পারেন না তাঁরা।

লাউ মাচাটা ভেঙে পড়ছে একটা ঠেকনো দিয়ে দাঁড় করাতেও পারে না গো।

এরা অবশ্য সে সব গায়ে মাখে না। খাওয়ার পর খানিকটা দিবা নিদ্রা সেরে, চা তৈরি হতে দেরি দেখলে রাগারাগি করে এবং সেটা হওয়া মাত্রই আবার পকেটে দেশলাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এবং আবার কোনোখানে গোল হয়ে বসে পড়ে ধোঁয়া ওড়ায় আর রাজা মন্ত্রী মারে। এদের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা প্রণালী দেখলে মনে হয়, কবে কোনো একদিন তাদের বাবা কাকা দাদা নিদেনপক্ষে দিদি কিংবা চিরকুমারী পিসিও 'চাকরি' নামক একটি পাকা ফল এদের হাতে তুলে দেবে ? ভরসায় দিন কাটানো ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই এদের।

একদা এদের বাবা কাকা জ্যাঠারা এই গ্রামের পরিবেশেই কম বয়সে 'ফুটবলপ্রেমী' দল গড়ছে। শখের থিয়েটার করে জোরালো জোরালো নাটক নামিয়েছে। এক আধখানা 'পাঠাগার'ও স্থাপনা করেছে। এখনো যেখানে ছুটির দিন গিয়ে বসে তারা। এদের তেমন কোনো চিন্তা চেষ্টারও বালাই নেই।

তবে হ্যাঁ একটা কাজ এরা ভালই করতে পারে, সেটি হচ্ছে 'প্রেম করা'।

গ্রামে গঞ্জে প্রেমের ব্যাপারটা শহরের থেকে অনেক বেশি। তা 'বাল্যপ্রেম' ব্যাপারটি তো বলতে গেলে গ্রামেরই ফসল। সেই প্রতাপ-শৈবলিনী পার্বতী-দেবদাস শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী থেকে হিসেব করে দেখলে সেটাই প্রমাণিত হবে।

তা এটাই স্বাভাবিক। গ্রামে গঞ্জে মেয়েরা অনেক স্বাধীন। কাজেই মেলামেশাটা সহজ প্রাপ্য। শহরে আব্রুর কড়াকড়ি বেশি মেয়েদের গতিবিধির ওপর খবরদারি আর নজরদারি বেশি। এই এখনো এ যুগেও। এখানে ঘাটে মাঠে পথে পেয়ারাতলায় মুখোমুখি হবার সুযোগ অনেক। বাল্যাবধিই হয়ে চলছে। হঠাৎ কখন সীমারেখা টানা হবে ?

অতএব বলতে গেলে প্রায় সব কটা ছেলেরই চোখের বা হাতের কাছেই এক একটি করে প্রেমিকা আছে। কেউ বা 'বাল্যপ্রেম' এর নিদর্শন দাবি এবং আনুগত্যে প্রায় পাকা দলিলের মত, কেউ বা কিছু কিঞ্চিৎ পরের। হয়তো রোজ দেখাশোনার পর আবিষ্কার করে বসল,'ও' আমার।

এই প্রেমিকাগণ স্বপ্ন দেখে আর দিন গোনে কবে 'ওর' চাকরি হবে। তাদের মনোভাবটি এই— যেন চাকরি হওয়া মাত্রই তাদের প্রেমাস্পদ তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা বাঁধতে ছুটবে। তাই সর্বদাই শুধোয়, চাকরির কিছু হল ?

শুধোয় যামিনী বিদ্যুৎকে, স্বপ্না গৌতমকে, অনুরাধা সঞ্জয়কে, শুভ্রা দেবদত্তকে। এবং

আরো কিছুজন আরো কিছুজনকে।

যে যেমনই হোক কোনো মেয়েটাই এই গ্রামের পরিবেশে জীবন গড়ার ভাবনা ভাবতে রাজি নয়। যদি এই পচা জায়গায় পড়ে থেকে শাশুড়ি দিদিশাশুড়ির অধীনস্থ হয়ে আর তাদেরই মত 'টাইমের ভাত' রাঁধাটাই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনে নিয়ে জীবন কাটাতে হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করে হলটা কী ?

তাছাড়া চির অন্ধ দেবতাটি তো সব সময় জাতগোত্র কুল শীল হিসেব করে 'পঞ্চশর' নিক্ষেপ করেন না ? যেদিকে ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা।...কলকাতাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা সেখানে অত 'বামুন শূদ্দুর' প্রশ্ন ওঠে না। সেখানে যে ইচ্ছে দিব্যি স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে। কেউ বলে উঠবে না। 'হ্যাঁ ভাই, তোমার স্বামী তো মিত্তির তোমার বাবা কেন মুখোপাধ্যায় ?'

'কলকাতার' ভূমিকা প্রায় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার মত।...

আরো যে একটি দলের কথা বলা হচ্ছিল ? যাদের নাম না কি 'অকাল কুষ্মান্ড' !...তাদের ভূমিকাও অনেকটা এদেরই মত। এই 'গ্রাজুয়েট' 'হায়ার সেকেন্ডারি' নানা বেকারদেরই মত। তারাও ওই একইভাবে ছাড়া গরুর মত ঘুরে বেড়ায়, বাড়ির লোককে জ্বালায় আর হম্বিতম্বি করে এবং 'প্রেম করে।'

হ্যাঁ সবকটা দস্যিরই একটা করে 'ভালবাসার জন' আছে। বিশু, বুড়ো, বুদ্ধ, প্রতাপ, পঞ্চু সব্বাইয়ের। তবে কিনা সেই যে একটা প্রবাদ আছে 'রাজার জন্যে রানী আর কানার জন্যে কানি' সেই অনুযায়ীই।

এদের প্রেমিকরা স্পষ্টভাবে 'কলকাতার বাসার' স্বপ্ন দেখে না। কারণ এই অকালকুষ্মান্ডদের কোনো অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসবার স্বপ্ন নেই।... কিন্তু স্বপ্ন দেখে স্টেশনের ধারে যে 'সিনেমাহল'-এর পত্তন হচ্ছে সেটা হয়ে গেলে, কিছু একটা কাজ পেয়ে যাবে সে।... বুড়োর চিন্তা লাইনের ওধারে যে কেমিক্যাল কারখানাটা খুলেছে, সেখানে তার মত কোনো কাজ আছে কিনা। তবে বুদ্ধর গ্রুপে পঞ্চু এদের সামনে এক নতুন আশার আলো।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্যাণে এরা কর্তাদের নানা কাজে লাগছে। অথবা তাদেরকে নানাবিধ কার্যে লাগানো হচ্ছে। কাজেই তাদের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে। এই সেদিন যে ছেলেটাকে হতচ্ছাড়া চেহারায় বন্ধুদের কাছে একটা বিড়ির জন্যে হ্যাংলামি করতে দেখা গিয়েছে, আজ তার পরনে ফুলকাটা শার্ট, গলায় রুমাল বাঁধা। হাতে বক্স ট্র্যানজিস্টার। লক্কা পায়রার মত যে চুলটা ছিল তাতে কায়দার ছাপ।

এখন অনেক ছেলেই পঞ্চায়েতের কল্যাণে মানুষ হয়ে যাচ্ছে। তবে ওই যা, এরা এখানেরই থাকবে। বড়দের খিদমতগারি করতে করতে ওপরে উঠবে। কাজেই শিক্ষিত বেকারদের থেকে ভবিষ্যৎ আছে এদের।

শহরের কাছ ঘেঁষা গ্রামগুলোর মোটামুটি অবস্থা এই। দূরে গভীরে নেহাত প্রাঙ্গণ ঘেরা চাষীবাসীর গ্রামে অবশ্য আলাদা চেহারা। আপাতত সেখানে তো যাচ্ছি না। এখানের এদের কথাই হচ্ছে।

ধরে নেওয়া যাক গ্রামটার নাম 'বাস্তুপুর'।

চামেলী বলে, গ্রামের নামের কী ছিরি । কত জায়গায় কত সুন্দর সুন্দর সব নাম, আর আমাদের কিনা বাস্তুপুর। মানে হয় না।

কিন্তু চামেলীই বলে। চামেলী ছাড়া আর কেউ গ্রামের নাম নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিদ্যুৎ বলে, এরপর যখন এই গ্রামছাড়া হয়ে অন্যত্র থাকতে হবে, তখন হয়তো তোর মনে হবে আহা আমাদের সেই গ্রামটার নামটা কী সুন্দর ! একবার যেতে ইচ্ছে করে।

চামেলী অক্লেশে বলে, গলায় দড়ি। একবার এই পচা গাঁয়ের গন্ডি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পেলে আর এমুখো হচ্ছি ! বিদ্যুৎ এতে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে না। কারণ যদিও, তারও মনোবাঞ্ছা এই পচা পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতায় বসবাসের। বাপ কাকার মত দেশের ভাত খেয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে জীবন কাটানোর কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না। তবু বাস্তুপুরের বাস্তুভিটেটাকে একেবারে জীবন থেকে মুছে ফেলার কথাও ভাবতে পারে না। বিদ্যুতের মা আছে বাবা আছে পিসি আছে, এবং কাকা কাকী 'আলাদা' হাঁড়ি হলেও একই বাড়িতে আছে। বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ নয়। মা কেনো সময় অসময়ে চায়ের আবদার শুনে যদি ছেলেকে বকে ওঠে কাকী ওদিকের রান্নাঘর থেকে ডাক দেয়, আমার এখানে চা হচ্ছেরে বিদ্যুৎ। খাস তো আয়।

এরা ছাড়া বিদ্যুতের একটা তিন বছরের বড় দিদিও আছে। তবে দিদির ওপর বিদ্যুতের বেশ একটু ঈর্ষাও আছে। মেয়ে হয়েও দিদি দিব্যি একখানা চাকরী বাগিয়ে ফেলেছে ! দিদির চাকরীতে বিদ্যুতের যথেষ্ট 'সুবিধে' তবু ওই কেমন একরকম গাত্রদাহ ভাবও আছে।

দিদি যখন অফিস থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে বসে জুৎ করে যা জলখাবার খেতে বসে আর মা বেণু বেণু করে তটস্থ হয়, অবচেতনেই যেন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বিদ্যুতের।

বেণু ওবেলার পোস্তর বড়া রাখা আছে তোর জন্যে, এখন চায়ের সঙ্গে খাবি ? বেণু টিফিনে যে পরোটা ছিল খুব শক্ত হয়ে যায়নি তো ? কখন যেন বলছিলি দাঁতে ব্যথা হয়েছে।

দিদি সেটা উড়িয়ে দেয়। আর ডাকে, বিদ্যুৎ আয়রে। চা ঢালা হচ্ছে।

মা দুম করে বলে ওঠে, ওর তো সমস্তদিনে বার দশেক হয়ে গেছে।

তা'হোক। আমার সঙ্গে খাক একটু।

তুই খা। আমার দরকার নেই।

আঃ আয়তো !

হয়তো সেই পোস্তর বড়ার আধখানা ভেঙে ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দেয়।

বাবা এখন চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে চায় না। বলে, একটু কিছু খেলেই রাতের খিদেটি ঘুচে যাবে।

তবু মা টুকটাক কিছু দেয়। হয়তো দু'খানা আলুমরিচ হয়তো বা একটু লুচি ভাজা।

বাবা তার থেকেও একটু নিয়ে বিদ্যুতের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

বাবা তো সারাদিন ছেলের চলন বলন দেখতে পায় না, বাবার মধ্যে মায়ের মত উত্তাপ

জমে ওঠে না। বরং বাবা যেন ছেলের একটা সুরাহা করে দিয়ে উঠতে পারছে না বলে লজ্জিত।

কাকাও তখন উঠানের ওধারের রোয়াকে বসে সেই একই কাজ করছে। অফিস থেকে ফিরে চা পান। তবে কাকার চায়ের সঙ্গে বিলক্ষন 'টা'।

কাকা জমিয়ে খেতে খেতে চেঁচিয়ে গল্প করে, বুঝলে দাদা, অবিনাশ বাবুকে বলে বলে হদ্দ হয়ে গেলাম, একখানা 'ফরম' এনে দিয়ে উঠতে পারল না। পরের কাজ এত কী মাথাব্যথা।

কাকাও না কি বিদ্যুতের জন্যে কিছু চেষ্টায় আছে।

বিদ্যুতের অন্তত এই সন্ধ্যার সময়টা, এই বাড়ি এই দালান রোয়াক সামনের উঠোনের কাঠচাঁপা গাছটা সব কিছু কেমন মনোরম লাগে। এই ছবিটাকে জীবন থেকে একেবারে মুছে ফেলার কথা ভাবতে পারে না বিদ্যুৎ।

কিন্তু চামেলীর কথা আলাদা।

চামেলী তার মা বাপকে দেখেনি। জ্যাঠাজ্যেঠির কাছেই মানুষ। তবে সেই মানুষ হওয়ার বিনিময়ে চামেলীকে অনেক কিছু দিয়ে বসতে হয়েছে।... ছোট থেকেই। আর বড় হয়ে তো কথাই নেই।

আস্ত একটা মেয়েকে পুষতে যা খরচা হয় সেটা জ্যেঠি পুষিয়ে নেবে না ? বড়লোক তো আর নয় ? অতএব কেবলমাত্র 'গোয়ালের কাজ' করতে বুড়ি গোপালের মাকে ছাড়া আর কোনো লোক রাখে না জ্যেঠিজ্যাঠা। ...উপরি পাওনা গঞ্জনা। তবু বুনো আগাছার মত বাড়ে চামেলী। এবং তার মধ্যে থেকেই 'প্রেমের' অঙ্কুর। সাহস আছে মেয়েটার তা বলতেই হবে।

জ্যেঠি যদি বলে ওঠে, ভর দুপুরে আবার এখন চললি কোথা ?

চামেলী অনায়াসে বলে, রেল লাইনে গলা দিতে।

যদি বলে, আকাশ ভেঙে মেঘ করেছে, তবু বেরোচ্ছিস ? আড্ডা দিতে তো ? আড্ডাবাজদের রাজা !

চামেলি বলে ওঠে, তবে থাকছি। বাইরের পাঁচিলের শুকনো ঘুঁটেগুলো তাহলে তুমি তুলে এনো বৃষ্টির আগে।

এই চামেলীর তাড়নাতেই বিদ্যুৎ প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর দিদির কাছে গুণগুণ করে, তোর কথাবার্তা শুনলে তো মনে হয় 'বস'-এর সঙ্গে বেশ আঁতাত করে নিয়েছিস। আর কিছুটা ইয়ে করে পটিয়ে পাটিয়ে আমার একটা কিছু করিয়ে দে না।

আঁতাত আবার কী রে অসভ্য ছেলে...

বেণু রেগে মেগে বলে, সারাক্ষণ যত সব উচ্ছন্ন যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কথার কী বাহার বেড়েছে ! বাজে বিচ্ছিরি।

প্রত্যেক বাড়ির লোকই অপর বাড়ির ছেলেদেরকে দোষ দিয়ে অভিমত প্রকাশ করে, 'ওই ওদের' জন্যে তাদের বাড়ির ছেলেটা বাজে হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ বলে, আরে বাবা আঁতাত নয়। তো একটু তোয়াজ টোয়াজ করেও তো—ও ইচ্ছে করলেই তোর ভাইকে একটা চাকরি দিতে পারে। ও দিদি। প্লীজ।

দিদি গলার স্বর নামিয়ে বলে, ওই ধিঙ্গী চামেলীটা বুঝি তোকে উৎপাত করছে ?

বাঃ। চামেলীর আবার কী ? চাকরির দরকার নেই আমার ?

'নেই' বলেছি ? তবে যে রকম উঠে পড়ে লেগেছিস সম্প্রতি ! ভাবছিস আমি তোর জন্যে চিন্তা করি না ? করি। করি। কিন্তু...

ওই কিন্তুটি সর্বত্র।

গৌতমের বাবা ছেলের জন্যে উঠে পড়ে লেগে আছেন। একে ওকে বলে চলেছেন। কিন্তু তাঁর ওপরওলা আবার বলেন, আর বছর দুই পরেই তো আপনার রিটায়ারমেন্ট। তখন বরং আমাদের এখানেই—

গৌতমের বাবা মনে মনে বলেন, ওই ছেলে আরো দু-বছর দাগা ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবে। অসহ্য !

গৌতমের মা যত স্নেহময়ী বাবা তেমন নয়।

বাবা ছেলের জন্যে চাকরির চেষ্টা করলেও, দু-কথা শোনাতে ছাড়েন না।

কী রে ? ওই যে কাগজটা 'কপি' করে রাখতে বলে গিয়েছিলাম ? হাতও তো দিসনি দেখছি। কী করিস সারাক্ষণ ?

মা তাড়াতাড়ি বলে, আর বোলো না। বন্ধুগুলো হয়েছে যত নষ্টের গোড়া। ঘরে বসে কাগজ ফাগজ তো নাড়ছিল, বন্ধুগুলো এসে কী ডাকাডাকি ! তিষ্ঠোতে দেয় না।

বাবা তেতো গলায় বলে, বন্ধুরা কোন উপকার লাগবে ? বন্ধু নিয়ে এত মাতামাতি ! দেখো ওরাই তোমার ইহকাল পরকালের বারোটা বাজিয়ে দেবে।

মা করুণ সুরে বলে, তা এতবড় দিনটা করবেই বা কী বল ?

বাবা রেগে বলে, আমি হলে উঠোন খুঁড়ে শাকপাতা লাগিয়ে গেরস্থর সুসার করতাম। দুটো চুনো পুঁটি মাছ ধরে এনেও সুবিধে করতাম।...

আহা তোমার যেন দশটা পুকুর আছে। ওই তো একটা খিড়কির ডোবা। তাতে—

ওই ডোবাটাতে সাফ করেও মাছ ছাড়া যায়।

তো তুমি যখন রিটায়ার করে বেকার হবে তাই কোরো। বাপ ছেলেকে, একসঙ্গে খেতে বসাবার জো নেই। কেবল উপদেশ।

তার মানে বহিরঙ্গে ওই সবকটা বেকার ছেলের অবস্থা ব্যবস্থা এক হলেও, বাড়ির মধ্যে অনেক তফাত।

তবে একটি জায়গায় এক।

গৌতমের স্বপ্নাও বলে, আর কতদিন এই স্বপ্নটাকে ঝুলিয়ে রাখবে গৌতমদা ? এদিকে বাবা আর পিসিতে রোজই মোক্ষম পরামর্শ।

ইচ্ছে করে ঝুলিয়ে রেখেছি বলে মনে হয় ?

তা জানি না। তবে বাবা যদি ছাঁদনাতলার ব্যবস্থা করে বসে, স্বপ্নার কপালে পুড়ে মরাই নিয়তি।

বাজে বাজে চিন্তা মাথায় খেলাসনি স্বপ্না।

বাজে কথা ? দেখো পরে।

আরে অত সোজা নয়। আজকালকার দিনে এত সহজে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলা যায় না। বাবার কথা শুনে মনে হল কিছু একটা হয়ে যাবে শিগগিরই।

চাকরি হলেই কিন্তু কলকাতায় বাসা নিতে হবে গৌতমদা। তা বলে রাখছি।

সে তো প্ল্যান হয়েই আছে। তবে সবটাই নির্ভর করছে মাইনের ওপর। বাসা করতে হলে—

সে তুমি ভেবো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে চলব। কত কমে সংসার করা যায় দেখিয়ে দেব।

স্বপ্নার মা জন্মরুগ্ন। স্বপ্নার অনেক কাজ। তবু স্বপ্না গৌতমের দেখা পেলেই রাগারাগি করে। বলে, শেষ পর্যন্ত আমার কপালে যা আছে তা জানছি।

অনুরাধার অবশ্য অবস্থা অনুকূল।

বিধবা মায়ের একা মেয়ে । মা মেয়ের ওই প্রেমপাত্রটিকেই ভরসা করে বসে আছে।

কাছাকাছি বাড়ি, ছেলেবেলা থেকেই আসা যাওয়া। অনুরাধাদের বিপদ আপদে সঞ্জয়রা দেখে। বলতে গেলে— দুটো পরিবারের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে। সঞ্জয় অনুরাধার। অথবা অনুরাধা সঞ্জয়ের। এখানে জাত গোত্র কুলশীল সহায়ক।

সঞ্জয় রোজই একবার করে এ বাড়িতে ঢুঁ দিয়ে যায়। কেউ কিছু মনে করে না। মানে সঞ্জয়ের মা বোন বৌদি। হয়তো বৌদি একটু মুখ টিপে হাসে হয়তো কোন দিন একটু মুখটা বাঁকায়। এছাড়া কিছু নয়।

সঞ্জয় বলে, স্টেশন বাজারের দিকে যাচ্ছি কাকিমা, কিছু লাগবে ? ডাক্তারখানায় যাবার দরকার আছে ?

আবার কোনোদিন না এলে অনুরাধার মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন,কাল আসোনি কেন বাবা ? শরীর ভাল আছে তো ?

বলে, এলে না—নিমকি ভেজেছিলাম। অনু বল্ল ভাল হয়েছে।

এখানে সঞ্জয়ের চা জলখাবার প্রায় নিত্যবরাদ্দ।

অন্যেরা বলে, তুই শালা আচ্ছা একখানা বাগিয়েছিস ! আমাদের যদি এমন এক একখানা হবু শ্বশুরবাড়ি থাকত রে। জামাই আদরটা জুটত। টোপরটা পরছিস কবে ? একটা থ্যাট হয়ে যেত।

সঞ্জয় বলে, এই ফ্যা ফ্যা কোম্পানির আবার টোপর ?

তোর হয়ে যাবে। দাদা রয়েছে রাইটার্সে, ভাল পোস্টে।

হচ্ছে কই ?

তবু অনুরাধা নিশ্চিত ব্যবস্থার ভঙ্গিতে বলে—মার যা শরীর ! একা ফেলে রেখে যাওয়া তো সম্ভব নয়। মাকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে।

যেন, টিকিট কাটাই রয়েছে।

এ কথা ভাবে না 'একা' ফেলে রেখে যাবার কথা উঠছে কেন ? সঞ্জয়ের দাদা বৌদি তো এখানেই রয়েছে।

আশ্চর্য, সঞ্জয়ও সে প্রশ্ন তোলে না। চাকরি হলেই গ্রাম ছাড়তে হবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ। আর অনুরাধার ইচ্ছেই শেষ কথা।

তবে দেবদত্ত নামের ছেলেটার ব্যাপার অবশ্য আলাদা। যে নিজেই এই 'বাস্তুপুর' ছেড়ে চলে যাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। এবং তার তেমন কোনো 'দাদা কাকার' ওপর প্রত্যাশাও নেই। এখান ওখানে দরখাস্ত ছেড়ে চলে কাগজের 'খবর' দেখে।

এই বাস্তুপুরে তার নাড়ির কোনো যোগ নেই। শৈশব থেকে দিদি জামাইবাবুর পোষ্য হিসেবে থাকতে হয়েছে, তাই আছে। তবে সেও কোন এক অলিখিত চুক্তিতে সেই শৈশবকাল থেকেই দিদির ভাগ্নী শুভ্রার 'মালিক'।

তবে দিদি জামাইবাবু সেটা তেমন অনুধাবন করে না। দুটোই তো মা বাপমরা, দুটোই এ সংসারে আশ্রিত।...তবে একটার ওপর বাড়ির গিন্নীর স্নেহদৃষ্টি একটু বেশি, অপরটার ওপর বাড়ির কর্তার।

যার যার জোড়া ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রা যেমনই হোক, এক জায়গায় এক। তারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে আর দিন গুনছে। তবে ছেলেগুলোর যেন ঠিক স্বপ্ন নয়, অপেক্ষা।

কাজেই তারা যথা নিয়মে হ্যা হ্যা করে আড্ডা দেয় বাড়ি গিয়ে চোটপাট করে। বাদে দেবু। অর্থাৎ দেবদত্ত।

অবশ্য একেবারে করে না তাও বলা যায় না। চোটপাট করে দিদির ভাগ্নীর ওপর।

এই, তুই এখনো না খেয়ে বসে আছিস যে ? কতদিন বারণ করেছি ?

আমার খিদে পায়নি।

না পায়নি। ইয়ার্কি। কেন, দিদি তো খেয়ে নিয়েছে।

মামীর অম্বলের অসুখ। বেলায় খেলে ব্যথা ধরে।

তোরও অম্বলের অসুখ হোক। নে তোর ভাতও নে একসঙ্গে।

নেওয়া হচ্ছে। তুমি আগে বোসো তো ! তো এতক্ষণ কিসের আড্ডা ?

সে তুই বুঝবি না।

কী করে আর বুঝব ছাই ? কোনোদিন কী আমাদেরকে দলে নাও ?

বাড়ির লোক নিতে দেবে যে।...হুঁঃ।

আবার মন ভাল থাকায় খেতে বসে বলল, হাজার পাঁচেক টাকা থাকলে, এক্ষুণি একটা 'দি গ্র্যান্ড' চাকরি হয়ে যেত !

কত টাকা ?

পাঁচ হাজার। চাকরির আগে ডিপোজিট হিসেবে জমা দিতে হবে।

শুভ্রা বলে উঠল, টাকাগুলো নিয়ে নেবে ?

দূর। নিয়ে নেবে কেন ? বললাম তো ডিপোজিট হিসেবে রেখে দেবে। ক্যাশে থাকতে হবে—দূর বলে আর কী হবে। আকাশ কুসুম ! গরিবের কিস্যু হয় না রে।

দেবুদা !

কী ?

খুব ভাল চাকরি ?

রীতিমত। ভবিষ্যৎটা বাঁধানো হয়ে যেত।

কলকাতায় ?

তবে আবার কী ?

তোমায় কে খবর দিল ?

ও সে অনেক কথা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম, তারপর জানতে পারলাম আমাদের কালনা কলেজের এক প্রফেসরের ছেলে ওই চাকরির হর্তা কর্তা। প্রফেসর আমায় খুব ভালবাসেন। চুপিচাপি একটা চিঠি ছেড়েছিলাম। তো স্যার খুব উৎসাহ করে উত্তরও দিয়েছেন একটা। বলেছেন 'ইন্টারভ্যুটা ওঁর ছেলের হাতে। আর ছেলে খুব পিতৃভক্ত। বাবা অনুরোধ করলে— ধ্যাৎ এত সব বলে কী লাভ ? হবে না তো আর। উঃ। আমার না মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে করছে। সুযোগ বারবার আসে না।

হেই দেবুদা। মামীকে একবার বলে দেখো না ?

পাগলের মতন কথা বলিসনি শুভ্রা। থাপ্পড় খাবি। তোর মামী আমায় দেবে পাঁচ হাজার টাকা। পাবে কোথায় ?

আহা মামী কী আর ? মামা—

তা আর নয়। এই শালাবাবুটিকে সারা জীবন পুষলেন, লেখাপড়া শেখালেন, এখনো বুড়ো দামড়াকে পুষে চলেছেন, এর ওপর আবার — এ কথা শুনলে এবার ঘাড়ধাক্কা।

তা সেই নিঃসন্তান জামাইবাবুটি যে এ যাবৎ শালাবাবুটিকে লালন পোষণ করেছেন এবং 'মানুষ' করার তাল করেছেন, সেটা কী নিছক মানবিকতা না পত্নীপ্রীতি। অথবা ভীতি ? মনের মধ্যে কি একটি পরিকল্পনা কাজ করেনি ? যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা— ভাগ্নীটার দায় তো তাঁরই।

তাই বলে মরণ গো এই ?

দেবুদা। হেই দেবুদা। তুমি নিজেই মাইনে পেয়ে আস্তে আস্তে শোধ দেবে !

বাজে কথা রাখ। সেই আশায় অমনি জামাইবাবু— নাঃ শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করা ছাড়া আর উপায় নেই। এদিকে—চাকরি পাবার বয়েস চলে যাচ্ছে। থাক থাক আর ভাত চাপাতে আসতে হবে না।

দেবুদা ! তুমি নিজেই কোনোখান থেকে ধারটার করে—

গাঁট্টা খাবি শুভ্রা। আমায় কেউ পাঁচটা টাকা ধার দেবে ? কী দেখে দেবে ? আমায় বেচলে পাঁচটা পয়সাও হবে না।

শুভ্রা হঠাৎ একটু হেসে ফেলে বলে, তবে না হয় আমাকেই বেচে দাও।

ওঃ। বড্ড কথা শিখেছিস। তোরই বা কী এত বাজার দর রে ? কানা কড়াও নয়। অন্য কোথাও গছাতে গেলে তো জামাইবাবুকে ভিটেমাটি চাটি করে পণ দিতে হত..

শুভ্রা হি হি করে হেসে উঠে বলে, আর তাদের সেটি পছন্দ না হলে মামার ভাগ্নীকে পুড়িয়ে মারত। তো সেটাই বুঝিয়ে বল না মামাকে দেবুদা। বিনি পয়সায় যখন—

মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না শুভ্রা। বুঝিয়ে বলব। জামাইবাবুকে ? যবে থেকে জামাইবাবু রিটায়ার করে এসে ইটভাঁটা খুলেছে আর সরকারি ঠিকেদারি ধরেছে, জামাইবাবু কি আর মানুষ আছে ?... এখন এমন কথা বলতে গেলে শালাবাবুকে সোজা গলাধাক্কা ! উঃ। স্বর্গের টিকিটটা হাতে এসেও এল না। এর থেকে যদি স্যারের চিঠিটা না আসত !

দেবুদা। পৃথিবীতে এত টাকা আর সামান্য পাঁচ হাজার টাকার জন্যে তোমার—

ওঃ। সামান্য পাঁচ হাজার। হঠাৎ বেগম বনে গেলি না কী ! ধ্যেৎ। কিস্যু ভাল লাগছে না।

ওমা ও কী ! উঠে পড়লে যে ? ও দেবুদা ডালনাটায় যে হাত দিলে না। হেই দেবুদা—

নাঃ। আর ভাল লাগছে না। মন মেজাজ একদম খচে গেছে।

চলে গেল চটিটা পায়ে গলিয়ে।

কোথায় গেল ? কোথায় আর ? সেই আড্ডায়। সেখানে আজ বিদ্যুৎ অনুপস্থিত।

শালা বিদ্যুতের ব্যাপারটা সন্দেহজনক ঠেকছে রে গৌতম। সঞ্জয় বলে, বোধহয় একটা চাকরি ফাকরি জুটিয়েছে। সকালে সেজেগুজে ওর দিদির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে গিয়ে উঠল। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছিসরে ?... বলল, এই একটু কলকাতার বাজারটা ঘুরে আসি। তো বাজার ঘুরে আসতে অত সাজুগুজু কেন বাবা ?

শুনে মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল দেবুর। মনে হলো যেন বিদ্যুৎ ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার হাতে এসে যাওয়া স্বর্গের টিকিটটা হাতে এল না। আর বিদ্যুৎ তেমন একখানা টিকিট হাতে পেয়ে সেজেগুজে ট্রেনে চড়ে বসল।

কিন্তু মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে বলে এমন একটা কান্ড করে বসবে দেবুর মত ছেলেটা ?

ফিরতে ইচ্ছা না হলেও ফিরতে হলই সেই দিদি জামাইবাবুর বাড়ি। হলো হলো। নীরবে

খাদ্যবস্তু গলা দিয়ে নামা। তা নয় ওদের সংসারের ওপর খবরদারি করতে যাওয়া ! মানে হয় ?

চা দিতে এল দিদি।

দেবু ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি চা করছো যে ? শুভ্রা কোথায় ?

দিদি একটা ঢোক গিলে বলল, ও একটু বেরিয়েছে।

কোথায় গেছে ?

ইয়ে একটু সিনেমা গেছে।

সিনেমা গেছে। সেই 'পূর্ণশ্রীতে ?'

তাই বোধহয় আবার কী।

অত চেপে চেপে ছাড়ছ কেন ? কার সঙ্গে গেছে ?

দিদি বলল, ওই তো পঞ্চু আর বুড়ো আর একটা কে যেন এসে বলল, খুব নাকি ভাল ছবি হচ্ছে—

পঞ্চু বুড়ো। আর একটা কে যেন। নির্ঘাৎ দাঁতনা বিশু। মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল দেবুর।

ওই হতচ্ছাড়া দুটোর সঙ্গে এই ইভনিং শোতে— হঠাৎ কী হল বল তো তোমার ?

দিদি বলল, আমি কী বলব ? তোর জামাইবাবুও তো তখন বাড়ি ছিল।... পঞ্চুর জ্যাঠা গোবর্দ্ধন সাহা তো এবার পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে। তোর জামাইবাবু তাই এখন তার ভাইপোকে খুব মান্য দিচ্ছে।

মান্য দিচ্ছে। মান্য দিতে ইচ্ছে হয় নিজে দুবেলা কুর্ণিশ করুকগে না। ঘরের মেয়েটাকে ঘুষ দিয়ে—যাচ্ছি আমি।

পেয়ালাটা ঠুকে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ল অগ্নিমূর্তি হয়ে।

দিদি পিছু পিছু হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে।..ও দেবু কোথায় আবার যাবি ? ওরা তো হলেই গেছে দুখানা সাইকেল রিকশ করে।

আমিও তাই যাবো।

গিয়ে কী করবি।

কী করি জানতেই পারবে !

হ্যাঁ জানতেই পারল।

শুধু দিদি নয়, অনেকেই।

সিনেমা হল-এ গিয়ে দেবু বাইরে থেকে খবর পাঠিয়েছে শুভ্রা সরকার ! আপনাকে বাড়ি থেকে ডাকতে পাঠিয়েছে। চলে আসুন।

বাড়ি থেকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে।

কী হয়েছে বাড়িতে ?

তা কিছু বলে নাই। বলল এক্ষুণি বাড়ি চলে যেতে হবে। সাইকেল রেশকো সঙ্গেই এনেছে।

বেরিয়ে এল শুভ্রা।

সঙ্গে পণ্টুও।

পণ্টুই এগিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার দেবুদা ?

দেবু তার কথায় উত্তর না দিয়ে কঠোর স্বরে বলল, শুভ্রা উঠে আয়।

তার মানে বাড়িতে কোনো আকস্মিক বিপদ টিপদ নয়।

পণ্টু তবুও বলল, বাঃ। কী হয়েছে বলবেন তো ?

দেবু হঠাৎ শুভ্রার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে বলে, বলছি না উঠে আয়।

কিন্তু এহেন পাবলিক জায়গায় এহেন ঘটনা !

ভালমতই সোরাগোল পড়ে যায়। কী হয়েছে ? কী হয়েছে।

মারলে যে ?... অপমানে মুখ লাল টকটকে।

বেশ করেছি। উঠে আয় বলছি না ?

শুভ্রা ঘাড় উঁচিয়ে বলে, না যাব না !

যাবি না ?

কেন যাব ? আমি তোমার কেনা নাকি ? মামা আমায় আসতে দিয়েছে। আর উনি এলেন গার্জেনগিরি করতে ! আয় পণ্টু। ছবিটা দেখতে দেখতে—ইস। আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে সিনেমা দেখতে আসব। তোমার কী ?...পণ্টু আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

ঢুকে যায় ভিতরে। পণ্টুর ঘাড়ে হাত দিয়ে।

এখন দেবু কী করবে ?

রেললাইনে গলা দিতে যাবে ? না ঘুষি মেরে জামাইবাবুর হোঁৎকা নাকটা ফাটিয়ে দিয়ে তার বাড়ি থেকে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে এসে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাবে ?

কিন্তু ডিসিশান নেবার আগেই ধরে ফেলল গৌতম।

তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এদিকে তো চামেলী গায়ে কেরোসিন ঢেলে—

অ্যাঁ। চামেলীর মত দুর্দান্ত মেয়ে।

সেই তো ! যত শিগগির। জানি না এতক্ষণ কি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ কোথায় ?

আর সে কী আর এখানে আছে ? তার বেইমানিতেই তো— শালা চুপিচুপি চাকরি বাগিয়ে— পরে সব শুনিস। এখন ওরা অপেক্ষা করছে।

কিন্তু বিদ্যুতের চাকরির খবর তো চামেলীর কানে মধু বর্ষানো। খুশী হবার কথা। ফট করে গায়ে কেরোসিন ঢালবার হেতু...

হেতু আর কী ? বেইমান। শালা বিদ্যুৎ ওর দিদির বস-এর একটা আধখোঁড়া ভাইঝির

গলায় মালা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাকরি বাগিয়েছে।

দিদিটাই বা কী ? একমাত্র ছোট ভাইটা—

তা কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কতদিন আর নিজেকে টাঙিয়ে রাখবে ? এদিকে বসও তাগাদা মারছিল। অথচ দিদি মাকে কথা দিয়ে রেখেছিলেন, বিদ্যুতের একটা হিল্লে না হলে মা বাপকে ভাসিয়ে যাবে না। বাবার তো রিটায়ারের সময় হয়ে এসেছে।

খবরটা সর্বাগ্রে এই বেকার বাউন্ডুলেদের আড্ডাতেই এসে পৌঁছল। উপায় কী ? এই ভিন্ন গতি কী ?

যতই এদের 'কোনো কর্মের নয়' বলে ধিক্কার দাও, এইসব কর্মের সময় এরাই ভরসা। কেউ মরলে শ্মশানে নিয়ে যেতে, রোগে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যেতে এরা যত পটু তেমন পটুত্বই বা কার আছে ?

তা ভগবানের দয়া শ্মশানে নিয়ে যেতে হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যেতেই কাজ মিটেছে। বেঁচে যাবে। তবে আধপোড়া হয়ে চিরকাল এই বাস্তুপুরেই পড়ে থাকতে হবে এই যা।...

থানা পুলিস ?

না সেসব কিছু হয়নি। চামেলী নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে জ্বলন্ত জনতা স্টোভে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে হঠাৎ জ্বলে গিয়ে।

জ্বলন্ত জনতায় তেল ঢালতে গেলে কেন ?

মতিচ্ছন্ন। ভাবলাম কিছু হবে না।

শুনে জ্যেঠি কৃতজ্ঞ। ভাগ্যিস বলে বসেনি, জ্যেঠির বাক্যযন্ত্রণায়—

সেটা বলতেও পারত !

জ্যেঠিই তো হাতমুখ নেড়ে বড় গলায় খবরটা দিয়েছিল। এইবার তেজ ভাঙল তো ? খুব যে অহঙ্কারে মটমট করতিস মুখুজ্যে বাড়ির বিদ্যুৎ তোর গলায় মালা দেবে বলে মালা হাতে নিয়ে বসে আছে। ধরাকে সরা দেখতিস। দর্পচূর্ণ হল তো ? এই তো—ড্যাংড্যাং করে দিদির সঙ্গে অফিসে গেল। দিদির ওপরওলার ভাইঝিকে বিয়ে করলে চাকরি পাবে। এই লেখাপড়া করে দিয়েছে।... বিদ্যুতের খুড়িই বলল চুপি চুপি। তো চুপি চুপি আর কতক্ষণ ? পাঁচ কান হবে না ?

বলে এসে ভাবেনি তক্ষুনি দেওরঝির বন্ধ ঘর থেকে কাপড় পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়া আসবে !

তো ভাগ্যিস পেয়েছিল।

আর ভাগ্যিস পরিত্রাহী চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করেছিল। তাই না থানা পুলিসের হাত থেকে রেহাই পেল।... অবিশ্যি মেয়েটাও নিজের অপমান ভাবতেই বলেছে, দৈবাৎ পুড়ে গেছে।

এরা যখন হাসপাতাল থেকে ফিরল, তখনো বিদ্যুৎ ফেরেনি। আজই নাকি তাদের পাকা দেখা পর্ব। বাবা দিদি বিদ্যুৎ বস-এর বাড়ি খাওয়াদাওয়া করে ফেরার কথা।

তা ফিরে এসে বিদ্যুৎও হয়ত চামেলীর ওপর কৃতজ্ঞ হবে মরে না গিয়ে বেঁচে থাকায়।

অবশ্য এই বাউন্ডুলেরা বলল, এর থেকে মরাই ভাল ছিল। এ বাঁচার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু বাঁচা মরাটা কী সব সময় মানে মেনে চলে ? কী থেকে যে কখন কী হয় ! আর মানুষ কোন মহামুহূর্তে যে কী ভয়ানক একটা ডিসিশান নিয়ে বসে পরে সারাজীবন বেঁচে মরে থাকে !

শুভ্রা নামের মেয়েটাও কি তেমন একটা ভুল করে বসেনি ? হয়ত আর একটু ভাবলে চিন্তোলে তার জীবনের মোড়টাই এমন ঘুরে যেত না। কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত। তার নিজের জীবনের স্বর্গ খুইয়ে গেল অন্যের জন্যে স্বর্গের টিকিট কিনতে।

চামেলীর ব্যাপারে—

গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেটে গেছে কে জানে।...শেষরাত্রে প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে ফিরে এসে শুয়ে পড়তে হয়েছে সেই জামাইবাবুর বাড়িতেই।

কোথা দিয়ে সকালটা কেটে গেছে কে জানে ! রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। সারা গা ঘামে ভিজে।

হঠাৎ মনে হল কে যেন পাখার বাতাস করছে।

চোখ খুলেই চোখটা কুঁচকোলো। স্মৃতির পর্দাটা সরাতে চেষ্টা করল।

তারপর বলল, তুই এখানে কী করছিস ?

কিছু করিনি। শুধু বলতে এসেছি, কে কখন দেখে ফেলবে, এইটা নিয়ে রাখো।

কী এটা ?

কিছু না। পরে খুলো।

আমি এক্ষুণি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

তা জানি। এরপর আর থাকা মানায়ও না। শুধু যাবার আগে এটা নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ব্যাগে পুরে ফেলো দেবুদা।

দেবু কঠোর স্বরে বলে, কী আছে এতে ?

বললাম তো পরে দেখো।

দেবু একটানে শুভ্রার বাড়িয়ে ধরা হাতের কাগজ মোড়া বান্ডিলটায় টান মারে। তারপর বলে ওঠে, এর মানে ?

মানে পরে ভেবো দেবুদা। মামা বাড়ি আছে। কালকের সিনেমা হল-এর ব্যাপার নিয়ে কিছু বলবার জন্যে মুখিয়ে আছে। শুধু কাল আর এক ঝঞ্ঝাটে পড়ায়—বেশ করেছে চামেলীদি। মেয়ে মানুষের মরাই ভাল ! কিন্তু দোহাই তোমার দেবুদা—মামা কিছু বলতে এলে নাকের ওপর দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে,'এই আপনার বাড়ি ছাড়লাম।' বলে।

ও। তাহলে তোর খুব সুবিধে হয় কেমন ? তোর সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না করছে। যা চলে যা।

যাচ্ছি। যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে তুমি এটা—পাঁচ হাজার আছে। এখনো তো তোমার জমা দেওয়ার সময় পার হয়ে যায়নি। আজ চলে গেলে—

দেবু আরো কঠিনভাবে বলে, কার টাকা ?

অন্য আর কার টাকা তোমায় দিতে আসব। ধরে নাও আমারই ! তবে মামা টের পেলে—

তোর টাকা ? এই কথা বিশ্বাস করতে হবে ?

অবিশ্বাসের কিছু নেই দেবুদা ! তুমি বলেছিলে—আমার বাজার দর কানাকড়াও নয়। তবু তো বেচে হাজার পাঁচেক হল।

এরপরে হয়ত মামা আরো—বুঝাল পণ্টুর জ্যাঠার এখন অনেক টাকা। দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে তুলতে—খরচা করতে রাজি।

পণ্টুর জ্যাঠা ! তার সঙ্গে তোর ! বলছিস কী ? আর এই টাকা আমায় নিতে বলছিস ? বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, উঠে দাঁড়ায় দেবু।

শুভ্রা বলে, যাবে তো নিশ্চয়। এটা না নিয়ে যাওয়া চলবে না। তোমার ওই স্বর্গের টিকিটটার জন্যে যে একখানা নরকের টিকিট কিনে বসা হয়েছে সেটা বৃথা যাবে না কী ?

কেউ কাউকে নরকের টিকিট কিনতে বলেনি। যেতে দে আমায়।

দেব। এটা না নিয়ে নয়।

বলতে লজ্জা করছে না তোর ? আশ্চর্য !

লজ্জার বালাই থাকলে কী আর তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম ? দেখি তো এটা না নিয়ে কেমন যাও। একা তোমার চামেলীর স্টকে কেরোসিন ছিল তা মনে কোরো না।

কিন্তু শুভ্রা নামের মেয়েটাকে কী তার স্টকে হাত দিতে হয়েছিল ?...

নাঃ। হয়নি। শেষ পর্যন্ত তো দেবু জামাইবাবুর নাকের সামনে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাবার আগে টাকাটা ব্যাগে ভরে নিয়েছিল।

যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু হঠাৎ তোর মামার ভাগ্নীকে বেচে দেবার মতলব হল কেন ? এটাই ধাঁধা।

হঠাৎ কী গো দেবুদা ? মতলব তো অনেক দিনের। যবে থেকে পণ্টুর জ্যাঠা কণে খুঁজতে লেগেছে। আমিই মামাকে দড়ি আর কেরোসিন দেখিয়ে দেখিয়ে কব্জায় রেখে এসেছি।

দেবু হতাশ ভাবে বলে, তবে এখন এবং কেন ?

ওই তো। বড়লোকের গিন্নী হবার সাধ হল। তাই—

শুভ্রা !

বল।

তোকে বাদ দিয়ে 'জীবন' ? মানে আছে কিছু ?

পালাও দেবুদা চটপট। ও সব পাঁচালীর পাতা খুলে বসলে—ওই বোধহয় মামা আসছে।..

বলে মুখ ফিরিয়ে বোঁ করে ছুটে চলে গেল।

কেনা হয় কে তার হিসেব রাখে ?

শুভ্রার মামারও তো স্বর্ণযুগের টিকিটটি কেনা হয়ে গেছে।..ইঁট ভাঁটার বাড়বাড়ন্ত... ঠিকেদারির জয়জয়কার। পঞ্চায়েত প্রধানের শ্বশুর ! সোজা খাতির ? সোজা সুখ ?

বাস্তুপুর প্রায় তেমনিই চলে।

বাস্তুপুরের এই এক টুকরো কাহিনীতে নতুন কিছুই নেই। এইভাবেই একটা আড্ডার দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেও আর একটা দল ঠিক এসে জুটে যায়।

শুভ্রা নামের মুখ্যু মেয়েটা ঠিকই বলেছিল কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

বিদ্যুৎ তার আধখোঁড়া বৌ নিয়ে দিব্যি সংসার করছে, চামেলী তার আধপোড়া শরীরটা নিয়ে দিব্যিই খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে গল্পের বই পড়ছে। জ্যেঠির কিছু কিছু সাহায্যেও লাগছে।

দেবু ?

ভাল চাকরি ভাল কোয়ার্টার্স।

মোটামুটি সুন্দরী, একটু বিদুষীও, স্ত্রী নিয়ে নিমগ্ন।

বাস্তুপুর নামের একটা জায়গা তার জীবনে ছিল সেটা চেষ্টা করে ভুলতে হয়নি তাকে।.. মনে পড়তে যাবেই বা কেন ? দিদি জামাইবাবুর সংসারে 'আশ্রিত' মূর্তিতে পড়ে থাকার মূর্তিটা কী সযত্নে মনে রেখে দেবার ?

আচ্ছা, স্বপ্না ? যে নাকি রাতদিন বলত, 'যা দেখছি সুইসাইডই আমার নিয়তি।'

সে যদিও শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বিস্তর কেঁদেছিল, তবে বড় খাসা বিয়েটা হওয়ায় আর তাদের বাড়িটা কলকাতার এক খাসা জায়গায়, চোখের জলটা শুকোতে দেরি হয়নি। কী করবে ? তার প্রেমপাত্রের যদি সাতজন্মেও একটা চাকরি না জোটে তার বাবা মেয়ের জন্যে পাত্তর খুঁজবে না ?

তবে সঞ্জয়ের আর বাস্তুপুর ছাড়া হয়ে ওঠেনি। চাকরি তার হয়েছে। সেও মাসে মাসে তার দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনের মান্থলী টিকিটখানা কিনে ফেলে। আর ভোর সকালে ছুট দেয়।... কী করবে ?

আর অনুরাধা রাজি হয়নি মাকে একা ফেলে রেখে যেতে।....তার রুটিনটা হচ্ছে—দিনের বেলাটা বাপের বাড়িতে রাতের বেলাটা শ্বশুরবাড়িতে।

আসলে কেউ নিজের তার জীবনের প্রারম্ভে জানতে পারে না জীবনটা কোনভাবে আর কার হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে।...ওরই মধ্যে কেউ স্বর্গের টিকিটের জন্যে হাহুতাশ করে, আর কেউ বা সেটা পেয়েছি ভেবে আত্মতৃপ্তির সাগরে ভাসে।

❑

শেকল তুলে দিয়ে

খবর শুনেছিস ?

লাল্টু তাদের 'তরুণ সংঘের' ক্লাবঘরে ঢুকে এসেই সামনের ফাটাচটা বেঞ্চটায় বসে পড়ে বলে উঠল, শচীন মাষ্টারের মেয়েটা ভেগেছে !

রঞ্জিত অমিতাভ বাদল আর সাগর একসঙ্গে বলে উঠল, ভাগ !

ঠিক আছে ! ভাগছি !

লাল্টু উঠে দাঁড়াল !

আসলে নাম লালমোহন, কিন্তু ওর এই এক কথায় মান অভিমানের বহর দেখে দেখে বন্ধুরা নামকরণ করেছে লাল্টু । এছাড়া আরো দু'একটি নাম আছে তার যেমন হচ্ছে—'নিউজ মাষ্টার' । 'বিশিষ্ট সাংবাদিক' 'নিজস্ব সংবাদদাতা' ইত্যাদি ।

যত সব দুর্লভ গোপন অথবা সদ্য টাটকা খবর সে যে কী করে তাড়াতাড়ি সাপ্লাই করে ! কোন রহস্যে তার কাছেই সে সব খবর আগে এসে পৌঁছয় কে জানে ! লাল্টুর কাছেই আর সকলকে শুনতে হয় ।

এরা লাল্টুর সার্টের পিঠটা খামচে ধরে টেনে বসাল । বলল, থাক আর গোসায় কাজ নেই । কিন্তু খবরটা যে সাংঘাতিক অবিশ্বাস্য রে !

লাল্টু দার্শনিকের গলায় বলল, জগতে 'অবিশ্বাস্য' বলে কিছু নেই । বরং অবিশ্বাস্য ঘটনাই বেশী ঘটে !

লাল্টু আবার একটু দার্শনিকের হাসি হাসল ।

তোকে কে বলল ?

আমাকে ? আমাকে কারুর বলে যাবার দরকার হয় না । বলে যায় বাতাস ! বলে যায় আকাশ । বলে যায় আমার সেন্স ।

সে তো দেখিই । কিন্তু ইস ।

ভাবতে পারছিনা রে । সেই চন্দনা ? অগ্নিশিখা ? রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে দু একটা কথা কইতে গেলে যে চোখে তাকাতো একাল বলেই ভস্ম হয়ে যাইনি । সেই মেয়ে ভেগে গেল ?

গেল ।

কার সঙ্গে ভাগল রে ?

হবে কোনো এলেমদারের সঙ্গে ।

কিন্তু আমাদের এই বাদকুল্লায় কে কোথায় ছিল সে রকম ? থাকলে তো সেও নিখোঁজ হতো।

সবাই প্রায় সমস্বরেই একই ধরণের প্রশ্ন করে উঠছে।

লাল্টু বলল—বাদকুল্লার ও মেয়ে বাদকুল্লার ছেলেদের পুঁছতো না কী ?

ওঃ। তার মানে বাইরের মস্তান।

অমিতাভ একটু অলঙ্কার দিয়ে কথা বলতে ভালো বাসে। সে আক্ষেপের সুরে একটু গভীরতা মিশিয়ে বলল, আহা ! বেচারী শচীন মাষ্টার। অমন সৎ সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী মানুষটা ! তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মেয়ে কিনা...

আরে মেয়েদের কথা বাদ দে। তারা হচ্ছে পতঙ্গের জাত। আগুন দেখলেই আলো ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জ্ঞানগম্যি থাকে না।

প্রসঙ্গ এখন শচীন মাষ্টারের দিকে মোড় নিয়ে বসল।

যাই বলিস ! পারল কী করে ? মা মরে গিয়ে পর্যন্ত ওই চন্দনাটিই তো রান্নাবান্না করে বাপকে খাওয়াতো !

সত্যি ! শচীন মাষ্টার মশাইয়ের অবস্থা ভেবে কী খারাপ যে লাগছে। লাল্টু তুই ঠিক শুনেছিস ? মানে খবরটা ভুল ভাল নয় তো ?

লাল্টু কখনো নিশ্চিত না জেনে কোনো ভুল খবর পরিবেশন করে না।

ওঃ, কী চালে হাঁটা চলা করতো, যেন জগতের আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু মাষ্টার মশাইকে খুব সেবাযত্ন করতো।

কী করতো আর না করতো, সেটা আমরা আর কতটা কী জেনেছি ?

আশ্চর্য ! সেই চন্দনা।

আচ্ছা ! বাইরের ছেলেকে পেল কোথা থেকে ? একদিনের জন্যেও তো কই কোনো বহিরাগতকে ধারে কাছে দেখা যায় নি।

আমরা রাতদিন শচীন মাষ্টারের বাড়ি পাহারা দিয়েছি বুঝি ?

আরে বাবা ! এসব ক্ষেত্রে কে যে কাকে কী ভাবে পায় তা জানা স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য !

ইস ! আমাদের বাদকুল্লার সব থেকে সুন্দরী মেয়েটাকে একটা বহিরাগত লুঠ করে নিয়ে গেল ?

প্রসঙ্গটা আর ফুরোতে চাইছে না।

আক্ষেপ হতাশা বিস্ময় শচীন মাষ্টারের জন্য করুণ প্রসঙ্গটাকে এরা যেন জীইয়েই রাখে। যেমন জ্বলন্ত আগুনে মাঝে মাঝে কাঠ ঠেলে জীইয়ে রাখা হয়।

কবে সটকেছে রে ?

দু'তিনদিন হবে।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে এই আক্ষেপ মিটিঙে প্রস্তাব পাশ হয়, ক্লাবের সকলের একবার শচীন মাষ্টারের বাড়ি গিয়ে তাঁর বিপদে সহানুভূতি জানিয়ে আসা উচিত। বলতে গেলে শোকে সান্ত্বনার মত।

তো এও একরকম শোক বইকি। একমাত্র সন্তান হাতছাড়া হয়ে গেল তো ? হাতছাড়া চোখছাড়া ঘরছাড়া।

শচীন মাষ্টারের কাছে এরা সকলেই পড়েছে স্কুলে।

অতএব এটা এদের মানবিক কর্তব্য। মানে একদার গুরুর এই গুরুতর বেদনার ভার লাঘব করে দিয়ে আসা।

কিন্তু গিয়ে প্রথমে কী বলা হবে ?

সেই তো সমস্যা।

মাষ্টার মশাইয়ের বাড়িতে তো আর দ্বিতীয় কেউ নেই যে তার কাছেই মাষ্টার মশাইয়ের 'অবস্থা' বোঝা যাবে।

এই বচন তোর তো বেশ সাহস আছে। বল না কী ভাবে কথাটা পাড়া যায় ?

কী আবার। গিয়ে একটু বসেই বলা হবে, মাষ্টার মশাই আপনার মেয়েকে দেখছি না যে।

রাবিশ। কোনো কালে যাওয়ার ব্যাপার নেই। গেলেও মেয়ের খোঁজ করার প্রশ্ন থাকে না। হঠাৎ—

আচ্ছা—ধর যদি—ইয়ে—

লাণ্টু বিজয়ী গলায় বলে, অত পাঁয়তাড়া করার কী আছে ? চল আমি গাইড্ করে নিয়ে যাচ্ছি। গিয়েই সোজা বলে উঠব, মাষ্টার মশাই হঠাৎ খুব খারাপ একটা খবর পেলাম। তাই—

ঠিক আছে। তোর ব্যাপার তুইই ভাল বুঝবি। তবে যদি জিগ্যেস করে কোথা থেকে শুনলে ? তখন বলতে পারবি বাতাস থেকে আকাশ থেকে !

দেখা যাক কী পারা যায়।

হ্যাঁ, পরদিন ভরদুপুরে মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ গোটা পাঁচ ছয় তরুণ ছেলে শচীন মাষ্টারের বাড়ির দরজায় এসে হানা দিল।

বাড়ি নিঃসাড় নিঝুম।

এখন স্কুলে গরমের ছুটি চলছে।

ভগবানে বিশ্বাসী শচীন মাষ্টার মনে ভেবেছেন এ সময় ছুটি চলছে এটা ভগবানের দয়া।

সকালবেলা বিছানা উল্টে রাখা চৌকীটায় শুধু কাঠের ওপর পড়ে থেকে এই ভরদুপুর পর্যন্ত শচীন মাষ্টার বোধহয় ভগবানের দয়ার কথাই চিন্তা করছিলেন।

এক তলার ঘর। বাইরের দিকের জানলাগুলো সব বন্ধ। তবু গ্রামের পুরনো বাড়ি কাঠের পাল্লার মাঝখানে মাঝখানে ফাঁকা ফাটল সেই ফাটল থেকেই ঘর ক্রমশঃ বেশী আলোকিত

আর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে এখন ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

শরীরের মধ্যেও ক্রমশঃ ঝাঁ ঝাঁ ভাব।

সকালে তো স্নান করেছেন। তবে ?

স্নানের পরবর্তী কর্তব্যের কিছু হয়নি বলে ? ভেবেছিলেন চাটা করে নেবেন। গতকাল তো নিয়েছিলেন। আজ যে কী হল একদম উঠতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে না নিজের জন্যে কিছু করে নিতে।

তবু এক সময় আস্তে উঠলেন।

পেটের মধ্যে, না বুকের মধ্যে নাকি সমস্ত শরীরের মধ্যেই মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে।

চৌকী থেকে নেমে পড়ে দালানে বেরিয়ে এলেন মাষ্টার। ঠিক পাশের ঘরটায় দরজায় শেকল তোলা।

কবে কখন কে এই শেকলটা তুলে দিয়েছিল ?

না শচীন মাষ্টার জানেন না। ওটা খুলে দেখেন নি। ভিতরের দৃশ্যটা কী হতে পারে ভাববারও চেষ্টা করেননি।

ওই ঘরটার পাশেই আর একটা ছোট ঘর। সাবেক কালের ভাঁড়ার ঘর। মাষ্টার গিন্নী গত হওয়া পর্যন্ত ওটাতে রান্না-ভাঁড়ার দু কাজেই ব্যবহার হয়। উঠোন পার হয়ে কে যাবে রান্নার চালার নীচে উনুন জ্বেলে রাঁধতে ?

চন্দনা নামের একটা উজ্জ্বল দীপ্তি এই ঘরটার মধ্যে শুধু দুটো কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে কত কীই করে তুলতে পারত।

স্টোভটা কাল একবার জ্বেলেছিলেন শচীন মাস্টার। চা বানিয়েছিলেন। সেই সরঞ্জামগুলো মাটিতে ছড়ানো

সেদিকে একটা বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে শচীন তাকের ওপর রাখা দু একটা কৌটো খুললেন। ডাল চিনি সুজি। ওঃ একটার মধ্যে চারটি চিঁড়ে।

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে একটা কানা উঁচু থালা হাতে তুলে নিলেন মাষ্টার। তার মধ্যে কৌটো কাৎ করে কিছু চিঁড়ে ঢেলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দালানের শেষপ্রান্তে উঠোনের দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলেন। এখানে সাবেকি ইঁদারা আছে, আছে টিউবওয়েল। খানিকটা ছাড়া জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার একদিকের গায়ে একখানা ছেঁড়া ছেঁড়া তোয়ালে ঝুলে পড়ে রয়েছে। শচীন কখনো গামছা ছাড়া তোয়ালে ব্যবহার করেন না।

শচীনের কোনো শখ-শৌখিনতার বালাই নেই। তবু কিছু কিছু শৌখিন জিনিস আসে এ বাড়িতে। অর্থাৎ এসেছে এ যাবৎ।

অথচ সেই শৌখিন মানুষটা রেঁধেছে বেড়েছে বাসন মেজেছে সাবান কেচেছে জল তুলেছে বাড়ি ঘর মুছেছে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে দরকার হলে কয়লা ভেঙেছে উনুন ধরিয়েছে।

কষ্ট করে নয়, অবলীলায় করেছে।

যেমন অবলীলায় সেই কাজের বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে—

অবলীলায় কী ?

চিঁড়ের থালাটাকে একহাতে ধরে অন্যহাতে টিউবওয়েলটা একটু খ্যাচাং করলেন, ঝপাং করে খানিকটা জল বেরিয়ে এল। খানিকটা চিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক এই সময় উঠোনের ওই বেড়ার একটা বাঁশ ঠেলে জনা পাঁচ ছয় তাজা তরুণ এসে ঢুকে পড়ল।

এ কী স্যার। চিঁড়ে ধুচ্ছেন।

হ্যাঁ ইয়ে পেটটা তেমন ইয়ে নেই। কিন্তু—তোমরা হঠাৎ এ সময় ?

লান্টু সবাইকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এসে বলে উঠল, একটা দুঃসংবাদ শুনে চলে এলাম স্যার! শুনলাম আপনার মেয়েকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্য, চারিদিক খাঁ খাঁ ঝাঁ ঝাঁ। চোখে অন্ধকার দেখার অবস্থা, কিন্তু চিরকালের গম্ভীর শচীন মাষ্টার এই পরিস্থিতিতে ? হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বলেন, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মেয়েকে। মানে চন্দনাকে! হা হা। খুঁজতে বেরিয়েছিল কে ? তোমার না কী ?

লান্টুকে পিছন থেকে দারুণ একখানা চিমটি কাটল বচন।

বাকিরা দুচার পা পিছিয়ে গেল।

লান্টু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, না মানে, একজন বলছিল—

একজন বলছিল! ভাল ভাল। তোমরাও তাই— দেখো বাপু নেহাৎ তোমরা আমায় খুব ভালোবাসো। ভালবেসেই এসেছ, তাই কিছু বললাম না। আর কেউ হলে, এরকম কথার জন্যে তাকে পুলিশে দিতাম। বুঝলে ? আরে বাবা সে গেছে কলকাতায় তার মামার ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন। তার কেষ্টনগরের মাসি এসে সঙ্গে নিয়ে গেছে। আর তোমরা হুলিয়া তুলে দিলে—ছি ছি!

মাপ করবেন স্যার। হঠাৎ এরকম খবর শুনে—

তাড়াতাড়ি সবকটা একসঙ্গে স্যারের পায়ের ধুলো নিয়ে সেই বেড়ার দরজা দিয়েই গলে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় পড়েই একযোগে সবাই মারমুখী হয়ে লান্টুকে ঘিরে ধরে। ইয়ার মস্তান ফক্কড়! ভাল করে না জেনে কিছু বল না তুমি না ? এমন একটা ডাহা মিথ্যে নিয়ে গুল দিতে এসেছিলি আমাদের ? শচীন মাষ্টার ঠিকই বলেছে আর কারো কাছে হলে পুলিশের হাতে পড়ে আড়ং ধোলাই খেতে হতো! লোকটা নেহাৎ ভালমানুষ বলেই এ যাত্রা পার পেয়ে যাওয়া গেল।

লান্টু মিনমিন করে বলে, মাঈরী বলছি বিশ্বাস কর খুব ইয়ে লোকের কাছে—

তাহলে বিশ্বাস করতে হয় স্যার মিছে কথা বলেছেন। পুবের সূর্যি পশ্চিমে উঠেছে শুনলেও তো—সত্যি লান্টু দেখালি বটে একখানা। এ ছেলেকে নদীর এপারে পুঁতলে ওপারে গাছ গজাবে।

ওরা চলে গেলেও শচীন মাষ্টার অনেকক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, আমি এখানে কেন ?... ... মনে পড়ল। ইঁদারার পাড়ের ওপর রেখে দেওয়া চিঁড়ের থালাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখতে পেলেন না। একঝাঁক কাক এসে সেই জায়গাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহোৎসব লাগিয়েছে।

দেবেই তো।

মাষ্টার মনে মনেই চেঁচিয়ে উঠলেন, দেবে না ? মুখের সামনে খাদ্য পড়ে থাকতে দেখলে কেউ ছাড়ে ?

বেশ করেছে। ঠিক করেছে।

কাকগুলোর কী বুকজোর। ভয় নেই গ্রাহ্য নেই। খেয়াল নেই তাদের খাদ্যের মালিক সামনে দাঁড়িয়ে। কেনই বা খেয়াল করবে ? মালিক তো ঢিল পাটকেল ছোঁড়া দূরের কথা, একটু হুঁশও করছে না। তবে থাক। প্রাণ ভরে খাক।

ফিরে এলেন।

দালানের দরজাটা যে খোলা পড়ে রইল খেয়াল করলেন না। কিম্বা গ্রাহ্য করলেন না। বন্ধ থাকলেও তো গরু ছাগল কুকুর বেড়াল ঢুকে আসে।

টুলের ওপর বসানো সোরাইটা কাৎ করে একগ্লাস জল ঢালতে গেলেন। সিকি গ্লাসের বেশি হল না। ফুরোবার পর না ভরলে এছাড়া কী হবে ? সেটুকু গলায় ঢেলে আবার চৌকীতে বসলেন।

আর সর্বদা দেখা, দেখে দেখে পুরনো হয়ে যাওয়া এই ঘরটার চারিদিকে কেমন যেন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন !...এই পুরনো বালিখশা ঘরের দেওয়ালটাও এভাবে সাজিয়ে রেখেছিল সেই চন্দনা নামের মেয়েটা যে না কি হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেল।

দেয়ালের যেখানটা যেখানটা বেশী বালিখশা অসুন্দর, তার ওপর চন্দনা একটা কিছু ঝুলিয়ে রাখত হয়তো। একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি যার তারিখগুলো এখন অতীতের কোঠায় তাই সে অংশটি বাদ দেওয়া নিপুণভাবে। হয়তো বা নিজেরই হাতে তৈরী একটা কার্পেটের ছবি।

একজায়গায় একেবারে ইঁটই বেরিয়ে পড়েছিল। রোজ বাপের সঙ্গে রাগারাগি করতো বাড়ি মেরামত নিয়ে বলতো, দ্যাখো বাবা। যেন দেওয়ালটা আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসছে।

আবার সেখানটা ঢেকেও রেখেছিল কোথা থেকে কেনা একটা মুখোস দিয়ে। মাটির মুখোস একটা সাঁওতাল মেয়ের মুখ।

শখ করে একটা মোটা গোছা ধানের শীষ ঝুলিয়ে রেখেছে দেয়ালের একখানে। উজ্জ্বল মুখে বলেছিল সেদিন, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না বাবা ? কত ছোটখাটো জিনিস দিয়েও সুন্দর দেখানো যায় !

সুন্দরের প্রতি ছিল তার বড় মোহ।

শচীন মাষ্টার অবাক হয়ে ভাবলেন, অথচ তার বাবার জীবনের চেহারাটা হঠাৎ কী 'অসুন্দর' করে চলে গেল। সমস্ত পৃথিবী তার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসবে এখন !

আর সেই হতভাগাকে এখন সেই নির্লজ্জ ভাঙাচোরা দাঁতবার করা জায়গাটা ঢাকতে ধানের শীষ ঝোলাতে হল, ক্যালেণ্ডারের ছবি ঝোলাতে হল, বসাতে হল মাটির মুখোস।

উঠলেন। আবার একটু জল খেতে গেলেন। নেই। গেলাসের তলানিটুকুই নিঃশেষ করলেন। তারপর আবার বসে পড়লেন। আর এখন ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে ভাবলেন, সারাজীবন দেখে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছি মানুষ কী করে গড়গড়িয়ে মিথ্যে কথাগুলো বলে। বলে কোনো যন্ত্রণা পায় না। কী করে হয় এমন।

অথচ এখন !

এই আমি সেই কাজই করলাম ! গড়গড়িয়ে কী পরিষ্কার ভাষায় মিথ্যে কথাগুলো বলে গেলাম। বেধে গেল না, হোঁচট খেলাম না। বরং—হ্যাঁ। হ্যাঁ। বরং যেন বেশ আত্মপ্রসাদই বোধ করলাম বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছি বলে। তার মানে আসলে ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। আর জগতে 'অবিশ্বাস্য' বলেও কিছু নেই। দুদিন আগেও কী এই শচীন মাষ্টার ভাবতে পারতো যে একগাদা মিথ্যে কথা বলে বেশ স্বস্তি বোধ করা যায় ! নিজেকে 'বাহাদুর' মনে করলো।

আহা। ভগবানের কী করুণা। কেমন সঙ্গে সঙ্গে মুখে এসে গেল 'আমাকেও যেতে হবে।'

ব্যস ! ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

এখন বাড়ির বাকি সব দরজাগুলোয় শেকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ার পালা। সে শেকল খোলবার দায় আর থাকবে না শচীন মাষ্টার নামের লোকটার !

আঃ কী মুক্তি ! কী মুক্তি !

শেকল তুলে দিয়ে সেটা আর ফিরে এসে খুলতে হবে না ভেবে এমন মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় ? শচীন মাষ্টার ভাবলেন তার মানে আমার আগেই মেয়েটা যেটা জেনে ফেলেছিল !

ভারী একটা মমতা এল তার ওপর।

❑

বেআব্রু

মারা গেলেন ? ননীঠাকুর্দা ? অ্যাঁ।

বিভূতি যেন চমকেই উঠলো। অথচ চমকাবার কথা নিশ্চয়ই নয়।

দ্বিজপদ দাঁত বার করে বললো, বড্ড যেন চমকালি মনে হলো বিভূতি ? বড্ড অকালে মারা গেল লোকটা তাই আক্ষেপ হচ্ছে ! আহা চুকচুক।

বিভূতি নিজেকে সামলে নিলো। বললো, আরে থামতো ! চমকালাম আচমকা শুনে। ননীঠাকুর্দা যে কোনোদিন দেহ রাখবেন তা মাথাতেই আসতো না। মনে হতো যেমন চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাস আছে, থাকবে, তেমনি ঠাকুর্দা বুড়োও আছে, থাকবে।

আহাহা। ভালো বলেছিস ! হ্যা হ্যা হ্যা ! কত বয়েস হয়েছিল তোর ঠাকুর্দার ?

'আমার' আবার কী ? বিভূতি বিরক্ত হয়, পাড়াতুতো ঠাকুর্দা তোরও যা আমারও তা।

তোকে একটু বেশী পেয়ার করতো, তাই !

সেটা গ্রামে বরাবর থাকি না বলে।

সে তো অনেকেই থাকে না। সবাই তো 'দুর্বাসা' বলে। কত হয়েছিল তুই জানিস না ? ওরা তো বলছিল একশো।

আরে না না ! ভূতি পিসির কাছে পাকা খবর, বিরানব্বুই।

আহা ! মাত্তর বিরানব্বুই ? তা হলে তো বলতেই হয় অকালমৃত্যু !

দ্বিজপদ সব দাঁত কটা বার করে বলে, কিন্তু তোর মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে বিভূতি, বড্ড শোক লেগেছে। নে চল চল। গামছা নিতে ভুলে যাচ্ছিস তো ? সাধে বলছি খুব ধাক্কা খেয়েছিস। হ্যা হ্যা হ্যা।

থাম ! মেলা বকবক করিস না।

বলে বিভূতি বাড়িতে বলে গামছা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

কখন গেলেন ?

ভগবান জানে মাঝরাত্তিরে না শেষ রাত্তিরে। সন্ধ্যেবেলা তো দেবু ইস্টিশন থেকে আসার সময় দেখেছিল বুড়ো দাওয়ায় বসে আছে।...কবরেজ জ্যাঠা নাড়ি দেখে বলল, 'অনেকক্ষণ ফিনিস।' তার মানে শনিবারের রাতের মড়া হলো আর কি !

আঃ ! তোদের যত সব ইয়ে। শনিবারে মরলে হয়টা কী ?

কিছু না। শুধু ভূত হয় এই আর কী।

দ্বিজপদর দাঁত বেরিয়েই আছে, তবে নিজের আখের বুঝে মরেছে বুড়ো। রবিবার না হলে তোদের সবাইয়ের কাঁধে চড়তে পেত ? দেবু, সত্য, শিশির, অবনী, তুই, এ হপ্তায় সবাই এসে গেছিস।...চল এখানে থেকেই শোভাযাত্রার হাঁক ছাড়তে ছাড়তে যাই।

বলেই অসভ্য দ্বিজপদ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বল হরি হরিবোল'।...ননী মুখুয্যের মৃত্যু এদের কাছে হাসির খোরাক।

অথচ ওই ননী মুখুয্যেই ছিলেন এই গ্রামের মাথা।

সবাই মান সম্মান করতো।

বড় চাকুরে ছিলেন, দিল্লী কানপুর লক্ষ্ণৌতে থেকেছেন। রিটায়ার করে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে না থেকে, ছেলেদের হোস্টেলে রেখে দেশে এসে বসলেন। লোকে কৃতার্থ হলো।

গ্রামের উন্নতির জন্যেও অনেক করেছেন ননী মুখুয্যে, নিজে খেটেছেন, লোককে খাটিয়েছেন, একখানা লাইব্রেরী গড়ে দিয়েছেন, নানান জায়গায় লেখালেখি করে প্রাইমারি স্কুলকে হাইস্কুল করিয়েছেন, পাড়ার বদ ছেলেদের শায়েস্তা করেছেন।

কিন্তু সে সব কবে ?

লাইব্রেরীর রজত জয়ন্তী হয়ে গেছে কত দিন যেন আগে ?

স্কুলটা তার প্রাইমারি জীবনের তারিখ ধরে সুবর্ণ জয়ন্তী করে নিল সেদিন। তো তাই বলে কি একালের ছেলেপুলেরা ননী মুখুয্যের অবদান স্মরণে রাখবে ? সে সব ঘটনা যখন ঘটেছে বিভূতির স্বর্গত বাবাই তখন সদ্য যুবক।...ঠাকুর্দা ননী মুখুয্যের সঙ্গে দাবা খেলেছেন।

অতঃপর নাটকের কত পট পরিবর্তন।

এক সময় কী দারুণ বোলবোলাও, গিন্নী থেকেছেন, বিধবা ভাগ্নী থেকেছে, ছেলেরা কলকাতায় বাসা করলেও সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি এসেছে, কলকাতার কপি কড়াইসুঁটি অসময়ের ফল তরকারিতে বাড়ি ভরা থেকেছে, দরাজ হাত গিন্নী ভাগ্নীকে লুকিয়ে কত জিনিস পাড়ায় বিলিয়েছেন।

ননী মুখুয্যের রান্নাঘরে বাজারের সেরা মাছ, হাটের সেরা মাল।

এসব বিভূতির শোনা কথা। তার স্মৃতিতে ননী ঠাকুর্দার গৌরব রবি পশ্চিমে। তখন—

গিন্নী গেছেন, ভাগ্নীটাও গেছে, ছেলেরা বাবাকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে খোসামোদ করে করে 'এলে' গিয়ে, শেষ অবধি নিজেরাই আসা যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ননী বলেছেন, 'এ বয়েসে কি আর ওদের সেই পাখির খাঁচায় গিয়ে ঢুকতে পারা যায় ? তাও তো একখানা বড় খাঁচা নয়, তিনটে আলাদা আলাদা। রাম বলো।'

তখন আর ননী মুখুয্যের মহিমায় বিগলিত জনেরা বড় কেউ নেই। অনেকে মরে হেজে গেছে। অনেকে শহরে ছেলেপুলের কাছে চলে গেছে। যারা আছে, তারা নিজের ধান্ধাতেই অস্থির। গ্রামের জীবনেও তো ক্রমশঃ অনেক জটিলতা আসছে। যারা 'মওকা' বুঝতে জানে

তারা দু'পয়সা করে ফেলছে। যারা তা না জানে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে।...কে কার ধার ধারে ? ননী মুখুয্যেকে ক্রমশঃ নিজেকেই হাঁড়ি ধরতে হয়েছে। বড় রান্নাঘর, বড় হাঁড়ি কড়া জং ধরিয়ে দাওয়ার ধারে, জনতা স্টোভে অ্যালুমিনিয়মের বাটি চড়িয়ে ননী মুখুয্যের একপাক হচ্ছে, এ দেখতে আসতে কারো দায় পড়েনি। দেখলেও গায়ে লাগে না।

যে লোকটা নিজের দুর্মতিতে দুর্গতি ডেকে আনে, তার জন্যে আবার কার মাথা ব্যথা ? ছেলেরা সাধছে, তবু যাবে না, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে, তাকে আবার মান সম্মান !

তবে আশী বছর বয়স পর্যন্ত ননী মুখুয্যে বিশ্বকে নস্যাৎ করে মট্‌মটিয়ে বেড়িয়েছেন, নিজের কাজ সব নিজে করে নিয়েও, ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী পরে বিকেলবেলা লাইব্রেরী ঘরে একবার করে হাজ্‌রে দিয়েছেন, সন্ধ্যেবেলা ভোলার দোকানে বসে, কচুরি জিলিপি, সিঙ্গাড়া পান্তুয়া দিয়ে রাতের আহার সমাধা করেছেন।

বিভূতি তখন সবে কলেজে ঢুকেছে।

সত্যি বলতে বরাবরই বিভূতি ননী ঠাকুর্দা সম্পর্কে একটু মমতা পরায়ণ। সমীহ্‌সম্পন্নও।

উনি যখন বলতেন, 'দূর শালা। ছেলেদের কাছে গিয়ে রাঁধা ভাত খেয়ে আমার কী স্বর্গলাভ হবে ? স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে ? ছেলে বৌয়ের এক্তারে গিয়ে পড়া মানেই স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি !'...তখন বিভূতির ওঁকে বেশ 'হীরো হীরো' লাগতো।...আবার যখন দেখেছে ননীঠাকুর্দা টিউবওয়েল ঠেঙিয়ে, নিজের কাপড় জামা কেচে উঠোনের দড়িতে মেলে দিয়ে, বসে বসে হাঁপাচ্ছেন, তখন ভারী মায়া লেগেছে। দেখলেই টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেল মেরেছে।...

ননী মুখুয্যে বলেছেন, তুই বলেই এই সাহায্যটুকু নিই, তোর ভেতরে ছেদ্দা আছে।...আর সব শালারা ? মুখে বলে, ঠাকুর্দা, আড়ালে বক দেখায়।...'লাইব্রেরী ঘরে' যাওয়া ছেড়েছি বদমাসগুলোর অছেদ্দার জ্বালায়, বুঝলি ? 'গিরিবালা পাঠাগার'টা যে ননী মুখুয্যের মায়ের নামে, তা' হতভাগাগুলোর মনেও থাকে না। যাক গে, জগৎপুরের মাঠ ঘাট আলো বাতাস তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না !

না সেটা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ননী মুখুয্যে সেই মাঠ ঘাট হাওয়া বাতাসের উপস্বত্ব ভোগ করে গেছেন।

নিত্য একবার বেরোনো চাইই, এবং সেই বেরোনোটি যথারীতি ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী পরে, বেতের ছড়ি হাতে দুলিয়ে। শেষের দিকটা অবশ্য দোলানো হতো না, ছড়িটায় ভরই দিতে হতো। তবু ভঙ্গীটা সিধে সতেজ।

লোকে বলতো, বুড়োর আর কোনো খরচ থাক না থাক ধোপার খরচাটি বিলক্ষণ।

কথাটা মিথ্যে নয়, বরাবর পেনসনের সিংহ ভাগটি ননী পরণ পরিচ্ছেদেই ব্যয় করতেন। খাওয়া তো ক্রমশঃ শূন্যের অঙ্কে পৌঁছোচ্ছিল। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া কমবে, এটা

স্বাভাবিক, তবে মাছের বদলে আলু সেদ্ধ অথবা দুধের বদলে জল সঙ্গত কিনা, সেটা বিবেচনার বিষয়।

একদিন বেড়াতে এসে বিভূতি দৃশ্যটা দেখে অবাক।...ওকি ঠাকুর্দা, আপনি জল দিয়ে খই ভিজোচ্ছেন ?

ঠাকুর্দা চির স্বভাবে হা হা করে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, জল দিয়েই তো ভিজোতে হয়রে দাদা, তো আড়াই টাকা দিয়ে রজনী গয়লার ড্রামের জল খাওয়ার থেকে নিজের কুঁজোর জল খাওয়াই ভালো।

ভূতি পিসি প্রস্তাব করেছিলেন, আর কতদিন হাত পুড়িয়ে খাবেন জ্যাঠামশাই ? দুপুর বেলাটা আমার বাড়ি থেকে দুটো ভাত তরকারি আনার ব্যবস্থা করি বরং—

ননী প্রস্তাবটাকে নস্যাৎ করে দিলেন।

পাগল হয়েছিস ? মরণ কালে জ্বরছেদ ? শেষ বয়সে দাতব্যের ভাত ? আর কতদিনই বা হাত পোড়াব ? পুরো লাশটাই তো পোড়াবার দিন ঘনিয়ে এলো।

ভূতি বাড়ি গিয়ে ছেলেদের বললেন, জানতাম। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।

তবু একদিন মচকেছিলেন।

বিভূতি তার সাক্ষী।

একদিন বিভূতিকে ডেকেই বলেছিলেন, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি ভাই ? পাড়ার কোনো শালাকে বলতে ইচ্ছে না, তুই বলেই বলছি।

শুনে বিভূতি প্রায় কৃতার্থই হয়েছিল।...কিন্তু—

অভব্য দ্বিজপদ আবার বিকট চীৎকার করে উঠল, বল হরি, হরিবোল।

আঃ দ্বিজ ! কী হচ্ছে কী ? খাট কাঁধে এখনো ওঠেনি, হরিবোল দিচ্ছিস যে ?

দ্বিজপদ হ্যা হ্যা করে ওঠে, দিচ্ছি তোর ঘোর ভাঙাতে। শোকের ঘোরে যা গুম হয়ে রয়েছিস ! বাবাঃ দেখালি বটে।...চল চল পা চালা। বুড়োর বাড়িতে বোধহয় এতক্ষণে ভীড় জমে গেল।

বিভূতিদের বাড়ির সঙ্গে ননী মুখুয্যের বাড়ির দূরত্ব অনেকটা, পা চালাতেই হয়। দেখিস আবার যেন—

বিশু আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আসছিস ? তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ছেলেরা না আসা পর্যন্ত তো কিছু করা যাবে না।

আরে তাই নাকি ? ভাবছিলাম রোদ চড়া হবার আগেই বুড়োকে চিতেয় চড়িয়ে ফেলব।...খবর কে দিচ্ছে ?

যুগল গেছে। ছ'টার বাসে।

দ্বিজপদ বলে ওঠে, তবে তুই আর খানিক শোক কর মানিক। আমি বরং—

চলে যায় দ্বিজপদ।

বিভূতি বাঁচলো। ঠিক এই মুহূর্তে ওই ছ্যাবলামিটা অসহ্য লাগছিল।

আশ্চর্য। গত কালই বিভূতি অনেক ঝঞ্ঝাটের পর সেই গদিটা বানাতে দিয়েছে।

হ্যাঁ। এই অনুরোধটাই ছিল ননী ঠাকুর্দার।

ওর ঘরের মস্ত বড় জোড়া পালঙ্কটার একটা গদি বানিয়ে দিতে হবে।

শুনে তো বিভূতি হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

গদি ? আপনার ওই বড় খাটের জন্যে গদি ?

ঠাকুর্দা বিভূতির বিস্ময়কে গ্রাহ্য করেননি। অবলীলায় বলেছিলেন, হ্যাঁরে ভাই, ছিঁড়ে একেবারে কুটপাট। তার ওপর আবার ওই 'লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীর বাহনেরা' তুলো টেনে টেনে খানা ডোবা করে ছেড়েছে। তা গদিখানার বয়েসও তো কম হল না ? ওই পালঙ্কে আমার, তোদের ঠাকুমার সঙ্গে ফুলশয্যে হয়েছে।

শুনে হেসে উঠেছিল বিভূতি, ঠাকুর্দা, নবকলেবরে আর একবার নতুন ফুলশয্যের দিন তো আসন্ন হয়ে এলো, ঠাকুমা সেখানে পালঙ্ক সাজিয়ে দিন গুণছেন।...মিথ্যে কেন আর ডোমের ভোগের জন্যে কতকগুলো পয়সা নষ্ট করবেন ?

হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়েছিলেন ঠাকুর্দা, তা' ডোম ব্যাটার কাছেও মান সম্মান বজায় রাখার দায় আছে। গদি টানতে এসে নাক সিঁটকে ভাববে 'বুড়োর ওপরে চাকুস চুকুস ভেতরে লাল্লাই খড়।' ভিখিরির কাঁথার মত বিছানায় শুয়ে মরেছে।...চিরটা দিন আব্রু বজায় রেখে চলে এসেছি, মরার পর বেআব্রু হব ? আর ছেলে ব্যাটারাও দেখে রেগে গিয়ে ভাববে, বাবা ব্যাটা সব টাকা খেয়ে উড়িয়েছে, সৌষ্ঠবের জন্যে কিছু করেনি। হুঁঃ ! যা বাজার ! পাড়াগাঁ বলে কিছু শস্তা ?

বলে ক্যাশ বাক্স খুলে বার করে নিয়ে এসেছিলেন এক গোছা ময়লা ফর্সা ছোট বড় মাঝারি মিশোনো নোট। দু'টাকা এক টাকাও মিশেল রয়েছে।

দেখলেই বুঝতে দেরী হয়না তিল তিল করে সঞ্চয়।

দেখেই বিভূতির চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছিল।...রজনী গোয়ালার ড্রামের জলের থেকে বিশুদ্ধ ননী মুখুয্যের কুঁজোর জল দিয়ে ভিজোনো খইয়ের বাটি।

বিচলিত বিভূতি তাড়াতাড়ি বলেছিল, টাকার জন্যে এতো ব্যস্ত কী ঠাকুর্দা ? দেবেন অখন।...এই তো স্টেশনের ধারে একটা 'বেডিং স্টোর্স' খুলেছে। অর্ডার দিয়ে যাব। পরের সপ্তাহে এসে—ওটা রাখুন।

ননী ঠাকুর্দা আপত্তি শোনেননি, জোর করে সেই একমুঠো 'কৃচ্ছ্র সাধনের ইতিহাস' বিভূতির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, না না, ও ধারফার রাখা, কাজের কথা নয়। ধার ননী মুখুয্যের কুষ্ঠিতে নেই। আর দেখ, টাকা হাতে না পেলে কাজের চাড় আসে না। পৃথিবীটাকে তো দেখলাম অনেকদিন।

পৃথিবীকে অনেকদিন দেখেছিলেন ননী মুখুয্যে তবু আরো কিছু দেখতে বাকি ছিল। সেটা

দেখাবার ভার নিল তাঁর প্রিয় পাত্র বিভূতি নামের ছেলেটা !

কিন্তু ইচ্ছে করে কি ? বিভূতি কি ভেবেছিল পাকে চক্রে দু' সপ্তাহ্ তার কলকাতা থেকে আসা হবে না, আর একটা জটিল নিরুপায় অবস্থায় পড়ে ঠাকুর্দার সেই টাকাগুলো—

দ্বিজপদ আবার পিছিয়ে এসে হাঁক পাড়ল, এই বিভূতি চলে আয়। ওরা বলছে, ওনার ছেলেরা যখন আসে আসুকগে, বুড়োকে এখন পালং থেকে নামিয়ে তুলসীতলায় শোওয়াতে হবে।

তার মানে বিভূতিকে এখন সেই গদিটাকে দেখতে যেতে হবে ! নিরাবরণ বেআব্রু।...কিন্তু নিজেকে কেন গদিটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে বিভূতি।

❑

পরাজিত হৃদয়

চিঠিখানা পেলেন সোমেশ্বর অফিসের টেবিলে। দিবাকর রেখে গেছে আরও কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে।

অফিসের ঠিকানায় ইনল্যাণ্ড লেটার ? কে দিল ? হাল্কা নীলচে রঙা চিঠিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েই যেন সাপের ছোবল খেলেন সোমেশ্বর।

এ কী ! ঠিকানায় কার হাতের লেখা ?

ভয়ঙ্কর পরিচিত এই লেখাটা যেন ছোবলটা বসিয়েই অবশ করে দিল সোমেশ্বর সেনকে।

ঘরে কেউ নেই, তবু কে বুঝি দেখে ফেলে, এই ভয়ে চিঠিটা মুঠোয় চেপে বসে রইলেন কিছুক্ষণ ! হাতের ঘামে ভিজে যাচ্ছে নরম কাগজটা।...আস্তে খুললেন, প্রথম লাইনে চোখ ফেললেন, আর দ্বিতীয়বার আর একটা ছোবল খেলেন।

এ লাইনটার মানে কী ? একেবারে প্রথম লাইনটার ?

শ্রীচরণেষু বাপী ! মাকে চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পাইনি। খুব চেষ্টা করে আশা করছি, চিঠিটা বোধহয়– মারা গেছে। তাই আবার হ্যাংলার মত তোমায় এই চিঠি। এটাও যদি মারা যায় তা'হলে এই অভিশপ্ত জীবনের ওপর দাঁড়ি টেনে দেব। আরো আগেই সে দাঁড়ি টেনে দেবার কথা। কোনোমতে নরক থেকে পালিয়ে উদ্ধার হয়ে এসে আবার তার থাবায় পড়বার ভয়ঙ্কর ভয় নিয়েও কি বসে থাকে কেউ ? তবু নির্লজ্জের মত বসে আছি ভয়ে কাঁটা হয়েও। বাপী গো,পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে তোমাদের একবার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। হয়তো ইচ্ছেটা শুনে তোমরা ঘেন্নায় মুখ বাঁকাবে, হয়তো ভাববে, কী দুঃসাহস ! তবু না জানিয়ে পারছি না। মরতেই তো যাচ্ছি, আর ভয় লজ্জা কী ? যদি পায়ের ধুলো নেবার ভাগ্য না হয়, তো এইটাই তোমাদেরকে আমার শেষ প্রণাম জানানো। চিঠির উত্তর আসতে কতদিন লাগে ? সাতদিন ? দশদিন ? তার বেশি নিশ্চয় নয় ! ইতি

তলায় নাম সই করেনি। কিন্তু সই করেনি বলে কি তনুর চিঠি বুঝতে ভুল হবে ?

এখন কী করবেন সোমেশ্বর ? ছুটে বাড়ি চলে যাবেন ? অমলার কাছে আছড়ে পড়ে বলবেন, অমলা ! তনুর চিঠি ! অমলা তনু বেঁচে আছে। তনু এই হাতের গোড়ায় দুর্গাপুরে ! ভাবতে পারো অমলা ? এক্ষুনি চলো অমলা। নিয়ে আসি আমাদের তনুকে। দেরি করলে চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন।

টেবিলের জিনিসগুলো ঠেলে রাখলেন কাঁপাকাঁপা হাতে, আর আবার একবার মুঠোয় চাপা চিঠিটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

সেই ছোবলহানা লাইনটা আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠল।...যাকে চিঠি দিয়েছিলাম! উত্তর পাইনি।...

সোমেশ্বরও কি তনুর মত 'আশা' করবেন অমলার নামের চিঠিটা মারা গেছে? তাই গিয়ে বলে উঠতে পারবেন! 'চলো অমলা—'

কিন্তু যদি—যদি চিঠিটার বদলে আর কিছুর মৃত্যু ঘটে থাকে!

যদি অমলা বলে ওঠে, 'না না'! বলে ওঠে 'কোথায় যাবো!'

চিঠিটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন সোমেশ্বর। টেলিফোনটা তুলে ডায়াল করলেন।

হ্যাঁ! আমি বলছি! অফিসের একটা জরুরি কাজে এক্ষুনি দুর্গাপুর যেতে হচ্ছে—

দুর্গাপুর।

অস্ফুট একটা প্রশ্ন।

নাঃ, প্রশ্ন নয়, যেন স্বগতোক্তি। আর্ত! অস্ফুট! কিছুক্ষণ বিরতি।

তারপর শোনা গেল, 'বাড়ি না এসেই—'

এদিকে নিরুপায় কণ্ঠ, সময় নেই অমলা, একদম সময় হচ্ছে না। এই বারোটা দশের ট্রেনটা ধরতে না পারলে—আচ্ছা রাখছি। ওঃ। কী বলছ? ফেরা? কাল। কালই।

দুর্গাপুরগামী একটা ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় জানালার ধারে বসে আছেন সোমেশ্বর হাতে একটা বই নিয়ে, কিন্তু চোখ বইয়ের পাতায় নেই, আছে জানলার বাইরে।

সামনে বসা একজন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মনে মনে ভেবে চলেছে, 'বইটা যদি পড়ছিসই না, তবে কোলে ফেলে না রেখে, পাশে ফেলে রাখ না বাবা! হাতটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিই, কী বই! ট্রেনে সহযাত্রীর সঙ্গের বই, ফ্লাস্কের জল, এবং হাতের খবরের কাগজের ওপর তো ট্রেনযাত্রীর আইনসঙ্গত অধিকার থাকেই, তবে আর মুখ ফুটে চাইয়ে ছাড়বি কেন?

কিন্তু সহযাত্রীর সেই অনুচ্চারিত ধিক্কার সোমেশ্বরকে স্পর্শ করবার কথা নয়। আর—এমনই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন যে, উসখুস করা ভদ্রলোক মুখ আর ফোটাতে পারলেন না।

হ্যাঁ, পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ স্থির। কিন্তু ভিতরে ঝড় বইছে। প্রচণ্ড ঝড়। এই দুরন্তগতি রেলগাড়ির থেকেও দুরন্তবেগে সে ঝড় যেন গাছপালার ডাল ভেঙে ভেঙে আছড়ে আছড়ে ফেলার মত, আছড়ে আছড়ে ফেলছে এক একটা ভাঙা চোরা টুকরো ছবি।

...একটা উত্তেজিত কণ্ঠ—

কী বললে? এক দঙ্গল উড়নচণ্ডে ছেলেমেয়ের সঙ্গে 'জঙ্গল' বেড়াতে যাবে তনু? ভেবেছ কী তোমরা?

একটা অবজ্ঞার গলা। ওই একদঙ্গল ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকের বাড়িরই ছেলেমেয়ে; বরং

আমাদের থেকে অনেক অভিজাত।

তা হোক। তনুর যাওয়া হবে না।

ঠিক আছে, তাহলে তাকেই বলগে। আশ্চর্য! এতো কনজারভেটিভ!

তারপর আর এক ছবি। কেঁদে চোখমুখ ফোলা একটি মুখ, ও বাপী! এখন 'যাব না' বললে, ওদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না! গলায় দড়ি দিতে হবে আমায়।

এই সব বেপরোয়া শখে, কত রিস্ক থাকতে পারে জানো তুমি?

এতজন যাচ্ছে বাপী! সব্বাইয়ের বাড়ি থেকে মত দিয়েছে। ওরা কত মজা করে আসবে। আর আমি বাপীগো—ওরা আমায় দুয়ো দেবে।

ঠিক আছে। এবারকার মত যাচ্ছো যাও, কিন্তু আর কক্ষণো এসব—

কক্ষণো না বাপী! কক্ষণো না। এই শেষ।'

হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে সব ওলটপালট করে দিচ্ছে।

এই শেষ!

ওঃ। কী অমোঘ সেই প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু কী আশ্চর্য! দঙ্গলের সবাই জঙ্গল দেখে বেড়িয়ে ফিরে এল, শুধু সোমেশ্বর সেন নামের হতভাগ্য লোকটার প্রাণের পুতুলটিকেই রাক্ষস রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল।

ভগ্নদূতেরা মাথা নিচু করে বলল, সকলের মাঝখানে চোখের সামনে থেকে জোর করে হিঁচড়ে জিপে তুলে নিয়ে—

ঝড়টা কী অসম্ভব এলোমেলো হয়ে বইছে। কত যেন কথা, কত যেন হুড়োহুড়ি হৈ চৈ। তবু কী রকম যেন চাপাচাপা, চুপ চুপ।

থাক থাক! "চোখের সামনে" যা দেখেছ তা' চোখের পর্দা থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলো। নিশ্চিহ্ন করে ফেলো স্মৃতির পর্দা থেকেও।...গল্প বানাও! খুব স্বাভাবিক অথচ খুব ভয়ঙ্কর একটা গল্প।

জঙ্গলের মধ্যে কত কী থাকতে পারে। সাপ, বাঘ, নিচু পাহাড়ের শ্যাওলা পিছল গা, নাম না জানা বুনো খরস্রোতা নদী।

বানানো গল্পই যে বারবার উচ্চারণে 'সত্য' হয়ে ওঠে, এ তো পরীক্ষিত সত্য।

অতএব ওই খরস্রোতা নদীটাই বেছে নেওয়া হোক!

সমাজের সামনে ধরে দিতে হবে তো একটা সলিড্ খাদ্য। নাহলে তার উত্তাল কৌতূহলের ক্ষুধা মিটবে কী করে?

অথচ গভীর গোপন অন্তরালে কতদিন ধরে চলেছে অবিশ্রান্ত চাপা আর্তনাদ, তুমি ওকে প্রসন্নমনে মত দাওনি, তাই ওর এই সর্বনাশ হল।

কিন্তু তার বিপরীতে কি বলা গেছে, 'তুমি ওকে আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলে—'

বলা যায়নি।

মেয়েরা যত অবলীলায় যত নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ করতে পারে, পুরুষে তা পারে না।

ঝনাৎ করে থেমে গেল গাড়িটা।

কী হল ? এসে গেল না কি ?

ভয়ঙ্কর একটা ভয়ে হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে এল।

না আসেনি। তবে এগিয়ে আসছে। আর দুটো স্টেশন পরেই দুর্গাপুর।

এতক্ষণকার ঝড়ের ঝাপট ঠেলতে ঠেলতে সোমেশ্বরকে অতীতের একটা চাপা দেওয়া গহ্বরে ফেলে দিচ্ছিল, এই ধাক্কায় ছিটকে চলে এসে এখন সোমেশ্বর সেন ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু সেখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কী করে যাবে ? ভবিষ্যৎ জিনিসটা তো অন্ধকারই।

সোমেশ্বরের সেই হৃৎপিণ্ডে প্রবাহিত হিম প্রবাহটা ঘাড় থেকে মাথায়, মাথা থেকে মেরুদণ্ডে, মেরুদণ্ড থেকে শরীরের সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে পৌঁছে সব অসাড় করে দিচ্ছে।

তবু সেই অসাড় অবশ চেতনা নিয়েই সোমেশ্বর ওই অন্ধকারটার মধ্যেই হাতড়াতে লাগলেন। একটু পরেই সোমেশ্বর দুর্গাপুরে পৌঁছে যাবেন। তারপর হাতের চিঠিটা খুলে লোককে জিজ্ঞেস করে করে দু'আড়াই লাইন লম্বা সেই ঠিকানাটায় পৌঁছবেন, যেটা তনুর চিঠির মাথায় লেখা আছে।

যদিও ওই ঠিকানাটা পেতে হলে, নগরীর কোনদিকে যেতে হয়, কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করতে হয়, তা জানা নেই সোমেশ্বরের, তবু পেয়ে যাবেনই। ঠিকানার একটা নিয়ম তো থাকেই !

কিন্তু তারপর ?

সাড়া দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলাবেন ? কী রকম বাড়ি ? কোন মুখো দরজা ? কে এসে খুলে দেবে ?

কালো কর্কশ লোমশ কোনো হাত ?

খুলে দিয়ে যদি রুক্ষ প্রশ্ন করে, কাকে চাই ?

সোমেশ্বর কী বলে উঠতে পারবেন, 'সুতনুকা সেন' বলে কেউ থাকেন এখানে ? ডাকনাম তনু। না না বয়স্কা মহিলা নয়, একটি মেয়ে ! পুতুলের মত সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়ে !

পারবেন ! পারলেন। আর সমস্ত কিছু তোলপাড় করে দিয়ে কোথা থেকে যেন একটা কর্কশ গলা ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠল, সুন্দর ? তাই নাকি ? তা ওই তো ! নিয়ে যাও।

এক বোঝা ভাঙা পুতুলের টুকরোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

সোমেশ্বরের মধ্যেকার সেই হিমপ্রবাহটা হঠাৎ যেন আগুনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

সোমেশ্বর সেই ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, জুড়ে জুড়ে আস্ত করে তুলতে, হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না। হাত থেকে ফসকে ফসকে পড়ে গিয়ে আরো টুকরো

হয়ে যাচ্ছে।

চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

ভীষণ ভাবে ঘেমে যাচ্ছেন সোমেশ্বর।

একটুখানি সুডৌল চিবুকের আভাস, কোমল নমনীয় গালের একটি পাশ, বড় বড় দুটো চোখের চকিত একটু দৃষ্টি, কপালের ওপর উড়ে আসা দুটো ঝুরো চুল, খাতার ওপর কলমধরা কটি আঙুলের ডগা এই সম্বল জুড়ে ভাঙা পুতুলটাকে দাঁড় করানো যায় ? তার আস্ত চেহারা দিয়ে ?

নাঃ সম্ভব হচ্ছে না ! পেরে উঠছেন না সোমেশ্বর। দাঁড় করিয়ে বলে উঠতে পারছেন না, এতোদিন তুই কোথায় ছিলি তনু ? কী ভাবে ছিলি ?

বলে উঠতে পারছেন না, তাই বলে তুই মরতে চাস ? ভেবেছিস কী ?

কেন ? কেন আমি কিছুতেই আমার আস্ত তনুকে খুঁজে পাচ্ছি না !

ভেতরে ভেতরে চীৎকার উঠছে। 'তনু, তোর হাসিটা কই ? আলোঝরানো মুক্তোর মত দাঁতের সেই হাসিটা ? তোর সেই হাসিটা দেখতে পেলেই তো আমি তোকে জুড়ে ফেলতে পারি, গড়ে তুলতে পারি। তারপর দুজনে ছুট মেরে চলে যেতে পারি—আমাদের সেই বাড়িটায়। যেখানে ক্ষণে ক্ষণে তোর হাসির আলো ঝলসে উঠতো, আর হাসির বাজনা বেজে উঠত। যেখানে তুই আবার রেগে রেগেও বলে উঠতিস, দেখছ বাপী, মা বলছে, সবসময় এতো হাসি কিসের ? মাকে বকে দাও না বাপী !

কিন্তু সেই হাসিটাই যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন ধোঁয়া, ছায়া, কুয়াশারা এসে ভীড় করছে।

অতএব এই ভাঙা-চুড়ো পুতুলটাকেই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অমলার সামনে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু তারপর ?

যদি অমলা ছুরির মত চোখে চেয়ে বল ওঠে, 'এর মানে ?'

যদি অমলা কিছু না বলে হাত দিয়ে দরজার কপাটটা আড়াল করে দুটো পাথরের চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ?

আবার তনুর চিঠির প্রথম লাইনটা মনে পড়ল। মনে পড়ল, টেলিফোনে ভেসে আসা সেই অস্ফুট স্বগতোক্তি, দুর্গাপুর !

সোমেশ্বর কি ওই সব কিছু অগ্রাহ্য করে বলে উঠতে পারবেন না, ভয় পাবার কী আছে অমলা ? আমরা তো আমাদের তনুকে নিয়ে দূর দূরান্তরে কোথাও চলে যেতে পারি। পাহাড়ের কোলে, কি অরণ্যের ছায়ায়, নয়তো নাম-না-জানা কোনো নিভৃত গ্রামে। যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না। দীন-দুঃখীর মত থাকতে পারব। আমাদের এই সাজানো জীবন, সাজানো সংসার, আত্মীয় বন্ধু পড়শি প্রতিবেশী, এরা কি আমাদের তনুর চেয়ে সত্য ? তনুকে হারিয়ে ফেলার পর এর সব কিছুই কি মিথ্যা হয়ে যায়নি ? বল অমলা, মিথ্যা হয়ে যায়নি পৃথিবীর

সব রং, সব রস, সব স্বাদ ! তবে ? কী দরকার এই সব ঠাটবাটে ?

আচ্ছা যদিই পারলেন বলে উঠতে, সেই পরাজিত মাতৃহৃদয়ের কাছে নতজানু হয়ে। পাথরের চোখে কি করুণাঘন দৃষ্টি ফুটবে ? কপাটটা কি দু'হাট হয়ে খুলে পড়বে ?

এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলেন সোমেশ্বর।

তনুকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাতেই তুলে দেবেন ?

শুনছেন !

কোথা থেকে যেন কে কাকে বলছে, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

কাকে বলছে ?

চোখ খুলে তাকালেন সোমেশ্বর।

তার মানে এতক্ষণ সোমেশ্বর এত কিছু দেখে চলছিলেন বোজা চোখে।

চোখ খুলে যেন অবাক হয়ে গেলেন। সামনে একজোড়া পাথরের চোখ তাকিয়ে নেই সোমেশ্বরের দিকে একটি নারী-মুখের সঙ্গে।

উদ্বিগ্ন একটি পুরুষ-মুখ প্রশ্ন করছে, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

সোমেশ্বর মাথা নাড়লেন। না না।

খুব কিন্তু ঘামছেন। কপাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে—

ও কিছু না।

সোজা হয়ে বসলেন সোমেশ্বর।

পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা-কপাল মুছতে লাগলেন। রুমালটা ভিজে শপশপে হয়ে গেল।

আপনার এরকম ঘামের ধাত না কি ?

ওই একটু।

কী আশ্চর্য ! চিঠিখানা রুমালের সঙ্গে পকেট থেকে উঠে এসেছে। ভিজে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ্বর। বইখানা কোল থেকে পড়ে গেল। হাতের মুঠোয় উঠে আসা সেই ঈষৎ নীলাভ কাগজখণ্ডটুকু খণ্ড খণ্ড করে জানলার বাইরে ছেড়ে দিলেন।

দিয়েই চমকে উঠলেন।

কেন দিলেন ? ফেলে দেওয়া মাত্রই তো একটা হাহাকার তোলপাড় করে উঠল। সেই হাহাকার আছড়ে পড়তে চাইল জানলার বাইরে। এ আমি কী করলাম ! এ আমি কী করলাম। ভয়ঙ্কর একটা ব্যাকুলতায় চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন কোথায় পড়েছে সেই কাগজের কুচিগুলো।...দেখতে পেলেন না।

গাড়ি গন্তব্যস্থলের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই সমস্ত পরিবেশটা অদূরবর্তী শিল্পনগরীর পরিচয়লিপি বহন করছে। গাড়ির গতি মন্থর থেকে অতি মন্থর হয়ে আসছে।

হঠাৎ অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে দরজার কাছ থেকে অনেকটা ঝুঁকে নেমে পড়লেন সোমেশ্বর চলন্ত গাড়ি থেকে। শরীরে দারুণ একটা ঝাঁকুনি লাগল। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে সামলে নিলেন।

সহযাত্রীরা হাঁ-হাঁ করে উঠল। কে একজন বলে উঠল—এই যে, আপনার বইটা, ব্যাগটা—

জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু, সোমেশ্বর তখন দ্রুত হেঁটে চলেছেন, ফেলে আসা পথের দিকে। ব্যাকুল হয়ে তাকাচ্ছেন হালকা নীলরঙা কাগজের টুকরোগুলো কোথায় পড়েছে দেখতে।

কী আশ্চর্য! কেন? সেই টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলে জুড়ে জুড়ে আবার সেই ঠিকানাটা আবিষ্কার করবেন? পাগল হয়ে গেলেন নাকি? কোথায় সেই টুকরোরা? চিহ্নমাত্র নেই।

তার মানে 'তনু' নামের সেই মেয়েটাকে 'একটিবার' দেখা দেবার সম্ভাবনাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কী অদ্ভুত! সোমেশ্বর নিজেই করলেন এটা! কেন করলেন! কী করে করলেন!

এখন কি সোমেশ্বর অমলার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে বলবেন, অমলা! তনু তোমায় যে চিঠিটা দিয়েছিল সেটা কই? ভীষণ দরকার। তাতে তনুর ঠিকানা আছে—

কিন্তু তারপর? যদি তনুর আর তার বাপের 'আশা' সফল করতে, সত্যিই অমলার সেই চিঠিখানা মারা গিয়ে থাকে?

কী বলে উঠবে অমলা এই অকস্মাৎ প্রশ্নে? পৃথিবী কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না সোমেশ্বরের ওপর? তনুর চিঠি মানে? তনুর চিঠি মানে কী?

কী উত্তর দেবেন সোমেশ্বর? বলতে পারবেন, 'মানে' ছিল অমলা। আমিই নিজহাতে সেই মানেটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছি।

সোমেশ্বর অনুভব করছেন সেই চিঠিটা যদি মারা না গিয়ে থাকে। আর টেলিফোনের সেই ক্ষীণ স্বগতোক্তিটাও যদি অমোঘ হয়, পরিস্থিতি একই হবে। পরাজিত মাতৃহৃদয়ের নিরুপায় যন্ত্রণা। এই একটা পথ পেয়ে তীব্র হয়ে সোমেশ্বরকে আঘাত হেনে-হেনে মুক্তি খুঁজবে।

ধিক্কারের বাণী আকাশে উঠবে, তুমি কী? তুমি কী? তুমি তনুকে ফিরে পেয়েও—তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এলে? এখন তুমি দুর্গাপুরে ফিরে গিয়ে দরজায় দরজায় জিগ্যেস করেও কি তনুকে খুঁজে পাবে? ক'দিন সময় দিয়েছিল তনু তোমায়? আমি ভেবে পাচ্ছি না, কী করে তুমি? কী জন্যে তুমি—

সোমেশ্বর কি বলবেন, অমলা আমি তোমার ভয়ে—

ছিছি! এর থেকে হাস্যকর কথা আর কী হতে পারে?

অথচ তখন হাস্যকর মনে হয়নি। তখন মনে হয়েছিল এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। তনুকে বাঁচানো আমার হাতে নয়!

সোমেশ্বর যখন বাড়ি ফিরলেন, 'কাজের-লোকটা' শুয়ে পড়েছে। অমলাই নেমে এসে

দরজা খুলে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য ! সোমেশ্বরের কালকের বদলে আজই ফিরে আসায় অমলার মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। না উল্লাসের, না বিস্ময়ের, না বা চিন্তার।

শুধু একটা যন্ত্র থেকে আওয়াজ এল, আজই ফিরতে পারা গেল !

উত্তরটাও সেই রকমই হল—কাজ মিটে গেল !

আবারও একটা যান্ত্রিক স্বর, এমন দেখাচ্ছে যে ? খাওয়া-দাওয়া হয়নি ?

অথচ এটা অবাস্তব প্রশ্ন। অফিসের কাজে বাইরে গেলে, খাওয়া-দাওয়ায় তো—রাজকীয়তার ছাঁচ দেখা যায়।

সোমেশ্বর বললেন, সময় হয়নি।

সময়ের অভাবে খাওয়া হয়নি ?

খুব রেগে ওঠবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিল না অমলা বরং প্রসঙ্গ পালটে বলল, এত রাতে চান করবে ?

না করে পারা যাবে না।

বেশী জল না ঘাঁটলেই ভাল হয়। তাড়াতাড়ি চলে এস। খাবার ঠিক করছি।

তুমি কেন ? বিজয় ?

শুয়ে পড়েছে। আসবার ঠিক ছিল না তো তোমার।

ডেকে দিই ?

নাঃ। এতো কী কাজ !

যেন একটা পাথরের দেওয়ালের দুদিক থেকে কথা বলছে দু'জন। অমলা বলে উঠতে পারছে না, দুর্গাপুরে কী কাজ ছিল গো তোমার ?

সোমেশ্বরও বলে উঠতে পারছেন না, জানো, আজ দুর্গাপুরে—না।

সোমেশ্বর বুঝে ফেলেছেন এই দেওয়ালটা আর কোনোদিনই সরবে না। হয়তো বা দুস্তর একটা ব্যবধান বাড়িয়েই চলবে।

বহিরঙ্গের সব ঠাটবাটই বজায় থাকবে, সাজানো জীবন যেমন চলছিল, চলতে থাকবে, শুধু এই পাথুরে দেওয়ালটার দুধারে বসে দুটো প্রাণী পরস্পরকে ঘৃণা আর সন্দেহের দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে চলবে।

একজন অবিরত ভেবে চলবে অমলা, তুমি এই ? তুমি এই ? উঃ চিরকালটা কী ঠকাই ঠকে এসেছি আমি।

আর অপর জন অবিরত ভেবে চলবে, আমি তো সেই বুক ফেটে যাওয়া চিঠিখানাকে তক্ষুনি জ্বলন্ত উনুনের আগুনে—তবে ওর চোখের তারায় সর্বদা কেন এমন একটা ঘৃণার ছায়া ? কেন ? কী করে ?

অথচ চেঁচিয়ে বলে ওঠার উপায় নেই কেন তুমি সবসময় এমন ঘৃণা আর হতাশার দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকো ?

কিন্তু এছাড়া আর কী করার ছিল অমলার ? কী করতে পারতো সে ? অমলার যে মেয়ে একদা বন্ধুদের দলে জুটে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে "দুর্ঘটনা"য় প্রাণ হারিয়ে এখন ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দেয়ালে ঝুলে আছে, সেই মেয়েকে অমলা হঠাৎ আবার রক্তমাংসের আধারে ভরে ফেলে নিয়ে এসে, কোথায় জায়গা দেবে ?

অতল অপার মাতৃহৃদয়ের আশ্রয়ে ? সমাজ সংসার থেকে সরে গিয়ে !

কিন্তু সেই 'অতল অপারটি' কি এতই বিশাল হতে পারে যেখানে, পচে যাওয়া, পোকায় খাওয়া একটা মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া যায় ? তেমন 'বিশালে'র খবর অমলার অন্তত জানা নেই।

অমলা কি কোনোদিন তাকে বলে উঠতে পারবে, তনু আমায় এক গেলাস জল দে তো !...তনু, আমার ঠাকুর ঘরটা একটু মুছে রেখে আয় তো। তনু তোর হাতের আলপনাটি বড় সুন্দর খোলে, লক্ষ্মীর ঘরের আলপনাটা তুই দিস তো।

সমাজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু নিজের কাছ থেকে ?

অতএব বাকি জীবনটা একই ঘরে আবদ্ধ দুটো প্রাণী, পরস্পরের থেকে যোজন দূরে বসে, দিন কাটিয়ে চলবে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা আর সন্দেহের সম্বল নিয়ে।

এর থেকে উদ্ধার হবার উপায়ই বা কোথা ? দুজনের মাঝখানে অদৃশ্য শূন্যে যে ঝুলেই থাকবে ঝাপসা ঝাপসা একটা গলায় ফাঁস লাগানো মৃত দেহ।

❏

স্টীলের আলমারী

চমৎকার। সক্কাল বেলাই এক ঝামেলা।

ঠিকরে উঠল লতিকা। বলতে যাচ্ছিল 'আপদ', সামলে নিয়ে বলল, 'ঝামেলা'।

তারপর পরিতোষের কাছে চলে এসে তেমনি ঝঙ্কারের সঙ্গেই বলল, সক্কাল বেলাই সুখবর শোনো! তোমাদের নয়নপুর থেকে তোমার প্রাণের বড়দা এসেছেন।

পরিতোষের হাতে সবে এক চুমুক খাওয়া চায়ের কাপ। পরিতোষ সতৃষ্ণ নয়নে জানলার দিকে তাকিয়েছিল কতক্ষণে খবরের কাগজটা এসে পড়ে।

একতলার ঘর, সামনের জানলা দিয়ে কাগজ ফেলে দিয়ে যায়।

বড়দা নয়নপুর থেকে এসেছেন?

পরিতোষের পেয়ালা থেকে একটু চা চলকে পড়ে গেল।

জ্যাঠতুতো ভাই বড়দা সম্পর্কে পরিতোষের যে একদা কিছুটা দুর্বলতা ছিল সে কথা লতিকার জানা বলেই এভাবে ঠোক্কর দিয়ে কথা বলা।

তা নয়নপুরের কথা উঠলে কার সম্পর্কেই না ঠোক্কর দিয়ে ছাড়া কথা বলে লতিকা?

সেই যে বিয়ের পর কবে কোন্ কালে নতুন বৌ হিসেবে দেশের বাড়িতে কটা দিনের জন্যে বাস করতে যেতে হয়েছিল, সেই সূত্রেই নাকি তার নয়নপুর সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। আর সে অভিজ্ঞতা যে মধুর নয় তা লতিকার এযাবৎ কালের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ধ্বনিত হয়।

কিন্তু এমন কী সেই অভিজ্ঞতা?

যা সারাজীবন কাল মন বিরূপ করে রাখতে পারে?

আর কিছুই নয়। মূল কারণ হচ্ছে পরিতোষের সেই তুচ্ছ গন্ডগ্রামটুকুর প্রতি প্রাণের ভালবাসার খবর। হ্যাঁ, লতিকা যখন ওই গাঁইয়া জায়গাটা সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়েছে, তখনই ওই 'খবর'টি টের পয়েছে। পরিতোষের মুখের রেখায় রেখায় সেই ভালবাসাটির খবর ধরা পড়েছে।

অতএব সতীনের হিংসেতুল্য একটি জ্বালা!

পরিতোষ কি আর তা না বুঝতে পারে? বুঝতে পেরে পেরেই তো সেই একান্ত গভীর সুন্দর ভালবাসাটুকুকে হৃদয়ের নিভৃত কোটরে কবরিত করে রাখতে রাখতে ক্রমশঃ তাকে ভুলেই গেছে। অর্থাৎ সত্যিই কবরিত হয়ে গেছে।

এখন আর পরিতোষকে ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে তোমার প্রাণের বড়দা বলার কোনো মানে নেই। বছরে ক'বার মনে করে তাঁকে পরিতোষ ? চিঠি লিখে খবর নেওয়া-নিই্র প্রশ্নও নেই আর। নেহাৎ বিজয়া দশমীর প্রণাম জানানোর সঙ্গে বলা—'আশা করি তোমাদের সব কুশল।'

ভারী সুন্দর একখানি ভাষা চালু আছে আমাদের। কেমন আছো কী বৃত্তান্ত লিখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন মারার পিছনেই তো থাকছে প্রশ্নগুলির উত্তরের আশা ! তার মানেই জের টেনে চলার পথ খুলে রাখা।

এ বেশ ! 'আশা করছি।' এর জন্যে আর উত্তরের আশা থাকে না।

এইভাবেই অতি নিকটজনেরাও ক্রমশ বৎসরান্তে একবার 'ফুলজল' পাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল।

বড়দার সঙ্গেও এখন পরিতোষের সেই রকমই যোগাযোগ।

বড়দার আসাটা অপ্রত্যাশিত।

তাই চায়ের পেয়ালা থেকে একটু চা চলকালো।

শুকনো গলা থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে এল, বড়দা ! নয়নপুর থেকে !

পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিপন্ন গলায় বলল, এখন, এ সময় ? কোন্ গাড়িতে ?

লতিকা ঠোঁট উল্টে বলল, তা কী করে জানবো ? তোমাদের নয়নপুরের ট্রেনের টাইম তো আর মুখস্থ করে রাখিনি।

তাড়াতাড়ি কাপটা শেষ করে নামিয়ে রেখে পরিতোষ বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?

আমি আবার আগ বাড়িয়ে কী দেখা করতে যাব ?

লতিকা আর একবার ঠোঁট ওলটালো, রেখার মা এসে বলল।

পরিতোষ যে ঘরে বসে চা খাচ্ছিল সেটাকে মোটামুটি ভাঁড়ারঘরই বলা যায়। আবার তার মধ্যেই খাবার টেবিল, চায়ের সরঞ্জাম।

বাইরের দিকে একখানা ভাল ঘর আছে যেটাকে লতিকা সুচারু ভাবে ড্রইংরুম রূপে সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ির মধ্যে একখানা ঘর অন্ততঃ থাকুক যেখানে সভ্যভব্য অতিথি-অভ্যাগতকে বসানো যায়।

সে-ঘরেই টেলিভিশান, সে-ঘরেই বুক-র‍্যাক। এবং নানাবিধ শৌখিন জিনিসের সমাবেশ।

সে ঘরে নয়নপুরের বড়দাকে বসাবার কথা নয়। কিন্তু বুদ্ধিহীন রেখার মা আগে সেখানেই বসিয়ে তবে খবর দিতে এসেছে। বসাবে না ? শুনলো যখন মেসোমশাইয়ের লোক, দাদা, তখনি তো ভক্তি উথলে উঠছে।

পরিতোষ শুকনো মুখে বলল, এ সময় হঠাৎ, কেন কে জানে !

কেন আবার !

লতিকা আবার নিজস্ব ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে বলল, মুখে ধান শুকিয়ে ধানাই-পানাই করে দুঃখের গাথা গেয়ে কিছু টু পাইসের ব্যবস্থা করা। শুনবে অখন, গ্রামে গঞ্জে এখন বাস করা দায়। জমিতে ধান নেই পুকুরে মাছ নেই– ইয়ে বাড়িতে চালে খড় নেই! এ তো পড়েই আছে।

কথাগুলো যে পরিতোষের কানে মধুবর্ষণ করলো তা নয়, তবে পরিতোষ যে ছিটকে উঠে প্রতিবাদ করলো তাও তো নয়।

পরিতোষ শুধু মনে করতে চেষ্টা করলো কবে কোন্ সূত্রে বড়দা কাঁদুনী গেয়ে টু পাইস হাতিয়ে গেছে। 'বড়দা' নামক সেই প্রাণখোলা হাসি দীর্ঘকায় মানুষটার সঙ্গে ঠিক ওই বিশেষণগুলো কি মানানো যায়?

অথচ পরিতোষ লতিকার মুখের ওপর বলে উঠতেও তো পারল না, কবে কোন দিন বড়দা আমার কাছে এসে হাত পেতেছেন লতিকা?

নাঃ, বলতে পারল না।

কে জানে কোন্ অমোঘ নিয়মে লতিকার মুখের ওপর স্পষ্ট সত্য কথাটা শুনিয়ে দেবার সাহস নেই পরিতোষের। কোনো ব্যাপারেই নয়।

লতিকা যখন অনায়াসে রেখার মার রেখাটাকে বলে, এই, 'মা আসতে পারবে না' খবরটি দিয়ে পালাচ্ছিস যে? বাসনগুলো মেজে দিয়ে যা।

তখন পরিতোষ বলতে পারে না, কী আশ্চর্য, ওইটুকু মেয়েটা, আমাদের টুকাইয়ের থেকেও ছোট, ও অতগুলো বাসন মাজতে পারে?

বড়জোর হয়তো সাহসে ভর করে বলে, ও যা বাসন মাজবে তা তোমার পছন্দ হবে?

লতিকার অবশ্য কথার মর্মার্থ বুঝতে আটকায় নি। কারণ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

তাই লতিকা রোদা গলায় বলে, হবে কিনা সে আমি বুঝবো। না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব নাকি?

আবার অন্য দিকেও পরিতোষের পরিচিত কেউ বেড়াতে এলে লতিকা যখন অবলীলায় বলে, চা? চা-ফা হবে না এখন। দুটো মিষ্টি আনিয়ে ফ্রীজের ঠান্ডা জল দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি–

তখন পরিতোষের এমন সাহস হয় না যে বলে, চা তো তোমাদের সারাক্ষণই হচ্ছে বাবা! আমার একটা বন্ধু এলেই–

নাঃ, তেমন সাহস হয় না পরিতোষের।

লতিকা যদি স্বেচ্ছায় কিছু করে, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয় এবং বার বার লতিকার তৎপরতার আর বিবেচনার কথা উল্লেখ করে।

তাই বলে উঠতে পারা সম্ভব হলো না পরিতোষের, 'কবে আবার বড়দা আমার কাছে... ?'

কে জানে কেন পরিতোষের মধ্যে এমনই একটা অনধিকারীর আর অপরাধীর ভাব!

বিশেষ করে নয়নপুর সম্পর্কিত কথা উঠলেই পরিতোষ যেন চোর।

তবু এখন পরিতোষকে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করতে হচ্ছে। আর সেটুকু করে ফেলেই সমস্ত সহানুভূতিটুকু লতিকার দিকে ঢেলে বলে উঠতে হলো, তা এ সময় যখন এসে হাজির হয়েছেন, তখন তোমার তো বেশ ভালই কাজ বাড়ল। না খাইয়ে তো আর – অথচ ইয়ে তোমার তো শুনছি কদিন থেকে গ্যাস ফুরিয়ে বসে আছে।

লতিকা একটু বিদ্রূপের হুল ফোটানো হাসি হেসে বলে, গ্যাসই ফুরোক আর শ্বাসই ফুরোক তোমার 'দ্যাশে'র বড়দা যখন, তখন ষোড়শোপচারের নৈবিদ্যি সাজাতেই হবে।

ভবতোষ এসে বসে আছেন।

পরিতোষ মনে মনে রীতিমতই চাঞ্চল্যবোধ করছে। কিন্তু এদিকটার অবস্থাটি একটু আঁচ করে না গেলেও তো স্বস্তি নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে গল্প করতে বসে যাবেন, আর লতিকা হয়তো শুধু চারটি বাজারের খাবার আনিয়ে সাজিয়ে দিয়ে অতিথি সৎকারের পাট মিটোবার তাল করবে।

অথচ ওঁরা গ্রামের মানুষ শহর-বাজারের 'বাজারের খাবার'কে খুব ভয়ের এবং অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

কদাচ কখনো যখন আসেন, মানে আগে আগে এসেছেন, বেশীর ভাগ দুপুরের গাড়িতে এসে বিকেলটা থেকে সন্ধ্যের সময় চলে গেছেন।

তা কখনো কি পরিতোষ মনের জোর করে বলে উঠতে পেরেছে, রাতটা থেকে যাও না বড়দা। সকালের গাড়িতে চলে যেও। রাতে বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে।

না, সে জোর কখনো খুঁজে পায়নি পরিতোষ ভট্টাচার্য নামের সরকারী অফিসের একটি মাঝারি অফিসার। শুধু কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়েছে।

এমন কি একান্ত বাসনা সত্ত্বেও লতিকার কাছে প্রকাশ করতে পারেনি, দু'খানা লুচিফুচি ভেজে খাইয়ে দিলে হতো বোধ হয়। ওঁর আবার বাজারের খাবারে জুজুর ভয়।

না সেসব বলা-টলা হয় না।

আর ভবতোষ নামের মানুষটা জলখাবারের থালাটা হাতে নিয়ে বলেন, নাঃ তোদের এই এক ফ্যাশান বাবা! গাদা-গুচ্ছির পয়সা খরচা করে একগাদা বাজারের খাবার আনিয়ে খাওয়াতে না পারলে যেন আদরযত্ন করা হয় না। এর থেকে যদি বৌমা তোদের রুটি তরকারি থেকে দুখানা চায়ের সঙ্গে দিয়ে দিতো, খেয়ে আরাম হতো। এইসব সিঙাড়া কচুরি শুধু অম্বলের কুঠি!

পরিতোষ না তাকিয়েও একখানি বেজার মুখের ছবি দেখতে পায়।

পরিতোষ আবহাওয়া বদলাতে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তোমার আবার অম্বল কী গো বড়দা? লোহা খেয়ে লোহা হজম করবার শক্তি ছিল না?

হাহা করে হেসে ওঠেন ভবতোষ। বলেন, 'ছিল'। অর্থাৎ অতীত! এখন আর নেই

রে ভাই। একসময় তো লোহার রডও দুহাতে চেপে বাঁকাতে পারতুম। সাঁৎরে গঙ্গার এপার ওপার হতুম। এখন আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। গঙ্গার যা হাল হয়েছে নাইতে নামতে রুচি হয় না।

তা একদা রাম অযোধ্যা দুইই ছিল।

ভবতোষ ছিলেন পাড়ার হীরো। গ্রামে লাইব্রেরী করেছেন, জিমন্যাস্টিকের ক্লাব খুলেছেন, ফুটবলের টীম গড়েছেন এবং যতটা পেরেছেন পরোপকার করে বেড়িয়েছেন।

পরিতোষের 'ছেলেবেলা'র চোখের সেই উজ্জ্বল ছবিটি পরিতোষের হৃদয়কন্দরে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। তবে এখন দেশের অবস্থা বদলে গেছে, বদলে গেছে সেই সহজ আনন্দের দিনগুলো।

বদলে গেছে পরিতোষও। সে মূল্যবোধও আর নেই।

তবু মানুষটাকে দেখলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিভাব।

যেন কতক্ষণে মান বাঁচিয়ে চলে যাবেন সেই চিন্তা!

তবে লতিকা এমন অসভ্য মেয়ে নয় যে গুরুজনের মান না বাঁচিয়ে কথা বলবে। ভাসুর সদর চৌকাঠ পার হয়ে যাবার আগে কোনো দিনই বলে ওঠে না যে এদিকে তো বাজারের খাবারে এতো ব্যাখ্যানা! চেটেপুটে খেয়েও তো নেওয়া হল সব!

আর এই এখন, এই যে বলছে, গ্যাস ফুরোক আর শ্বাসই ফুরোক —সে কি আর এমন স্বরে বলছে যে বাইরের দিকের সেই ঘরটা পর্যন্ত স্বরটা পৌছবে।

পরিতোষের অবশ্য স্বভাব ঠিকই নীচু স্বরে।

তার কথা দেয়ালের ওপারে যায় না। সেই স্বরে ব্যস্ত হয়ে বলল, আহা অনেক রকম করবার কী দরকার? বাড়িতে যা রান্না হয় তাই দেবে।

হুঁ, এখন তো বলা হচ্ছে। তখন খুঁৎখুৎ করবে। দু'খানা বেগুনী ভেজে দিলে হতো। বড়দা বেগুনীটা খুব প্রেফার করেন।

আরে না না, ওসব কিছু করতে হবে না। গ্যাস নেই সেটা জানিয়ে দিলেই হবে।

ঠিক আছে। দয়া করে আবার বাজার ছুটতে যেও না টাটকা মাছ আনতে। ফ্রীজে মাছ রাখা দেখে তো সেবারে তোমার দাদা নাক সিঁটকে ছিলেন—'পয়সা খরচা করে সাত বাসি মাছ খাবার জন্যে কিনলি তো এটা! জানি! শহরে বাস করলেই শহরে চাল ছাড়া গতি নেই। পাঁচজনের সামনে মুখ থাকে না।' বলে কী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি।

বড়দার সঙ্গে পেঁচিয়ে হাসিটা ঠিক মানাতে না পারলেও অভ্যস্ত নিয়মে অপ্রতিবাদেই কথাটা হজম করে পরিতোষ। এবং একটু ব্যস্ত গলায় বলে, যাই।

এই সময় রেখার মা এসে দাঁড়াল।

বলল, মাসিমা, কী হল আপনাদের? উনি আমায় বললেন যে, কী গো বাছা বাড়িতে খবর দাওনি? আর খবর দেবার কী আছে? ঘরের লোক! চল যাই—

রেখার মা একটু ঢোক গিলে বলল, তা পাছে হুটপাট ঢুকে আসে তাই বললুম, হ্যাঁ, খবর দিয়েচি ! তো এখন মেসোমশাই বাথরুমে আর মাসিমা ঠাকুরঘরে।

ঠাকুরঘরে !

লতিকা হি -হি করে হেসে ফেলে বলে, খুব বানাতে শিখেছিস তো ? কী ভাগ্যি বলিসনি মাসিমা ধ্যানে বসেছেন। যাক বলে ভাল করেছিস !

রেখার মা কিন্তু খুশী না হয়ে বেজার গলায় বলে, তা না বানিয়ে উপায় ? একটা মানুষ দেশঘর থেকে এসে হাপিত্যেশ হয়ে বসে রইল, আপনাদের আর দেখাই নাই !

এইমাত্র রেখার মার বুদ্ধির ওপর মনটা যেটুকু প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা উপে গেল লতিকার। উঃ, এইসব 'চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের বোলবোলাও এতো বেড়ে যাচ্ছে !

বলল, আচ্ছা যাও। বলগে আসছেন।

পরিতোষ তাড়াতাড়ি বলে, যাই।

লতিকা গলার স্বর আরো নামিয়ে বলল, গোড়া থেকেই একটু শক্ত হয়ো। ঘরে টি.ভি. দেখে আবার একবার দেখো জ্বলবে। ভাববেন ভাই খুব বড়লোক হয়ে উঠেছে। কলকাতার বাজারদরটা একটু তুলো। আর ওটা যে ইনস্টলমেন্টে কেনা হয়েছে সেটাও কথাচ্ছলে শুনিয়ে দিও। তোমার তো আবার একটু সুখে আরামে থাকতেও অপরাধ বোধ। যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছ। দেখি তো ভাবভঙ্গী !

পরিতোষ মনে মনে বলল, আমার তো সবদিকেই চোরদায়ে ধরা পড়া অপরাধ-বোধ। তা সে তো মনে মনে।

লতিকা ততক্ষণে কথা শেষ করেছে, দেশের জমিজমা বাগানপুকুর সব কিছুতেই তো তোমারও ভাগ আছে, তা সেসবের উপস্বত্ব কিছু পাচ্ছ ? সবটাই তো ওঁরা—

সে তো ঠিক।

বলে লতিকার বাক্যমালাকে আর এগোতে না দিয়ে নিজেই এগিয়ে যায় পরিতোষ।

ঢুকে এসে দেখল ভবতোষ জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছেন।

একটা আরাম বোধ হলো।

প্রথমেই এতক্ষণ অপেক্ষারত মানুষটার মুখোমুখি হতে হল না।

পিছন থেকে বলে উঠল, কী বড়দা, এ সময় ? কোন্ গাড়িতে ?

ভবতোষ মুখ ফেরালেন।

নিজস্ব দরাজ গলায় বলে উঠলেন, অবাক হয়ে গেছিস তো ? আরে ভারী সুবিধের একটা বাসসার্ভিস নতুন খুলেছে নয়নপুর থেকে। আসলে 'বাজারগাড়ি', তবে চেনাজানা দু'চারজনকে ফড়েরাই নিয়ে নেয়। ভোর পাঁচটায় ছাড়ে আর সাড়ে ছটায় একেবারে এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছয়।

ইতিমধ্যে পরিতোষ একটা প্রণামের মত করে ফেলেছে এবং ভবতোষ 'থাক থাক' বলে

একবার জাপটে ধরে ছেড়ে দিয়েছেন।

যদিও আগের স্বাস্থ্যের এবং শক্তির কিছুই নেই, তবু কাঠামোখানা তো আছে। জাপটানির সময় পরিতোষের মাথাটা ভবতোষের চিবুকের নীচে পর্যন্তও পৌছয়নি এবং শরীরটা মালুম পেয়েছে।

ছেড়ে দেবার পর কথা শেষ করলেন ভবতোষ বাসটা হয়ে পর্যন্তই মতলব করছিলাম একটা রবিবার দেখে একবার চলে আসি। ভোরে ভোরে ঠান্ডায় ঠান্ডায় —তো চিঠিফিটি তো দিস না সাতজন্মে, চিরকেলে 'গোঁভো'। আছিস কেমন বল ? কতদিন দেখা হয়নি।

পরিতোষ বলল, ওই চলে যাচ্ছে একরকম। তবু তো তোমরা আছো ভালো। কলকাতার যা অবস্থা !

আমরা আছি ভাল ?

আবার হা-হা করে হেসে ওঠেন ভবতোষ। বলেন, কথাটা বলেছিস ভাল ! সেই যে কবিতা আছে—'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—' এ তাই। তুই এই বলছিস আর আমরা ভাবি তবু তো তোরা আছিস ভাল।

ভবতোষ কিন্তু পরিতোষের সাজানো ঘর এবং টি.ভি.র দিকে না তাকিয়েই বললেন কথাটা।

বললেন, তোর ছেলেবেলায় দেখা সে নয়নপুর আর নেই রে ভাই ! নয়নপুর ঝামেটপুর বাদু সব ধ্বংসপড়া হয়ে গেছে। পলিটিক্স ঢুকে গ্রামগুলোকে শেষ করেছে, মানুষগুলোকে অমানুষ করে তুলেছে। সবাই শুধু ধান্ধার তালে আছে। একদিকে অপারেশন বর্গা একদিকে গ্রামপঞ্চায়েত, তার সঙ্গে পার্টির দলাদলি— শান্তি বলে আর কিছু নেই। দাদারা মদত দেয়, পুলিসে চোখ বুজে থাকে। সেই যে আমাদের দীনু কীর্তুনী গান গাইতো মনে আছে তোর, রাজার নন্দিনী প্যারী যা করিস তাই শোভা পায়, এও হয়েছে তাই।

পরিতোষ আর এর উত্তর কী দেবে ? তাই প্রসঙ্গ পালটায়। বলে, তোমার ইস্কুলের খবর কী ?

ইস্কুল ! হায় কপাল ! তা জানিস না বুঝি ? মাস ছয় হলো ষাট বছর বয়েসের ছুতোয় রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে তো। এখনকার আইনটাইন কেমন জানিস ? 'ভাল করতে জানি না মন্দ করতে জানি'। এদিকে জরাজীর্ণ স্কুলবিল্ডিংখানার দালান ধসে পড়ছে, বর্ষায় ক্লাসরুমে জল পড়েছে, কর্তাদের কাছে বলে বলে হদ্দ, তা সেদিকে কেয়ার নেই। আইন জারি হয়ে গেল, বুড়োহাবড়া মাস্টারদের আর রাখা চলবে না। খেদিয়ে দাও তাদের। ষাট বছর বয়েস হলে নাকি বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়। অথচ মনে কর আমাদের শ্যামবাবু ? সত্তর বছর পর্যন্ত দাপটে পড়িয়ে গেছেন ! কী সেই পড়ানো ! এখনো ভাবলে রোমাঞ্চ আসে। নয়নপুর হাই স্কুলের প্রথম থেকে পড়িয়েছেন। তখন তো আর এসব আইন ছিল না !

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হন ভবতোষ। বলতেই থাকেন, আরে বাবা দেশের ভোটদাতারা

যদি হঠাৎ আইন জারি করে বসে, 'বুড়োহাবড়াদের মন্ত্রী থাকা চলবে না'— তা হলে ? ক'জন টিকবি তোরা ? যত সব ঘাড়-নড়বড়ে বুড়োরাই তো গদি আঁকড়ে বসে আছে। শ্বাস উঠছে তবু নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। যেন তাঁদের আর বয়েস হলে বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যায় না, বাহাত্তুরে ধরে না। সবাই ভগবানের বরপুত্তর। হুঁঃ, আসল কথা হচ্ছে এসব আইন জারির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের জন্যে জায়গা খালি করা। যাক গে মরুক গে। দিন দিন অ্যাটমোসফিয়ার যা হয়ে উঠছিল মানমর্যাদা রেখে কাজ করা দায় হয়ে উঠছিল। তবে 'নয়নপুর হাই স্কুলে'র বারোটা বেজে গেছে। আরে বাবা, মাস্টারদের যদি ছেলেদের বিদ্যেসাধ্যি শিক্ষা না দিয়ে উদ্দেশ্য হয় শুধু 'পার্টি পলিটিক্স' শিক্ষা দেওয়া, তা হলে ?

ভবতোষ মাস্টারের বাচনভঙ্গীই এই। যদি কোনো প্রসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, তখন এমনভাবে কথা বলেন যেন প্রতিপক্ষ সামনে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সত্যি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার কানের মধ্যে কি এতো সব জোরালো কথাগুলো ঢুকছে ?

নাঃ ঢুকছে না। তার কানে একটু আগে শোনা যে খবরটা বুকে ঠাই করে হাতুড়ি বসিয়েছে, তার ধাক্কাতেই কান আর কাজ করছে না। মনের মধ্যে ঝনঝন করছে সেই হাতুড়ির শব্দটা, 'মাস ছয় আগে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে।'

তার মানে লতিকার অনুমানই সত্যি।

তা হলে ? কী ভাবে সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় !

এই সময় লতিকা ঘরে ঢুকল। এক হাতে চায়ের কাপ আর অন্য হাতে একটা রেকাবিতে দুটো গুলি রসগোল্লা আর দু'খানা বিস্কুট।

সেন্টারপীসের ওপর সাবধানে সেটি নামিয়ে রেখে, হেঁট হয়ে একটু প্রণাম করে বলল, ভাল আছেন তো বড়দা ?

প্রভাতসূর্যের মত মুখ।

পরিতোষ হাঁ করে তাকায় সেই মুখের দিকে।

লতিকা বলে চলে, রান্নাঘরে গ্যাস ফুরিয়ে বসে আছে, তাই চা আনতে এতো দেরি। তা আপনি তো বাজারের খাবার পছন্দ করেন না, তাই শুধু এই আনলাম। জনতা জ্বেলে কোনোমতে চায়ের জলটা হলো। এরপর উনুন জ্বেলে তবে রান্নাবান্না।

ভবতোষ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই তো বেশ !

'উনুন জ্বালা' যে একটা ভয়াবহ ঘটনা, সেটা তেমন অনুধাবন করতে পারলেন না বলেই বোধ হয় সে বিষয়ে কিছু বললেন না।

লতিকা আর এক ম্যাজিক দেখালো। পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অমায়িক গলায় বলল, ছুটি রয়েছে তো। একবার বাজার যাও দিকি, যদি ভাল ফ্রেশ মাছ পাও। বড়দা তো আবার ফ্রীজের মাছ তেমন–ইয়ে করেন না। ইলিশ পেলে তো খুবই ভাল হয়। অবিশ্যি ষাটের

নীচে কিলো হবে না। না হোক, নয়নপুরে বোধ হয় ইলিশটিলিশ পাওয়া যায় না। একদিন আমরাও না হয় বড়দার অনারে ইলিশ খেয়ে নেব।

ভবতোষ খুব ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, না না, আমার জন্যে এসব কিছু করতে হবে না। আমি মানে–

লতিকা বলে, না না। কতদিন পরে এলেন!

পরিতোষ কী স্বপ্ন দেখছে?

নিশ্চয় তাই। না হলে এখনো কেন শুনতে পাচ্ছে, আঃ! ইলিশের মাথা দিয়ে জম্পেস করে পুঁইশাক চচ্চড়ি! কতদিন যে খাওয়া হয়নি! বড়দা, আপনি ইলিশের মাথা দেওয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি ভালবাসেন না?

ও বাবা, বাসি না আবার! তো পাচ্ছি কোথায়? উঠোনে না হয় পুঁইয়ের বৃন্দাবন, কিন্তু ইলিশ? নামই ভুলে গেছি। নয়নপুরের যে কী হাল হয়েছে আজকাল যদি দেখতে!...তা পরিতোষ, তোদের এখানে তো পাওয়া যায় বাবা। বৌমা এতো ভালবাসেন!

বৌমা অভিমানভরে বলে ওঠেন, বলুন না আপনার ভাইকে। দিন দিন এতো কিপটে হয়ে যাচ্ছে!

পরিতোষ নিঃশ্বাস ফেলে, কিপটেই বটে! বাজারটি কী পড়েছে, তা যেন জানে না!...কী বলব বড়দা, কী ভাবে যে সংসার চালাতে হচ্ছে তা ভগবানই জানেন। এই যে তোমার বৌমার বড় সাধ মেটাতে ওই টি. ভি-টি আনা হয়েছে– তার জন্যে খেসারৎ দেওয়া হচ্ছে সবদিকে ছাঁটাই চালিয়ে। এর ওপর আবার একই সঙ্গে দুই ছেলের পরীক্ষার ফী দেবার দিন এসে পড়ল। কোথা থেকে যে দেব ভেবে কূল পাচ্ছি না!

বলতে বলতে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে পরিতোষ। যাক বাবা, লতিকা পরে বলতে পারবে না তুমি তেমন শক্ত হওনি।

ছেলেদের নাম শুনেই যেন সচকিত হল ভবতোষ। বলে ওঠেন, আরে তাই তো। কই তারা? তিনটের কাউকেই তো দেখছি না!

পরিতোষ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, এখনও বোধ হয় ওঠে নি–

অ্যাঁ! সে কী? এখনো ওঠে নি? এতোখানি বেলা! না না, ভেরি ব্যাড–এমন বদ অভ্যাস তো ভাল না।

পরিতোষ পরিস্থিতি সামাল দিতে বলে, মানে রবিবার পেয়েছে তো? তাছাড়া রাত জেগে পড়ে পড়ে ভোরের দিকে–

ভবতোষ দরাজ গলায় বললেন, তা হোক। বৌমা, ওদের উঠিয়ে দাওগে মা। বাবা বলতেন–রোদ ওঠার পর ঘুমোলে আয়ুক্ষয় হয়। তা পরীক্ষাটা কার কী?

ওই তো! শুভো ধ্রুব দুটোরই একই সঙ্গে মাধ্যমিক। শুভোটা একবার ক্লাসে উঠতে না পারায়–

লতিকা ফোঁস করে উঠে বলে, ক্লাসে উঠতে পারেনি ইচ্ছে করে নয়। অসুখের জন্যেই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই তো। আর টুকাইয়ের তো রোজই পরীক্ষা!

ও বাবা! তিনি আবার এতো বড় হয়েছেন। কই বৌমা, ডাকো ডাকো, দেখি। আমার আবার আজ একটু তাড়া আছে।

'তাড়া আছে!'

এ কী স্বর্গীয় ভাষা!

লতিকা তো ভাবলই, হয়তো পরিতোষও ভাবল—সারাদিনব্যাপী একটা 'সামাল দেওয়ার' খাটুনি থেকে রেহাই পাওয়ার আশ্বাসে। দিব্যচক্ষে তো দেখতেই পাচ্ছে, লতিকার বেজার মুখ, ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপ হাস্যরঞ্জিত মুখ, তার সঙ্গে বিরক্তিও। যেটা আগে আগে দেখেছে।

লতিকা এখন যে কোন ভাবভাবনায় এমন গায়েপড়া ভক্তিগদগদ হচ্ছে আর দরাজ হচ্ছে—সেও তো একটা রহস্য। মানে মানে চলে গেলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

এ তো আর লতিকার মিলিটারি মেজদাটি নয় যে, কদাচ কখনো এসে পড়লে বাড়িতে সাড়া পড়ে যাবে। লতিকা কৃতার্থম্মন্য হবে, ছেলেমেয়েরা মামার মহিমা কাহিনী শুনতে শুনতে বিগলিত হবে, আর রান্নাঘরে জামাই-আদরের সমারোহ পড়ে যাবে। এ পরিতোষের গাঁইয়া দাদা।

তবু ক্ষীণভাবে বলল পরিতোষ, তাড়া আছে মানে? না খেয়েই চলে যাবে নাকি?

ভবতোষ বিপন্ন গলায় বলেন, সেই তো মুশকিল। তোর বৌদির দিদিটি যে অবিরতই পত্রাঘাত করেন সাতজন্মে আসি না বলে। এবারে একেবারে বাক্যদত্ত করিয়ে নিয়েছেন কলকাতায় এলে যেন ওনার কাছে উঠি, খাওয়াদাওয়া করি। কথা না রাখলে আবার তোর বৌদির গোঁসা হবে। তাছাড়া ওই দিদির বাড়ি যাওয়ার একটি মোক্ষম কারণও আছে। তোর বৌদির একটি অর্ডার— কী রে? এতোক্ষণে জমিদারবাবুদের ঘুম ভাঙলো? ওরে বাবা, রাত জেগে পড়ার থেকে ভোরে উঠে পড়া অনেক ভাল। ভোরে মাথা পরিষ্কার থাকে। বলছিলাম তোদের মাকে, আমার বাবা বলতেন রোদ ওঠার পর ঘুমোলে আয়ুক্ষয় হয়। আরে মা-লক্ষ্মী, আয় আয়। কত লম্বা হয়ে গেছিস রে?

পরিতোষের দুই ছেলে এবং মেয়ে হাই তুলতে তুলতে এবং চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিতোষ প্রত্যাশা করছিল লতিকা বোধ হয় প্রণাম করতে ইসারা করবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হল না। দেখল লতিকাও একটা হাই তুলল। বোধ হয় স্বস্তির হাই।

ছেলেমেয়ে তিনটে কয়েক সেকেন্ড ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ উল্টোপাক খেয়ে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পায়জামার পা এবং ঝুলে থাকা দড়ির লটপটানি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই

অবস্থাতে কী আছাড় না খেয়ে নিরাপদে হেঁটে যেতে পারল !

লতিকা উঠে দাঁড়িয়ে আদুরে অভিযোগের গলায় বলল, বড়দা, তাহলে থাকছেন না তো ! আশা করছিলাম আপনার অনারে একদিন সবাই মিলে একটু ভালমন্দ খাওয়া যাবে। কপালে নেই। আর একটু চা খাবেন ?

ভবতোষ বললেন, না না, বার বার চা খাওয়া ধাতে সয় না।

লতিকা ভিতরে ঢুকে গেল বুক থেকে পাহাড় নামার অনুভূতি নিয়ে। এরপরও কি আর ভাইকে একা পেয়ে কিছু চেয়ে বসতে পারবেন ?

কিন্তু লতিকার হিসেবের ভুল। চেয়েই বসলেন ভবতোষ মাস্টার। ভাইয়ের হাতটা ধরে চাপা আবেগের গলায় বললেন, আমার একটা কথা রাখতে হবে পরি !

মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবির ভিতরঘরের বুকপকেট থেকে একগোছা নোট বার করে গভীর নির্বেদের গলায় বললেন, এটা রাখ্।

খান আষ্টেক একশো টাকার নোট।

জোর করে ধরিয়ে দিতে যান পরিতোষের হাতে।

হতভম্ব পরিতোষ হাঁ করে বলে, রাখবো মানে ?

এতক্ষণে আবেগরুদ্ধ ভবতোষ মাস্টার নিজের 'ফর্মে' চলে এসেছেন। সেই সহজতায় বলেন, রাখবি মানে 'রাখবি' ! এর আবার মানে কী রে ?

তবু পরিতোষ বোকাটে গলায় বলল, রেখে ! তারপর ?

হা-হা-হা।

তারপর আবার কী ? হা-হা ! খরচ করবি !

তোমার রাখা টাকাগুলো আমি খরচা করবো ?

কী আশ্চর্য ! তোমার টাকা আমার টাকা আবার কী রে পরি ? দরকারের সময় খরচা করবার জন্যেই তো টাকা !

এখন পরিতোষও ফর্মে আসে, টাকাটা তুমি আমায় দেবে বলে নিয়ে এসেছিলে ?

আহা, কী মুশকিল। আমি কি তাই বলেছি ? এসেছিলাম একটা ফালতু ব্যাপারের জন্যে, সে এমন কিছু না। তুই নে তো। চটপট তুলে ফেল্ বাবা। মানী বাবুদের চোখে পড়লে হয়তো মানের হানি হবে। জানি তো আজকালকার ছেলেপুলেকে।

ভবতোষ মাস্টার একটা ফালতু কাজের জন্যে আটশো টাকা নিয়ে কলকাতা সফরে এসেছেন ? কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ?

পরিতোষ ঠান্ডা গলায় বলে, সেই ফালতুটা কী তাই শুনি।

আরে বাবা, বলিস কেন। তোর বৌদির ওই দিদির বড় ছেলেটা বুঝি চাকরিবাকরি না পেয়ে একটা স্টীলের ফার্নিচারের দোকান করেছে। আর যেই সে খবর কানে গেছে তোর বৌদির, অমনি মনে পড়ে গেছে জীবনভোর নাকি ওঁর একটা লকারওলা স্টীলের আলমারির

সাধ। বোঝ ব্যাপার! একেই বলে কিনা,'শুনলো সাড়া তো নিলো পাড়া'। সারাজীবন মনে পড়লো না, যেই বোনপো দোকান দিল—আসলে খুব নাকি বুঝিয়েছে বিনালাভে দেবে, ভাল জিনিস দেবে। শুনিস কেন ওসব কথা। বরং মাসিকেই বেশী করে ফাঁসিতে লটকাবে। হুঁঃ, জানা আছে সব তো। ভাবলাম যাকগে, মরুকগে মেটাক সাধ। রিটায়ারের সময় গোটাকতক টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

পরিতোষ গম্ভীর গলায় বলে, আমায় মাপ করো বড়দা।

মাপ করব!

ভবতোষ আহত গলায় বলেন, তার মানে তুই আমায় পর ভাবিস!

না না।

পরিতোষের গলাটা হঠাৎ ভাঙা ভাঙা শোনায়, বৌদির চিরকালের সাধ—

ছাড় তো। মেয়েজাতটার সাধের কথা বাদ দে। সাধের যদি কোনো মাথা মুন্ডু থাকে। চিরকেলে ইস্কুলমাস্টারের বাড়ি, শুধু দুটো বুড়োবুড়ীর সংসার—কী এত রাজঐশ্বর্য আছে রে যে একটা লকারওলা স্টীলের আলমারি না হলে চলবে না! আমাদের যা কিছু সম্পদ সম্পত্তি তা এই আলমারির মধ্যে রাখা থাকে রে পরি, বুঝলি?

বলে সহাস্যে আপন বুকের ওপর একটি চাপড় মারেন ভবতোষ।

বড়দা!

আঃ আবার সেই বাচ্চাবেলার মতন বড়দা বড়দা! বলি তোর এই চারদিকে টানাটানির সময়,ছেলেদের পরীক্ষার কী লাগবে, দুশ্চিন্তায় সারা হচ্ছিস, এর থেকে তোর বৌদির স্টীলের আলমারিটাই জরুরী হল?

⌐

হাতিয়ার

যাক মিটে গেল এতদিনের লড়াই !

রায় বেরিয়ে গেল হাইকোর্ট থেকে।

থামল উকিল-অ্যাটর্নির কচ্‌কচি ! কম দিন তো চলেনি এই কচ্‌কচি। দশ দশটি বছর। কত কত টাকাই ওনাদের পেটে গেছে।

যে যার মক্কেলকে তাতিয়ে তাতিয়ে আর আশ্বাস দিয়ে দিয়ে তুচ্ছ একটা বসতবাড়ি ভাগের মামলাকে জজকোর্ট থেকে হাইকোর্টে তুলিয়েছিলেন তো ওঁরাই।

তা এটাই তো ওনাদের পেশার পবিত্রতম কর্তব্য। মক্কেলের জেদের অগ্নিকে অনির্বাণ রাখা। বিশেষ করে বিষয় সম্পত্তির শরিকি মামলায়। তা সে সম্পত্তি বড়ই হোক আর ছোটই হোক। সম্পত্তিটা তো আর ক্রমশঃ প্রধান থাকে না, 'বিষয়'টাই প্রধান হয়ে ওঠে। অর্থাৎ জেদটা।

হয়তো বা কখনো ভাগের বাড়ির কোথাও কোনোখানের দেওয়ালের একটা বে-আইনি জানলা ফোটানো নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে, দ্যাওর ভাজে, এমন কি ভাসুর ভাদ্রবৌয়েও দশ বিশ বছর মামলা চালিয়ে চলেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

মক্কেল যদি বা ভাবে, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ওনারা মনে মনে বলবেন, ছাড়বো কী বলুন ? আপনার পকেটে টাকা থাকতে থাকতে ছেড়ে দেব ?

বৈঠকখানা রোডের ঘোষ চৌধুরী বাড়ির রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী বনাম ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর বসতবাড়ি ভাগের মামলাটা এইভাবেই এই দশ দশটি বছরে এসে পৌঁছেছিল।

লড়াইয়ের শুরুর সময় দুপক্ষের আত্মজন কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে থেকেছে, কে হারে কে জেতে। কিন্তু লড়াইয়ের বিলম্বিত দীর্ঘ লয়ের ভঙ্গীতে, সে কৌতূহল ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়েছে। ক্রমে লোকে ভুলেই গেছল, কোথায় কোন রণাঙ্গনে একটা যুদ্ধ চলছে।

দৈনন্দিন জীবনে তো যুদ্ধরতদের কারো কোনো ত্রুটি দেখা যায় না। বিধবা রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী সকালে গাড়ি বার করিয়ে গরদের থান পরে নিত্য গঙ্গাস্নানে যান। কালীঘাটে, ঠনঠনে কালীতলায় পূজা চড়ান, আর বিয়ে হয়ে যাওয়া একমাত্র মেয়েটিকে বছরে সাত মাস শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে আদর সোহাগ করেন। ব্যাচিলার ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী সকালে গাড়ি বার করিয়ে বাপ-ঠাকুর্দার আমলের প্রেসটাকে দেখাশুনো করতে যায়, উকিল-অ্যাটর্নির সঙ্গে শলা পরামর্শ করে, আর সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিয়মিত গান-

বাজনার আসর বসায়। এটাই ওর নেশা।

বাপ যোগীন ঘোষ চৌধুরী মরার আগে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন এইভাবে—

তিন পুরুষের ওই প্রেসটার মালিকানা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর, আর সেই বাবদ খেসারতের নগদ টাকা প্রাপ্য হবে প্রথমপক্ষের পুত্রবধূ রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর। রাজেশ্বরীর চলে সুদের টাকায়, আর ইন্দ্রনাথের চলে প্রেসের আয়ে।

কিশোর বয়েসে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে একটা মোক্ষম ক্ষত ঘটে যাওয়ায় ইন্দ্রনাথ বিয়েয় গররাজী। বলেছিল, জানি, আমাদের সমাজে একটা খোঁড়া ন্যাংড়াকে বিয়ে করতেও মেয়ের অভাব হবে না, তবে, আমি ব্যাটা খুঁড়িয়ে ছাঁদনা তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। অতএব তার এই একক জীবন।

কিন্তু সুখের কোনো ঘাটতি ছিল না।

জাঁদরেল যোগীন ঘোষ চৌধুরীর কাছে বিধবা রাজেশ্বরী ছিল নম্র নতনয়না ভয়ে ভীত বৌমানুষ মাত্র। যদিও তখন তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। যোগীন ঘোষ চৌধুরীর সাধেই সাততাড়াতাড়ি হয়েছিল বিয়েটা।

আর ইন্দ্রনাথ ? সে দ্বিতীয়পক্ষের হলে কী হবে, সে তো শৈশবে মাতৃহীন। সে তো সাধ্যপক্ষে বাপের ছায়া মাড়াত না, যা কিছু বক্তব্য সমবয়সী সতাতো বৌদির কাছে।

বড়ো যোগীন ঘোষ চৌধুরীর নানাবিধ মুদ্রাদোষ, কৃপণতা, *সেকেলেপনা*—এই সব নিয়ে দ্যাওর ভাজে আড়ালে হাসাহাসি চলতো বিলক্ষণ।

কিন্তু পটভূমিতে আশ্চর্য বদল ঘটে গেল যোগীন ঘোষ চৌধুরীর মরার সঙ্গে সঙ্গেই।

এতদিনের সখ্যতার সম্পর্কের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে, সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গেল সাপে নেউলে।

প্রথম আগুনটা জ্বালল অবশ্য রাজেশ্বরী।

বলল, মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেছে, বাড়িতে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনার আড্ডা বন্ধ করতে হবে।

'ইয়ার' শব্দটা শুনেই অপর পক্ষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বলল, মাথার ওপর ছাতা কারো চিরকাল থাকে না। ধরে নিতে হবে এখন আমিই ছাতা। ওসব বন্ধটন্ধ হবে না।

ভাজ বলল, করতেই হবে বন্ধ। আমার অসুবিধে হচ্ছে।

দ্যাওর বলল, গান-বাজনায় যার অ্যালার্জি, সে কানে তুলো গুঁজে থাকুক গে।

শুধু কানে তুলো গুঁজলেই তো হবে না, বাড়ি থেকে বেরোতে আসতে আমার অসুবিধে। সর্বদা তোমার বৈঠকখানায় লোক। তুমি তাহলে বাড়ির পিছনের অংশে আড্ডা গাড়োগে। সামনেটায় আমি থাকি। সর্বদা চক্ষুশূল দৃশ্যটা দেখতে হবে না।

বাকযুদ্ধটা চলতে লাগল এই ভঙ্গীতে—

ইন্দ্রনাথ বলল, মামার বাড়ির আদর। উনি মেয়েছেলে, সদর বাড়িতে থাকবেন, আমি পুরুষসিংহ অন্দরে। আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটে, আসল অধিকার আমার ! উড়ে এসে জুড়ে বসে আবার ফুটানি। মেয়েমানুষের আবার হরঘড়ি এতো বেরোনোই বা কেন ?

বেরোব না তো কি হারেমে বসে থাকব ? তোমার ফুটানিও তো আর একজন উড়ে এসে জুড়ে বসার দৌলতে। তাও তিনি বেঁচে থাকলে মান্য সৌজন্যের দায় ছিল। এখন তোমায় মান্য করার দায় আমার কিসের ? চিরকাল সবাই জানে, জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ। সামনেটা আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

অত আহ্লাদে কাজ নেই ! আমি যেখানে আছি থাকব।

আমি একা বিধবা, আমাকে দেখাশুনো করার জন্যে মেয়ে জামাইকে কাছে রাখতে চাই। ডাক্তার জামাই, তার একটা চেম্বার খোলা দরকার। আর সেই জন্যেই আমার সামনেটা দরকার।

জামাই এসে দেখ-ভাল করবে ? ওই আনন্দেই থাকো ! কথায় বলে,'জন-জামাই-ভাগনা, তিন হয় না আপনা।' ব্যাটা মিত্তিরের পো, ঘোষ চৌধুরীদের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে আসবে ? ও সব চলবে না।

তুমি বললেই চলবে না ? বাড়িতে অধিকার নেই আমার ?

আছে। তোমার ওই রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের এলাকায় জামাইয়ের চেম্বার খুলে দাও গে। সদরটদর পাবে না।

রাজেশ্বরী বলল, আচ্ছা পাই কিনা দেখি।

নালিশ ঠুকল রাজেশ্বরী। বক্তব্য এই—

বাড়িতে সর্বদা ছোট কর্তার লোকজন, বিধবা রমণী, 'কালীগঙ্গা' করতে,সন্ধ্যায় পাঠবাড়ি যেতে, সদর তো ডিঙোতেই হয়। ঘোরতর অসুবিধে ঘটে সর্বদা বাজে লোকজনের উপস্থিতিতে। আর একা মহিলা, একজন অভিভাবক থাকা দরকার, জামাই-মেয়েই সেই অভিভাবকের কাজ করবে। আর যেহেতু জামাই ডাক্তার, সেইহেতু ইত্যাদি।

নালিশ ঠুকলে মামলায় নামতেই হবে। ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী তো আর সুড়সুড় করে সদর ছেড়ে দিয়ে অন্দরে ঢুকতে যাবে না ?

হলেও তার এই সব মামলা মোকদ্দমা দুচক্ষের বিষ !

একবার উকিল-অ্যাটর্নির হাতে গিয়ে পড়লে বিষ আর অমৃত। তখন ডুবেছি না ডুবতে আছি। দেখি পাতাল কতোদূর।

প্রথম প্রথম রাজেশ্বরীর তিন কূলের আত্মীয়জন রাজেশ্বরীকেই সমর্থন করেছে। বলেছে, সত্যিই তো মাথার ওপর গার্জেন নেই। বাড়িতে সর্বদা বাইরের লোকের হৈ-হল্লোড়ে অসুবিধে বৈকি। ন্যাংড়া ইন্দ্রনাথ যখন বাইরে ঘোরাফেরায় নেই, বাড়িতেই আড্ডা, তো থাকুক গিয়ে পিছনের অংশে। গ্রীষ্মের দিন রাস্তার ওপর খাড়া হয়ে থাকা দোতলার গাড়িবারান্দায় যতো

মজলিশ, রাজেশ্বরীকে বাড়িতে ঢুকতে বেরোতে ওদের চোখে পড়তে হয় এটা অন্যায়।

আবার ইন্দ্রনাথের দুই কুলের আত্মীয়জনেরা রাজেশ্বরীর অন্যায় আবদারের নিন্দাবাদ করেছে, এবং ইন্দ্রনাথকেই উৎসাহ জুগিয়েছে।

কিন্তু পরের গোয়ালে কে কতদিন ধোঁয়া দিতে পারে ?

ইন্দ্রনাথের তো আবার মাত্র দুটোই কুল। আসল কুলটাই শূন্যি। পুরুষের শ্বশুরকুলটাই তো আসল কুল যারা তার স্বার্থরক্ষায় যথার্থ যত্নবান।

তা সে সবই তো তামাদি কথা।

হাঁড়ি আলাদা হওয়া ? সেও তো তামাদি কথা।

মামলা ঠোকার পরই ইন্দ্রনাথের হিতৈষীরা (প্রধানতঃ পড়শীরা। তিন পুরুষের বসবাসের পাড়ায় পড়শীরাই জ্ঞাতি) গলা খাটো করে বলল, কী আশ্চর্য ! এখানে এক রান্নাঘর ! আর তার তদারকিতে বড় গিন্নী ! শত্রুতার বশে কী করে বসতে পারে ঠিক আছে ?

ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলেছিল, মানে ?

মানে আর কী বলব ? মেয়েমানুষ হচ্ছে কালনাগিনীর জাত, শত্রুতা সাধনে বিষ দিয়ে বসলে ?

কী ? বিষ ?

ইন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বলেছিল, পাগলের মত কথা বলবেন না। হাঁড়ি আবার এক কী ? ওনার তো কোন্ কাল থেকে হাঁড়ি আলাদা। একবেলা আলোচালের একপাক পিন্ডি গিলতেই তো দেখি।

বলি তোমার ব্যবস্থাটি তো ওরই হাতে ?

তো কার হাতে থাকবে শুনি ? নিজের হাতে নিতে যাব ?

'অবুঝে বোঝাব কত, বোঝ নাহি মানে—'

হিতৈষীরা বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু স্বয়ং আসামীই এসে বলে উঠল, বুঝলেন ছোটবাবু, কাল থেকে হাঁড়ি ভেন্ন।

তোমাকে আবার কে এইসব পরামর্শ দিতে এল ?

পরামর্শ দেবার লোকের অভাব ? দিকে দিকে তোমার শুভানুধ্যায়ী নেই ? তাদের প্রাণে ভয় নেই যদি সহজে শত্রু নিপাত করতে খাবারে বিষ দিই ?

ইন্দ্রনাথ বলল, তিল তিল করে না খেয়ে মরার থেকে বিষ খেয়ে এক দিনে মরাটাই সুবিধে ! কুমতলব ছাড়ো !

কিন্তু 'ছাড়ো' বললেই কি ছাড়া হয় ?

দু'পক্ষের সমর্থকরাই চোখ কপালে তুলছেন, গালে হাত দিচ্ছেন। বড় গিন্নী এখনো সাতখানা প্রাণ নিয়ে 'ছোটবাবু'কে কাঁটা মাছ দেওয়া হয়েছে দেখে বামুন ঠাকুরকে তুলো ধুনছেন !

এসব কী ? ন্যাকামি, না ঢং, না গভীরতর কোনো মতলব ?

ইন্দ্রনাথের দুকুলের মধ্যে পিতৃকুলে এক পিসি, আর মাতৃকুলে দুই মাসি। তাঁরা বড়বৌয়ের এমত আচরণ দেখে শিহরিত হয়ে বললেন, ইন্দ্র এখনো সাবধান হ।

আবার ওদিকে গিয়েও বলে এলেন, এখন আর তোমার ইন্দ্রর খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো কেন বৌমা ? ধাষ্টামো বৈ তো নয় !

অতএব পুরনো ঠাকুর চাকর রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর সমেত সবটাই ইন্দ্রনাথের ভাগে রইল, রাজেশ্বরী দোতলায় পূজোর ঘরের সামনের বারান্দায় নিজের ব্যবস্থা করে নিল।

মেয়ে-জামাই এলে ?

রাজেশ্বরী বলে, আমার এখানে তো মাছ-মাংসর পাট নেই। ইচ্ছে না হয়, সাবেকী হেঁসেলে কাকার এলাকায় খাও গে, আর ইচ্ছে না হয় তো হোটেল থেকে মাছ-ভাত আনিয়ে খাও !

মেয়ে বরাবর কাকার ন্যাওটা, এসব দেখেশুনে স্বস্তি পায় না, তবে ভবিষ্যতের রঙিন আশাটির লোভেই এতে সায় দিচ্ছে। বরের একটা ভালমত চেম্বার, আর নিজের সেই ভাগের সংসারের একখানা ঘরের মালিকানা থেকে ঠাকুর্দার আমলের এই বৃহৎ বনেদী বাড়ির মালিকানা।

মেয়ে ঢোঁক গিলে বলেছিল, কাকার কাছে খেতে যাব কোন্ লজ্জায় ?

লজ্জা হলে যাসনি।

কিন্তু লজ্জা নেই ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী নামের লোকটার। সে ভাইঝি এসেছে দেখলেই, অনায়াসে সকাল বেলা ডাক দেয়, এই বেবি, চা হয়েছে চলে আয়। তোর পুণ্যবতী মার ঘরে তো আর চায়ের সঙ্গে ডিমের পোচ্ ফ্রেঞ্চ টোস্ট্ পাবি না।

বাড়ি যতক্ষণ না ভাগ হচ্ছে ততক্ষণ সবই এক।

সেই সাবেকী খাবার ঘর, তাতে সেই যোগীন ঘোষ চৌধুরীর শখের গোলগড়নের মার্বেল পাথরের খাবার টেবিল পাতা ! আমিষাহার এখানে ব্যতীত আর কোথায় চলবে ?

পুরনো ঠাকুর রামলাল বলে, খুকি-জামাইবাবুর জন্যে ভাল করে মাছ মাংস আনি, টাকা বার করুন তো বৌমা ! জম্পেস করে সব রাঁধি।

রাজেশ্বরী টাকা বার করে দেন।

ইন্দ্রনাথ বলে, এই রামলাল, ওই টাকায় যদি বেবিদের জন্যে মাছ মাংস আনবি, তো তোর হাড়মাস আলাদা করবো। নিয়ে যা আমার কাছ থেকে টাকা।

রামলাল হৃষ্টচিত্তে দুজনের কাছ থেকেই হাতায়।

এবং রান্না হলেই, ওদের ঘরে গিয়ে হাঁক পাড়ে—খুকি, জামাইবাবুকে নিয়ে চলে এসো। ছোটদাবাবু খেতে বসতে পাচ্ছেন না।

সবদিনই যে জামাইবাবু তা নয়। খুকি একাও যায়, বছর দুইয়ের ছেলেটাকে নিয়ে।

অথচ মামলা চলতে থাকে জোর তলবে।

বাড়ি ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার সুরাহা হবার আশা নেই।

তবে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই রাজেশ্বরীরও।

তিনি অনায়াসে গলা তুলে বলেন, বেবি, খাবার আগে একটুখানি কিছু তোর কাকার সোহাগের কুকুরটাকে খাওয়াস।

শুনে বেবির মাথা টেবিলে ঠেকতে যায়।

ইন্দ্রনাথ বলে, শুনেছিস বেবি ! তোর মার কথাবার্তা আজকাল কী সভ্য হয়েছে ?

বেবি অধোবদনে বলে, কী করে যে এইরকম সব কথাবার্তা বলো তোমরা !

'আমরা' ? আমি আবার কী ? বল্ তোর গুরুভজা 'মা'টি।

ঝগড়া দুজনেই করেছ বাবা ! তা যাই বল।

তা করব না তো কি বড়গিন্নী যা হুকুম করবেন শিরোধার্য করতে হবে ? নে নে খা ! চিত্‌লের পেটিটা ফার্স্টক্লাস রেঁধেছে। জামাই ওবেলা আসবে তো ?

বলেছে তো !

ইন্দ্রনাথ হাঁক পাড়ে রামলাল, এবেলার সব রান্না জামাইবাবুর জন্যে ফ্রীজে রেখে দিস।

ও তো আগেই রেখেছি।

তা এসব তো সেই তামাদি হয়ে যাওয়া কালেরই কথা ! তারপর গঙ্গার কত জল গড়াল। দশ-দশটা বছর তো কম নয়।

রাজেশ্বরীর রগের চুলে পাক ধরল, ইন্দ্রনাথের মাথার মাঝখানটা প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে, টাকের ওপর পাতলা ছাউনি। বেবির আর দুটো ছেলে মেয়ে হয়েছে। আর—জামাই শাশুড়ীর মহিমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার পাড়ায় একটা আট বাই আট ঘর যোগাড় করে চেম্বার খুলে ফেলেছে।

প্রথম কোর্টে তো রাজেশ্বরীরই হার হয়েছিল।

সেই হারের খবরে ইন্দ্রনাথ গ্রামোফোন রেকর্ডে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই বাজাল, লোকজন ডেকে খাওয়াল। বেবি আর তার বরকেও নেমন্তন্ন করেছিল, তারা আসেনি।

বেবি মাকে গঞ্জনা দিয়ে বলল, শুধু শুধু লোক হাসানো। কাকার দাবিটাই ন্যায্য ছিল ! কাকা পুরুষমানুষ।

পুরুষ বলে মাথা কিনেছে ? জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ সেটাই কি অন্যায্য কথা ?

হেরে তো গেলে।

মায়ের হেরে যাওয়ায় মেয়েরও বরের কাছে কম মুখ হেঁট ! আবার কাকার কাছেও সেই সহজ ভাবটা আসছে না।

মা অম্লানবদনে বলল, হেরে গেলাম বলেই কি ছেড়ে দেব নাকি ? দাদারও দাদা আছে। নীচুকোর্ট থেকে হাইকোর্ট।

তা সেই 'দাদার দাদার' ছত্রছায়ার লড়ালড়ি চলেছিল এতোদিন। দু কোর্ট মিলিয়ে দশ বছর।

সেই রায় বেরোল।

রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী বনাম ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর সরিকী মামলায় রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীরই জিৎ!

এতদিনে আবার লোকের ঝিমোনো কৌতূহলটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। আজ সকলের চকিত দৃষ্টি ওবাড়ির দিকে।

শেষ পর্যন্ত তাহলে বড় গিন্নীই জিতলেন?

তাই তো দেখা যাচ্ছে, ড্যাং-ডেঙিয়ে বাজনা বাজিয়ে কালীতলায় পূজো দিতে যাচ্ছেন যখন!

কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলল, আহা এক্ষুনি লড়াই ফুরিয়ে গেল? সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গেল না?

ইন্দ্রটার সে ক্যাপাসিটি থাকলে গড়াতো!

যাই বলো দুঁদে মেয়ে বটে একখানা। যতদিন শ্বশুর ছিল, যেন ভিজে বেড়ালটি। শ্বশুর মরতেই পাখা গজাল। তক্ষুনি গুরুদীক্ষা, পাঠ কেত্তন শুনতে যাওয়া, নিত্যগঙ্গাস্নান। সবই শখ!

পুরনো পাড়া। তিন পুরুষের বাস। ভিতরে ভিতরে বেশীর ভাগ জনেরই সহানুভূতি ইন্দ্রনাথের দিকে, যতই হোক তারই বাপ-ঠাকুর্দার জিনিস। তারই অধিক অধিকার থাকার কথা। পাড়ার অনেকেই তার একদার খেলুড়ি।

এটা ঠিক ইন্দ্রর বড় ভাই চন্দ্রনাথ যখন বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে ঢুকেছিল, তখন ওই সামনের দিকটাই চন্দ্রনাথের জন্যে সাজানো গোছানো হয়েছিল।

ওই যে বড়রাস্তার উপর ফুটপাতের বুকে লোহার খুঁটি গেড়ে একখানা মার্বেলের মেজে-ওলা গাড়িবারান্দা বানিয়ে রেখে দিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। তাতে তো অধিক রাতে চন্দ্রনাথ চাঁদের আলোয় বৌ নিয়ে এসে বসেছে।

বাপ যোগীন ঘোষ চৌধুরী তখন দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নী আর নাবালক ছেলে নিয়ে অন্দরের ঘরে। সেও এমন কিছু খারাপ নয়। বড় বড় জানলা-দরজার বড় বড় ঘর। সাজানো গোছানো পরিপাটি। পিছনে বারান্দাও আছে, তবে সে বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের উঠোনে ঝিয়েদের বাসন মাজার দৃশ্য।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব ওলটপালট।

বেবি জন্মাবার আগেই 'বৌ-মরা-কপালে' যোগীন ঘোষ চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নীও সিঁথিতে সিঁদুর আর পায়ে আলতা নিয়ে কেটে পড়লেন। আর বেবি জন্মাবার কিছুদিন পরেই চন্দ্রনাথ কেটে পড়লেন। দুদিনের জ্বরে।

যোগীন ঘোষ চৌধুরী একদিন বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন বিধবা বৌটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তাপানে হাঁ করে তাকিয়ে।

পরদিনই ঘর বদল, জায়গা বদল।

পিতাপুত্র এই সামনের দিকের দখলদার হলেন, বিধবা সেই শিশুকন্যা আর দাসী নিয়ে অন্দরের দিকে। অনেকদিনও ছিলেন। সে বেবির বিয়ে হওয়াও দেখে গেছেন তিনি।

তদবধি ইন্দ্রনাথের এদিকেই সন্ধ্যেবেলায় নীচের তলার সামনের ঘরে গান বাজনার আড্ডা বসে। আর সকালে দুপুরে দোতলার মস্তবড় গাড়িবারান্দায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে তাসের আড্ডা।

খোঁড়া ন্যাংড়া মানুষ করবেই বা কী ?

পা থাকলে কি আর মাঠ ছেড়ে ঘরে বসতে আসতো ? ফুটবলই ছিল প্রাণ।

কিন্তু এমনি নির্লজ্জ মেয়েমানুষ রাজেশ্বরী যে, শ্বশুর মারা যেতেই সমবয়সী সতাতো দ্যায়োরটার সঙ্গে লড়াইতে নামল। পুরনো দাবিতে শক্ত হল, 'জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ'। দাবিটা ছিলই তো এক সময়।

এতো ভাব-ভালবাসা, এতো গলায় গলায়, বাপকে শ্বশুরকে লুকিয়ে দুজনে কুলপি বরফ খাওয়া, একটা বই দুজনে ধরে গোয়েন্দা গল্প পড়া, আর ডালমুট ভুট্টাপোড়া অখাদ্যের পর্যায়ে পড়ে কিনা তাই নিয়ে তর্ক সব বানের জলে ভেসে গেল !

ভাবই দেখেছে সবাই। হঠাৎ এই সাপে নেউলে। আশ্চয্যি বটে। ভেবেছে পাঁচজনে।

এবং অ্যাতোদিন ধরে মামলার রায় বেরোনোর অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে ওদের কথা ভাবতে ভুলেও গেছে।

আজ সকালে কালীতলায় ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

পাড়ার লোকেরা বলতে গেলে কেউই খুশী হল না। কেন হবে ? একটা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষের জয় আবার কে পছন্দ করে ? মেয়েমানুষেও করে না। তবে বেবি আর বেবির বর খুশী হল। বেবির এতদিনে বরের কাছে মুখ থাকলো।

বেবি চওড়া লালপাড় গরদ শাড়ি পরে, বর আর ছেলে-মেয়েকে সাজিয়ে নিয়ে মার সঙ্গে পূজো দিতে গেল।

জামাই বলল, মা এখানের ঠাকুর মশাইকে দিয়েই একটা শুভদিন দেখিয়ে রাখলে হতো না ?

মা যেন আকাশ থেকে পড়ল ! কিসের জন্যে শুভদিন ? তোমার ছেলের হাতে খড়ির ?

মেয়ে বলল, কী যে বল মা, কোন্ কাল থেকে ইস্কুল যাচ্ছে পিন্টু, হাতে খড়ি আবার কী ? ওর চেম্বার খোলার দিনের কথা বলছি।

ও মা ! তাই তো !

রাজেশ্বরী বলল, কিসের জন্যে কী। তা মনেও ছিল না। ছুটতে নেবেছি, ছুটে চলেছি।

থাক এখন এতো কী তাড়া। শুভদিন তো পালাচ্ছে না।

পূজো দিয়ে দু'হাত ভরে প্রসাদী নির্মাল্য আর প্রসাদ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন রাজেশ্বরী। গরদের থান ঘামে ভিজে। রুক্ষ চুলের ঢাল কাঁধ পিঠ ঢাকছে। বেবিরও অনেকটা তাই। বেশির মধ্যে ওর কপালের টিপ কপালে মাখামাখি।

গাড়ি থেকে নেমে ওপর দিকে তাকালেন রাজেশ্বরী।

না, বারান্দায় কেউ নেই।

সেকেলে ছাঁচের বাড়ি।

দালানের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। উঠে পড়লে ডাইনে সদর, বাঁয়ে অন্দর।

রাজেশ্বরী দু'হাতে প্রসাদ নিয়ে বাঁক নিলেন ডাইনে।

বেবি বলল, এক্ষুনি ওদিকে যাচ্ছ মা?

মা বলল, ও মা তোর কাকাকে মা কালীর প্রসাদ দিতে যাব না?

কাকাকে প্রসাদ দিতে যাবে!

বেবির মার ওপর রাগে গা জ্বলে গেল।

নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বলল, কাকাকে এ পূজোর প্রসাদ দিতে যাবার কী দরকার পড়ল মা?

মা বলল, প্রসাদ আবার এ পূজোর সে পূজোর কী রে বেবি? তাছাড়া আমার মানতের পূজোর প্রথম প্রসাদটা আর কাকে দেব বল্? শ্বশুর-কুলে আর কে আছে?

যাও নিয়ে যাও। ছুঁড়ে ফেলে দিলে খুব ভাল হবে তো?

ছুঁড়ে ফেলে দেবে? তো আয় দ্যাখ্ কী করে ফেলে।

রাজেশ্বরী ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন,ইন্দ্রনাথ তার বাজনাগুলো এক জায়গায় জড়ো করেছে।

রাজেশ্বরী বললেন, এ মা! এখন তুমি হাত ময়লা করে এই ধুলো ঘাঁটছ? নাও, হাঁ করো। মা কালীর প্রসাদ! এখন তো নির্ভয়ে খেতে পারো। আর তো বিষের ভয় নেই! মড়া মেরে খুনের দায়ে পড়তে যাব না তো!

ইন্দ্রনাথ নিঃশব্দে হাঁ করল।

রাজেশ্বরী বললেন, ঘরটা এমন লন্ডভন্ড করেছ যে?

ইন্দ্রনাথ বলল, চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সব খালি করে দিতে পারি।

তা এসব নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায়?

যে দিকটা আমার জন্যে ধার্য হয়েছে।

ও মা! শোনো কথা! সেদিকে আমার সব ছিষ্টি হট বলতে খালি করতে বসব?

কবে পারবে বলে দাও।

রাজেশ্বরী সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে জরিপ করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে,

খালি গায়ে তো দেখি না আর। চেহারার কী ছিবিই হয়েছে। মরে যাই ! রামলাল বোধ হয় দেশে জমিজমা বাগান-পুকুর করে ফেলল।

রামলালের কথা থাক। তোমার কথাটাই বল। কবে তোমার ওদিকটা খালি পাওয়া যাবে ?

রাজেশ্বরী গম্ভীরভাবে বললেন, যদি বলি কোনোদিনও না।

ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলল, হাইকোর্ট কি পুরো বাড়িটাই তোমার বলে রায় দিয়েছে ?

মুখে একটু ভয়েরও ছায়া।

রাজেশ্বরী ছুঁৎমার্গ ভুলে, ওঁর খাটের ওপর বসে পড়ে বলে ওঠেন, এই বুদ্ধি আর এই মুরোদ নিয়ে 'লড়কে লেঙ্গে' বলে আস্ফালন ! হায় ! হায় !

ইন্দ্রনাথ আস্তে বলল, নালিশ প্রথম আমি ঠুকতে যাইনি। তুমিই ঠুকেছিলে।

কেন ঠুকেছিলাম বল দিকি ?

রাজেশ্বরীর মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি।

ইন্দ্রনাথ অবজ্ঞার গলায় বলে, কেন আবার—অহঙ্কার ! ওইটিই তো আছে চিরকাল। ষোলোর ওপর আঠারো আনা।

তা বেশ। তাই-ই, অহঙ্কার ! বলি একটা কিছু সম্বল তো থাকবেই মানুষের। যার কিছু নেই, তার অহঙ্কারটাই সম্বল। তায় আবার একটা উড়ে এসে জুড়ে বসার। বলি একটা বিধবা মেয়েমানুষের মাথাটা খাড়া করে দাঁড়াতে পায়ের তলায় একটা শক্ত মাটি দরকার কিনা ? ওই মামলাটাই হয়েছিল রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর পায়ের তলার মাটি। ওটি না ধরলে, তোমার এই বেহেড সংসারে সারাদিন পূজোর ঘরে পড়ে থাকলেও, কেউ তাকে এমন মান্যসমীহ করতো ? এমন পূজ্যি করতো ? ও তুমি বুঝবে না হে। তবে এখন আমার এই সাফ কথা, এখন আর ঠাঁই নাড়ানাড়ি পোষাবে না আমার। দীর্ঘকাল যাবৎ যেখানে শেকড় গেড়ে গেছে সেখানে থেকে নিজেকে উঠিয়ে এনে নতুন করে শেকড় নামাই এতো শক্তি নেই। যে যেখানে আছি সে সেখানে থাকবো,ব্যাস !

যে যেখানে আছি, তাই থাকবো ?

ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠে চড়াগলায় বলে, আর আমি যদি তা না মানি ?

রাজেশ্বরী রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে একটু হেসে বলে, তাহলে তুমি আবার বেআইনী দখলকারিণী রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর নামে উচ্ছেদের নালিশ ঠোকো গে। তাতে আরও পাঁচটা বছর কেটে যাবে।

ইন্দ্রনাথ আবার বসে পড়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, তাহলে এতো দিনের এতো কান্ড, সব মিথ্যে ?

মিথ্যে কেন ? জেতাটা বুঝি কিছু নয় ? লড়াইয়ের মজাটা কিছু নয় ?

আর তোমার জামাইয়ের চেম্বার ?

জামাইয়ের চেম্বার ! ওটা আবার সত্যি নাকি ! ও তো মামলার একটা হাতিয়ার ! খলের তো একটা ছল চাই ?

হেসে ওঠেন জোর গলায়।

জামাইকে এনে ভিটেয় প্রতিষ্ঠা করব ? এতো আহাম্মক ভাবো আমায় ? তাহলে আমার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে ?

❑

ভয়

দ্রবময়ীর নাতি-নাতনীরা শুনিলে হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবে যে, কোনো একদিন দ্রবময়ীরও আঠারো বছর বয়স ছিল, কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাও ঘটিয়াছিল বৈকি। অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মার্কা-মারা সেই বৎসরটি।

সেবারের বড়ো ভূমিকম্পে দাদাশ্বশুরের আমলের ঠাকুরদালানটা চৌচির হইয়া গেল, আর—একদিনের জ্বরে মারা গেল দ্রবময়ীর প্রথম ছেলে কার্ত্তিক।...তিন বছরের ছেলে—চাঁদের মতো ছেলে। আগের দিনও লাল বার্নিস করা ছোট্ট পীঁড়িখানায় বসিয়া 'বাঘ আর কাকে'র গল্প শুনিতে শুনিতে ভাত খাইয়াছে—পরদিন আর সারা পৃথিবীতে চিহ্নমাত্র রহিল না তার।

কেউ বলিল—'ডাইনের নজর', কেউ বলিল—'হাওয়া-বাতাস', কেউ বলিল—'চোরা সান্নিপাতিক'। কারণটা লইয়া তর্কাতর্কি হইল বিস্তর, সময়ে ধরা পড়িলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা হইত, এবং এই সব ব্যাপারে কোন্ কোন্ জায়গার মাদুলী, কবচ ও জলপড়া কতদূর অব্যর্থ, উদাহরণ-সম্বলিত সেই সব আলোচনা চলিতে লাগিল কিছুদিন, শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই পাড়িয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইল...হইতে পারিল না শুধু দ্রবময়ী।

অহরহ সেই চিন্তা পাগল করিয়া তুলিল দ্রবময়ীকে।

লাল রঙের সেই ছোট্ট পীঁড়িখানা যে বরাবরের জন্য দালানের দেয়ালে ঠেসানো পড়িয়া থাকিবে—আর কোনোদিন পাতা হইবে না, একথা দ্রবময়ীকে বিশ্বাস করানো কঠিন।...কাঁদে না, চেঁচায় না, বোকার মতো কেবল ছেলে খুঁজিয়া বেড়ায়। পুরনো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ীখানায় সারাদিন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।...সকালবেলা জামা জুতো আর টুপি হাতে গোয়ালের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির হয়, যাকে সামনে পায় ডাকিয়া ডাকিয়া উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করে—"কাতুকে দেখেছ ? দেখ না বাইরে—বাছুরের সঙ্গে খেলতে খেলতে কোন্‌দিকে গেছে বুঝি !"...সন্ধ্যা হইতেই রান্নাঘরের সামনে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলে—"বামুন মা, ভাত কি নামেনি ? কাতু ঘুমিয়ে পড়বে— !" রাত্রে নারাণ শুইবার আগে ঘরের দরজায় খিল লাগাইতে গেলে দ্রবময়ী অবাক হইয়া বলে—"ওকি, খিল দিচ্ছো যে ? কাতু ওঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, পিসিমা দিয়ে যান আগে !"

শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীর দল প্রথমে বলিলেন— 'আহা', পরে বলিতে লাগিলেন 'অনাসৃষ্টি'। অল্প বয়সে—শিশু সন্তানের শোক সহিতে হয় না এমন ভাগ্যবতী বিরল বৈকি।

কিন্তু দ্রবময়ীর মতো এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার কবে কে করিয়াছে ?

শ্বশুর-সম্বন্ধীয়েরা উৎকণ্ঠিত হইয়া কবিরাজ ডাকিলেন, দ্রবময়ীকে ঔষধ খাওয়ানো গেল না।...অসুখ হইয়াছে 'কাতু'র, আর ঔষধ খাইবে দ্রবময়ী, এ আবার কি উল্টোপাল্টা কথা। দ্রবময়ী প্রথমে হাসিল, পরে কাঁদো-কাঁদো হইয়া সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিল— কবরেজ মশাইকে বল না কাতুকে একটু ভালো ওষুধ দিতে—ছেলেটা আজ কতোদিন অসুখে পড়ে আছে— উপোস করে করে সারা হয়ে গেল যে!

বিব্রত নারাণ যখন নিজের মনঃকষ্ট ভুলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার উপায় ভাবিয়া ভাবিয়া হয়রাণ হইয়া যাইতেছে...অথচ অনেক গুরুজনদের মাঝখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তখন হঠাৎ একদিন দ্রবময়ী এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যেটা আশঙ্কার চাইতেও বেশী।

রাত্রে সকলে ঘুমানোর অবকাশে যে আলিশা-ভাঙা খোলা-ছাদে ছেলে খুঁজিতে যাইবে দ্রবময়ী, সে কথা কোনদিন কেউ ভাবিয়া রাখে নাই।...

আশ্চর্য্য! ছাদ হইতে বাগানে পড়িয়া গিয়াও মারা গেল না দ্রবময়ী? শুধু অজ্ঞান হইয়া গেল। শুধু সারাগায়ের কালসিটে দাগগুলো ফর্সা চামড়ার উপর মনে হইল বড় বেশী প্রখর, আর কপাল ফাটিয়া যাওয়ায় জমাট রক্তের উপর এলোচুলগুলো পড়িয়া চাপড়া বাঁধিয়া থাকার জন্য মুখটা দেখাইল বীভৎস!

ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগিল...এবং কেন কে জানে সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে লাগিল দ্রবময়ী।

সে শীতকালের পর অনেক শীত অনেক বসন্ত গেল। কোন্ বিস্মৃতির তলায় তলাইয়া গেল কাতু। পর পর আরো দুইটি ছেলের পর মেয়ে জন্মাইয়াছে — 'শৈলি'।

শৈলবালা।—তিন ছেলের পর মেয়ে জন্মাইলে যে-নাম রাখা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে মেয়েই বা সহিল কই? চার বছর বয়সে — দ্রবময়ী যখন নিজের হাতের রুলি ভাঙিয়া সাধ করিয়া নূতন প্যাটার্ণের হার গড়াইয়া দিয়াছে মেয়েকে, আর রঙের মানান করিয়া কিনিয়া দিয়াছে লাল ডুরে শাড়ী, সেই সময়— 'মায়ের অনুগ্রহে'র ভার সহিতে না পারিয়া মারা গেল মেয়েটা।

দ্রবময়ী এবার আর পাগল হইল না, শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের রোগ জন্মাইয়া ফেলিল। মেয়ের কাপড় জামা খেলনা পুতুলগুলা বাক্সে তুলিয়া রাখিবে, না পাড়ায় বিলাইয়া দিবে, চোখছাড়া করিয়া ফেলিয়া দিবে, না প্রত্যহ বুকে চাপিয়া চোখের জল ফেলিবে, এসব হিসাব করিতে করিতেই মাসছয়েক গেল।...তারপর আর হিসাব করিবার অবসর থাকিল না— কোলে আসিল সুধালতা।

কালো মেয়ে।

তা' হোক, বাঁচিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। সুন্দরে আর রুচি নাই। কালো মেয়েকে লইয়াই রূপসী মেয়ের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিল দ্রবময়ী।

আশ্চর্য্য ভাগ্য !

সুন্দর ছেলে কোলে আসে যেন দ্রবময়ীকে ব্যঙ্গ করিতে। 'আনন্দ' আর 'গোবিন্দ' জীবিত দু'টি ছেলেই রীতিমত কালো, অথচ কাতু আর শৈলির মতো রূপ লইয়া যে ছেলে আসিল—সুধালতার পরে, সে ছেলেকেও রাখা গেল না।

কিন্তু গাছের ফলই কি সবগুলিই থাকে ?

হয়তো দ্রবময়ীর ব্যবহারে সত্যই সামঞ্জস্যের অভাব।

বত্রিশ বছর বয়সে—ছ'মাসের ছেলেটার জন্য এমন বাড়াবাড়িটাই করিল দ্রবময়ী যে, শোক ভুলিয়া ধমক দিতে হইল নারাণকে। ধমকটা শুনিতে রূঢ়, কিন্তু মেদবহুল বিরাট দেহটা লইয়া যে দ্রবময়ী এলোপাথাড়ি আছড়া-আছড়ি করিবে, আর ভিন্ন-পাড়ার লোক শুনিতে পায় এমন মর্ম্মান্তিক স্বরে বিলাপ করিয়া অহরহ নিজের মরণ কামনা করিবে এ দৃশ্যও যে অসহ্য।

ধমক খাইয়া নয় বটে—তবে কালক্রমে আবার সহজ হইতে হইল বৈকি। কথায় বলে—'কালের বাড়া চিকিৎসক নাই'।...সংসারের উপর ঔদাসীন্য, স্বামীর উপর বিরক্তি, জীবিত ছেলেমেয়ে তিনটির উপর অবহেলা, সব সহিয়া গিয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে মাস কতক লাগিল।

তাহার পর দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন সমারোহে।

আরও চারটি ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে, পৃথিবীর আলো-বাতাসের ভাগীদার হইয়া টিকিয়াও আছে তারা। সব ক'টিকে লইয়া উৎসব-আনন্দের আর অবধি ছিল না। ভগবানের দয়ায় অর্থের অভাবও ঘটে নাই।

চার ছেলে...তিন মেয়ে...তাদের ভাত পৈতে বিয়ে...তত্ত্বতাবাস নূতন জামাই, কচি বৌ...আবার তাদের ছেলেপুলে নাতিনাতনী...নিঃশ্বাস ফেলিবার আর অবকাশ ছিল না।

একটা বিরাট কর্ম্মচক্র যেন সুদীর্ঘকাল দুরন্তবেগে পাক খাওয়াইয়া মারিয়াছে দ্রবময়ীকে।

ঝড়-ঝাপটা ?

কিছু কিছু আসিয়াছে বৈকি।

চক্রবৃদ্ধি হারে বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিলে ঝড়তি-পড়তি কিছু ফেলা যাইবে না ? কিন্তু দ্রবময়ীর বুক ছিল তাজা। সাতটি সন্তান তাঁহার, প্রত্যেকেই গড়িয়া তুলিয়াছে এক একটি সমৃদ্ধ সংসার। দিনে দিনে বাড়িয়াছে জীবনের সঞ্চয়।

বাড়িয়া উঠিয়াছে সহজ সাংসারিক জ্ঞান।

ছোট ছেলের বৌ ইরাবতী ভ্রাতৃবিয়োগের ছুতায় সাতদিন কাজকর্ম্ম ত্যাগ দিয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া কম অসন্তুষ্ট হন নাই দ্রবময়ী। ব্যাপারটা যে 'আদিখ্যেতা' ছাড়া আর কিছুই নয়, পরোক্ষে সে-মন্তব্য প্রকাশ করিতেও লজ্জিত হন নাই।...কষ্টই বা কিসের ? ইরাবতীর যে সবই অনাসৃষ্টি। হ্যাঁ, ভাইয়ের মতো ভাই হইলেও বা কথা ছিল—তিন বছরের একটা একফোঁটা ছেলে, তার জন্যে এতো ? এই যে দ্রবময়ীর—মা বাপ ভাই বোন কত [illegible] যাঁর

বাড়া নাই স্বামী, তিনিই চলিয়া গেলেন—কই দ্রবময়ী সংসার ভাসাইয়া পড়িয়া থাকিয়াছেন ক'দিন !

জীবনের সূর্য্য তখন মধ্যাহ্ন-গগনে।

সুধালতার মেয়ের বিবাহের কথা চলিতেছে—শ্বশুর-শাশুড়ী নাই তাহার, তাই সকল ভার তুলিয়া দিয়াছে মার ঘাড়ে।...বড়ো ছেলে আনন্দ পুরনো বাড়ী ভাঙিয়া বিরাট বাড়ী ফাঁদিয়াছে তারও সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দ্রবময়ীর।...ছোট মেয়ে পদ্মলতা দুইবার যমজ সন্তান প্রসব করিয়া স্বাস্থ্য-ভঙ্গের অজুহাতে মায়ের কাছে তো আছেই, তা' ছাড়া—ছেলেমেয়েগুলিকে পর্য্যন্ত মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে, ফিরিয়াও চাহে না।..

গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি, স্নেহলতা—তাদের জীবনেও কতো প্রয়োজন, কতো আহ্বান। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না দ্রবময়ীর। জমার ঘরের অঙ্ক এত বেশী বলিয়াই হয়তো তুচ্ছ ক্ষতিকে 'তুচ্ছ' বলিয়া অবহেলা করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

কিন্তু বিধাতা-পুরুষের বিদ্যালয়ে নাকি পরীক্ষার শেষ নাই। যখন তখন আছাড় দিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন কতোটা মজবুৎ হইল। তাই ষাট বছর বয়সে আচমকা এক আছাড় খাইলেন দ্রবময়ী।

গৃহপ্রবেশের আগের দিন, সমস্ত আয়োজন যখন সমাপ্ত, আনন্দ বিনা নোটিশে হার্টফেল করিয়া বসিল ! পরীক্ষাটা মারাত্মক, উত্তীর্ণ হওয়া বড়ো সহজ নয়, দ্রবময়ীও পরীক্ষায় ফেল করিলেন।

সেই প্রচণ্ড শোকের ইতিবৃত্ত এখন হয়তো সকলে ভুলিয়াছে, কিন্তু তখন যেন বাড়ীর আর সকলের কাছে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিলেন দ্রবময়ী।

প্রচণ্ড শোক ! উন্মাদ-শোক !

স্বামী-শোকে এর সিকিও কাতর হন নাই দ্রবময়ী। হইবেন কি, ছেলেমেয়ের মুখ তবে চাহিবে কে ? মায়ের কাছেই যে তাদের ষোলো আনা আশ্রয়। কিন্তু—আনন্দ ? মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে মনে তো জানা ছিল আনন্দ তাঁর সকলের বাড়া। সবচেয়ে দামী।

কেবলমাত্র আর্থিক মূল্যই কি ?

তা' নয়। শুধু উপার্জ্জনশীল হইলেই হয় না।

এমন আত্মভোলা সদাশিব আর কে আছে ? চার ভাইয়ের সংসারটাকে চার-ভাইয়ের দায়িত্ব না ভাবিয়া মায়ের সংসার বোধে সকল দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলিয়া লইবার মতো বোকাই বা আছে কে ? আর কে দিবে সংসারসুদ্ধ সকলের সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধার জোগান ? কে পোহাইবে দ্রবময়ীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার নানান ঝঞ্ঝাট ?

আনন্দ গেলে দ্রবময়ীর আশ্রয় কোথায় ?

কিন্তু আশ্রয় ভাঙাই যে বিধাতাপুরুষের খেলা। তাই দ্রবময়ী রহিলেন, গেল আনন্দ···যে ছেলে 'কাত্তার' শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছিল। যদিই বা গেল এতো বড় শক্তিশেল রাখিয়া যাইতে

হয় যার জন্য ? যে বাড়ীর স্বপ্নে দিনে রাত্রে ঘুম ছিল না তা'র, সে বাড়ীতে একবার পা ফেলিবারও অবকাশ হইল না ?...আনন্দর স্বপ্নে-গড়া বাড়ীতে 'গৃহপ্রবেশ' করিবেন দ্রবময়ী ?

সহজে অবশ্য যান নাই। প্রথমটা দ্রবময়ীর জেদ ভাঙানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সে-বাড়ীর মাটি মাড়াইবেন না তিনি। অন্নজল ত্যাগ করিয়া দিয়া নিজেই মাটি হইবেন। ছেলেরা বৌরা আর মেয়েরা জীবন্ত মানুষটাকে 'হত্যা' হইতে দেখিয়া অনুনয়-বিনয় উপদেশ অশ্রুজলের স্রোত বহাইল—দ্রবময়ী অটল।

বাঁচিয়া থাকার গভীর লজ্জায় মৃত্যুকে নিকট করিবার এই এক সহজ কৌশল আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন দ্রবময়ী। সে-যাত্রা রক্ষা করিলেন আসিয়া গুরুদেব। বুদ্ধিটা খাটাইল গোবিন্দর বৌ, শান্তিপুর হইতে গুরুদেবকে আনাইবার।

গুরুদেবের অনুরোধে ভাঙিতে হইল অনশন।

তবে সদ্য সদ্য আর গৃহপ্রবেশ করিলেন না, বাহির হইলেন তীর্থ-পর্যটনে। সাতমাস পরে দৈহিক মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া যখন ফিরিলেন তখন আর 'আনন্দ-ভবনে' প্রবেশের বাধা ছিল না মনের মধ্যে।

সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা।

পরের কুড়ি বৎসর ?

ভাবিতে গেলে আর 'খেই' পান না দ্রবময়ী।

কে যে কোন ফাঁক দিয়া টপাটপ সরিয়া পড়িতেছে হিসাব করাই দায়। সুধালতাকে সিঁদুর আলতা ফুলের-তোড়া দিয়া সাজাইয়া আসিয়া হাঁপ ফেলিতে না ফেলিতে ডাক পড়িল স্নেহলতার জন্য।

পদ্মলতার বাড়ীও কবে যেন একদিন ডাক পড়িয়াছিল না ? রাত্রির অন্ধকারে—শীতে শরীর হিম হইয়া যাইতেছে...নির্জ্জন পথের উপর দিয়া বিদ্যুৎবেগে গাড়ী ছুটিতেছে...শীত করিলেই একথা মনে পড়ে দ্রবময়ীর। আর মনে পড়ে বেশী রাত্রে গাড়ী চড়িলে।

কিন্তু পদ্মলতা আবার সাজিল কখন ? তার নিজের সাজগুলাই বরং সকলে কাড়িয়া লইল যে ! দ্রবময়ীর সামনেই তো ! মমতা করিয়া আড়াল করে নাই কেউ ! সত্তর বছর বয়সেও লোহার মতো মজবুৎ শরীর লইয়া যদি সারারাত সোজা বসিয়া থাকেন দ্রবময়ী, কে আর মমতা করিবে তাঁকে ?

দ্রবময়ীর হার্ট এতো মজবুৎ, অথচ এতো পল্‌কা তাঁর ছেলেদের ! বারে বারে ফেলই করিবে তা'রা ? মুকুন্দর কী দরকার ছিল ঘুমের মধ্যে একেবারে ঘুমাইয়া থাকিবার ?

সাল তারিখ আর মনে থাকে না দ্রবময়ীর। আখ চিবাইয়া খাইবার মতো দাঁতের জোর থাকিলেও স্মৃতিশক্তিটা কেমন যেন ঘোলা হইয়া যাইতেছে।

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গোবিন্দও গেছে। শিবরাত্রের সলতের মতো টিম্ টিম্ করিতেছে শুধু মুরারী। মুরারীর বৌ এদিকটা মাড়ায় না। গোবিন্দর বৌ যখন তখন নিরাভরণ হাত দুইখানা

শাশুড়ীর মুখের সামনে নাড়িয়া বলে— ঢের তো হল—আর কেন ? এখনো ওটুকু থাকতে থাকতে গেলে তবু আগুনটা পেতেন, তা' যা হাল ওর শরীরের দেখছি—সে আর হয়েছে ! বলি এখনো চালকড়াই ভাজা খান কোন সাহসে মা ? ধন্যবাদ দিই বাবা লোভকে ! তাই নয় আছে, হজমশক্তিটাও কি ক্ষয় হয় নি ?

স্বভাব-রুগ্ন গোবিন্দর উপার্জ্জন বরাবরই কম ছিল, তাই গোবিন্দর বৌকে চিরদিনই বেশ একটু 'হেনস্থা' করিয়া আসিয়াছেন দ্রবময়ী, হয়তো তারই শোধ নেয় সে এতদিনে।

দ্রবময়ী কখনো চুপ করিয়া থাকেন, কখনো অতীত অভ্যাসের অনুভূতিতে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন—এতো বড়ো কথা তুমি আমায় বলো সেজবৌমা ? বলি তোমারই বা এতো আস্পর্দ্ধা কিসের ?

—আমার আবার আস্পর্দ্ধা ! আমি তো চিরদিনই কেনা বাঁদী হয়ে রইলাম। তবু হক্ কথা না বললেও বাঁচি না। ছোট ঠাকুরপোর প্রাণটুকু থাকতে থাকতেও আপনার যাওয়া উচিত।

উচিত !

দ্রবময়ী অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকেন সেজবৌমার মুখ ঘুরাইয়া গমনভঙ্গীর পানে। এর মধ্যে আবার উচিত অনুচিতের প্রশ্নও আছে নাকি ? দ্রবময়ী কি নিজের ইচ্ছায় আছেন ?

মানুষ কি তাই থাকে ?

যাহারা চলিয়া গেছে তাহারাই কি উচিত অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্বইচ্ছায় গিয়াছে ? সমস্ত প্রিয়বস্তুগুলি একে একে যমের হাতে তুলিয়া দিতে সমস্ত প্রাণ ছিঁড়িয়া পড়ে নাই ? সে দুর্দ্দান্ত জ্বালা কে বুঝিবে ?

বুঝাইবার উপায়ও এখন আর নাই।

অন্নজল ত্যাগ দিয়া মৃত্যু পণ করিয়া পড়িয়া থাকার ক্ষমতা কোথায় ? একাদশী তিথি আসার উদ্দেশেই যে হৃৎকম্প হইতে থাকে এখন। যাহারা ছাড়িয়া গেছে তাহাদের নাম ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চীৎকার করিবার শক্তিটুকুও গিয়াছে।

বাড়িয়াছে শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ।

আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই কারণে অকারণে চোখে জল আসিয়া পড়ে। গোবিন্দর বৌ যখন বড়ো একখানা পাথরের থালায় ষোড়শোপচার বহিয়া আনিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—"নিন উঠুন। বেলা দশটা না বাজতেই চোদ্দবার রান্নাঘরে পেয়াদা ছুটছে ! বাবাঃ ! একা হাতে কুটনো বাটনা ছিষ্টি করে নিয়ে এর আগে কে ভাত দিতে পারে দিক এসে ! মরবো না, দেখবো সবই—", তখন ভাতের থালাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিবার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করিতে হয় কেলেঙ্কারির ভয়েও নয়, চক্ষুলজ্জাতেও নয়, নিতান্তই ক্ষুধার তাড়নায়।

থালার সামনে বসিয়া পড়িয়া তাই বোকার মতো ফ্যালফেলে হাসি হাসিয়া বলেন—কে

তাগাদা দিতে গেল কে ? উর্মি বুঝি ? না গৌরী ? ছুঁড়িদের আর তর সয় না— যেন ভাত খেতে দু'দণ্ড দেরী হলে 'দিদা' মরে যাবে ! নিজেই যে তাগাদা পাঠাইয়াছিলেন সেটা আর প্রকাশ করেন না।

—হ্যাঁ মরার ভয়েই সবাই কাঁটা হয়ে আছে ! বলিয়া মুচকি হাসি হাসে গোবিন্দর বৌ।

দ্রবময়ীর মৃত্যু-শোকে যে কেউ কাঁদিয়া মাটি ভিজাইবে এ আশা অবশ্য দ্রবময়ীর নাই, কিন্তু শোকের নামটাও যে হাস্যকর, সেকথা এতো নির্লজ্জভাবে মনে পড়াইয়া দিবার কি আবশ্যক আছে ?

সংসারের বিশেষ কিছুই করিবার সামর্থ্য দ্রবময়ীর নাই বটে, তবু একেবারে সংসারের বাহিরে চলিয়া যাইতেও কি ভালো লাগে। কিন্তু কেউ কিছু করিতে দেয় না, কোনো কাজে হাত দিতে গেলেই এমন 'হাঁ হাঁ' করিয়া পড়ে বৌরা, যেন মনে হয় কি বুঝি অকর্মই করিয়া বসিলেন দ্রবময়ী।

'কষ্ট হইবে !' 'কষ্ট হইবে !' কষ্টের ভাবনায় তো ঘুম নাই মহারাণীদের। সব ছল। দ্রবময়ীকে আর সংসার করিতে দিবে না এই মতলব।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মুরারির কাছে গিয়া বসেন।

কাজকর্ম আর কিছুই করে না সে, ডাক্তারে নাকি অহোরাত্র বিশ্রাম করিতে বলিয়াছে তাকে। কাছে আসিয়া বসিতেই মুরারিও ব্যস্ত হয়, আর ইরাবতী মুখ ঘুরাইয়া উঠিয়া যায়।...কুটুম্বের মতো সামান্য এক-আধটা কুশল প্রশ্ন করিয়া উঠিয়া যাইতে হয় দ্রবময়ীকে—মনের ইচ্ছাটা আর ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। ইচ্ছাটা আর কিছু নয়—মুরারিকে দেখিতে যে-সব চকচকে ঝকঝকে ডাক্তারের দল অনবরত আসা-যাওয়া করে, তাদের কাছে নিজেকে একবার দেখাইতে ইচ্ছা করে দ্রবময়ীর।...কেন যে সর্ব্বদা বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াইলে হাত পা কাঁপে, সূর্য্যের আলোটা ঘোলা-ঘোলা ঠেকে, পরিচিত মুখগুলা আর স্পষ্ট দেখিতে পান না, শুধু একটা ঝাপসা ছায়া মনে হয়, এ সব কথা ডাক্তারে ভিন্ন কে বুঝিবে ?

আশ্চর্য্য ! এতবার ডাক্তার আসে, দ্রবময়ীর কথাটা আর কারুর মনে থাকে না।

'বলি বলি' করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হইল ! ডাক্তারের আসা-যাওয়ার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে !

গোবিন্দর বৌয়ের কাছে আর মুখ রহিল না দ্রবময়ীর।

সর্ব্বশেষ অবশিষ্ট, কোলের সন্তান মুরারি—সেও গেল। 'মুরারি নাই' কথাটা বারবার উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করেন, অর্থবোধ হয় না।...কিন্তু চোখের জল এমন শুকাইয়া গেল কেন ? ছেলের শোকে কাঁদিতে হয় না ?...

সামান্য কারণে, হয়তো বা অকারণেও, চোখে জল আসে—আর এতবড়ো দরকারের সময় আসিতে পারিল না ? আশ্চর্য্য !

সবই যেন ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট...কতো লোক কতো কোলাহল...এদের সঙ্গে দ্রবময়ীর যোগ কোথায় ? বোকার মতো বসিয়া বসিয়া শুধু দেখা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই।

কিন্তু বুকের যন্ত্রণাটা কেবলি যেন ঠেলিয়া ওঠে—এইটা একটু কমানো যায় না ? ভালো ডাক্তারের হাতের ভালো একটু ওষুধ পড়িলে হয়তো—

সমারোহের সঙ্গে শ্রাদ্ধ হয় মুরারির।

ইরাবতীর সাধ ! 'মানুষের মতো মানুষ ছিলেন—মানুষের মতো কাজ হওয়া চাই বৈকি।'...বুড়ো মার চোখের উপর বলিয়া আর করা যায় কি। বুড়ো মা যদি 'অমর' বর লইয়া পৃথিবীর আসিয়া থাকেন—সব কিছু তো আর থামাইয়া রাখা যায় না ?

এতোবড়ো কাজ বাড়ীতে, দ্রবময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারেন না, একগাছা ছোট লাঠি হাতে এমন ভঙ্গিতে ঠুকঠুক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, দেখিলে মনে হয় সব কিছু তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন বুঝি।

আজ আর কেউ নিষেধ করে না।

বোধ করি সকলে এতো ব্যস্ত যে লক্ষ্যও করেন না। এই অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে বেশ হৃষ্টচিত্তেই কিছুটা কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান দ্রবময়ী, অবশ্য নূতন যেসব ঝি-চাকর খাটিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর, বাড়ীর লোকগুলা তো কথাই শোনে না।...

কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল—ছাদ ভর্ত্তি করিয়া যখন একরাশ লোক খাইতে বসিয়াছে।...এতো লোক কেন ? ঘটা করিয়া খাইতে বসিয়াছে কেন এরা ? কার বিয়ে ?...বিয়ে নয় ?—শ্রাদ্ধ ? কার ? মুরারির ? মুরারি কে ? দ্রবময়ী তাহাকে চেনেন না কি ?...দীপশিখার ছায়ার মতো লোকজন সমেত ঘর বারান্দা ছাদ দালান সব যেন কাঁপিতে থাকে...সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা আর শিরাবহুল শীর্ণ পা দুইখানাও।

'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল লাঠিটা ছিটকাইয়া পড়ার শব্দে।

কিন্তু সহানুভূতি আবার আসে ? এ শুধু বাড়ীর লোককে জব্দ করা নয় ? খট্‌খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার তোর কিসের দরকার পড়িয়াছিল বাপু ? লোকসমাজে মুখ দেখাইতে প্রবৃত্তিও হয় ! ধন্যবাদ !...পাড়ার লোকে 'আহা' করিবে না কেন ? কেলেঙ্কারিটা হইল কেমন ?

সহানুভূতি না আসিলেও কাছে আসিয়া জড় হইতে হয় সকলকেই। যাহারা আহারে বসিয়াছে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে তাহারা।...পাড়ার ভূষণ কবিরাজ সেইমাত্র আসিয়াছেন, খাইতে বসেন নাই তখনো, ভীড় সরাইয়া নাড়ী দেখিতে বসেন বুড়ির। একটু উঁচুগলায়—অৰ্দ্ধচৈতন্যের কাণে পৌঁছাইতে পারে এমন স্বরে বলেন— কি ? কি কষ্ট হচ্ছে ? তাকান দিকি—

বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখেন দ্রবময়ী...ভাঙা ভাঙা ছাড়া-ছাড়া স্বরে বলেন—কে ভূষণ ? সায়েব ডাক্তার আসেনি ?...

'সায়েব ডাক্তার' অর্থে চক্‌চকে-সুট-পরা স্টেথিস্কোপ গলায়-ঝোলানো সত্যকার

ডাক্তার মুরারির অসুখে হামেসাই যাহারা আসা-যাওয়া করিত। ভূষণ কবিরাজ হাসিয়া বলেন—সায়েব ডাক্তার আপনার কি করবে ?

—বুকটা একবার ভালো করে দেখে একটু ভালো ওষুধ দিত আমায়।

চোখের কোণ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

ভালো ওষুধের নামে বৌরা মুখ বাঁকায়, নাতি-নাতনীরা মুচকি হাসে।

ভূষণ কবিরাজ তেমনি দরাজ গলায় বলেন—আমি দিয়ে দেবো ভালো ওষুধ, কি কষ্ট আপনার বুকে বলুন তো—

—বুঝতে পারি না বাবা, যখন তখন যেন 'হাঁচোট পাঁচোট' করে আসে, প্রাণ কেমন করে...সারবে তো বাবা ?

ভূষণ কবিরাজ এবার হাসিয়াই উঠেন দরাজ গলায়—সারতে ইচ্ছে এখনো আছে আপনার ? বয়েস তো অনেক হ'ল !

নিষ্প্রভ দুই চোখ মেলিয়া তেমনি নির্ব্বোধের মতো চাহিয়া থাকেন দ্রবময়ী—বয়েস ? হ্যাঁ হ'ল বৈকি বাবা, অনেক হ'ল।...বাঁচতে আর সাধ নেই...কিন্তু মরতে যে বড়ো ভয় করে বাবা...বড়ো ভয় করে...দেখে শুনে একটু ভালো ওষুধ আমায় দাও না ভূষণ !

❑

ছিন্নমস্তা

গাছের মাথা হইতে রোদ নামিয়া উঠানের কোণে পড়িয়াছে··· এইমাত্র স্কুল-বাড়ীর ঘন্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল। দশটার গাড়ীতে বর-কনে আসিবার কথা। স্টেশন হইতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে খুব জোর আরও আধ ঘন্টাই হোক, তার বেশী তো নয়।

অতএব সময় আর নাই।

জয়াবতী তাড়া দিতেছিলেন, আলপনা দেওয়া যে তোর আর এগোচ্ছে না মন্টি ? বৌ এসে কি কাঁচা পিটুলিতে পা দেবে ?··· আলপনা শুকিয়ে ফুটফুট করবে, তবে না 'বৌছত্তরে'র বাহার।

মন্টি কলিকাতায় মামার বাড়ি থাকিয়া স্কুলে পড়ে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে আলপনা আঁকিয়া নাকি বিশেষ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য তাহার সহপাঠিনী মল্লিকা ঘোষ নাকি সমস্ত ক্রেডিট্‌টা মন্টির চাঁপার কলির মতে আঙুলের ডগাগুলিকেই দেয়, কিন্তু সেটা একটা ধর্ত্তব্যের কথা নয়।

কন্যাগুণগর্ব্বিতা মন্টি-জননী মন্টিকে লইয়া জয়াবতীর বাড়ী আলপনা দেওয়াইতে আসিয়াছেন। একমাত্র ছেলে জয়াবতীর, বিবাহান্তে বৌ লইয়া বাড়ী আসিতেছে আজ।

কিন্তু স্কুলের বিদ্যাটা যেন খুব বেশী কাজে লাগিতেছে না আজ।

এতো বড়ো উঠান দেখিয়াই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে বেচারা।

স্কুল-বাড়ীর দোতলার হলের পালিশ করা মেঝেয় তুলি বুলানো এক, আর এই প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো উঠান ভরাট করিয়া লতা-পদ্ম আঁকা আর।

'চাঁপার-কলি' ঘসিয়া ক্ষয় হইয়া 'চাঁপা-কলা'য় পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাহার উপর আবার জয়াবতীর তাড়া। মায়ের উপর রাগে হাড় জ্বলিয়া যাইতেছিল মন্টির !

জয়াবতীর উপরও কম নয়, 'বলা খুব সহজ, নিজে করিয়া দেখুন না একবার'—এই গোছের মনোভাবটা লইয়া একই নক্সার পদ্ম সর্ব্বত্রই আঁকিতে থাকে শেষ পর্য্যন্ত। আধুনিক অতি-আধুনিক যাবতীয় আলপনার নক্সা জানা ছিল তা'র, কিছুই আর মনে পড়ে না।

এদিকে হাত নিসপিস করিতেছে জয়াবতীর।

মন্টির মতো আঙুলের ডগায় চাঁপার কলির সাদৃশ্য না থাকিলেও শিল্প-চাতুর্য্যের খ্যাতি জয়াবতীরও বড়ো কম ছিল না। আশেপাশের পাড়া হইতে আমন্ত্রণ আসিত তাঁহার পূজা-পার্ব্বণে, বিবাহ-উৎসবে ! সমারোহের বিবাহে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইতে, ছানার হাঁস, ক্ষীরের

মাছ, মাখনের পদ্ম, মুগের ডালের ময়ূর ইত্যাদির গঠননৈপুণ্যে কুটুম্ববাড়ীর লোককে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিতেন জয়াবতী।

নূতন জামাইয়ের জলখাবারের ফলের রেকাবিতেই কি কম কারুকার্য্য করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত ?

তা' ছাড়া, আলপনা ! পীঁড়ির আলপনা তো বটেই, মেঝের আলপনাও।

সত্যই প্রশংসা করিবার মতো কাজ ছিল। কতো বাড়িতে গোবর-মাটি-লেপা মেটে উঠোনে এমন 'বৌ-ছত্র' আঁকিয়াছেন যে, দর্শকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, জয়াবতীর নিপুণ করস্পর্শে নির্জীব উঠানও যেন 'হাসিয়া উঠিয়াছে'।

আর এ-তো শানবাঁধানো উঠান—যে উঠান ছেলের ম্যাট্রিক পাশের বছর নূতন করিয়া বাঁধাইয়াছিলেন জয়াবতী, বৌ আসিয়া দাঁড়াইবার আসন্ন মধুর কল্পনায়।

কিন্তু ছেলেবেলা হইতে পরের বৌয়ের বৌ-ছত্র আঁকিয়া আঁকিয়া হাত পাকাইলেও নিজের ছেলের বৌ আসার সময় আর শুভ কাজে হাত বাড়াইবার অধিকার রহিল না, সে হাতে বিধাতা কোপ মারিয়া দিয়াছেন।

ছেলের কৈশোরকাল হইতেই ছেলের বিবাহ লইয়া স্বামীর সহিত কতো জল্পনাকল্পনা পরামর্শে, কতো সোহাগ কলহে রাত্রি কাটিয়াছে ! একটিমাত্র সন্তানকে ঘিরিয়া দুইটি মানুষের আশার আর শেষ ছিল না। সব আশায় ছাই দিয়া দিব্যি কাটিয়া পড়িলেন দেবনাথ।

জয়াবতীর জন্য রহিল আনন্দহীন গুরুদায়িত্বের বোঝা।

ছেলের বিবাহ আজ আর রঙীন কল্পনা নহে, কঠিন কর্ত্তব্য। ভালোয় ভালোয় কাজটা মিটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা নাই তাঁহার।

বৌ-বরণ করিবার জন্য জ্ঞাতি-জা কনকলতা একখানা খসখসে নূতন বেনারসী শাড়ী জড়াইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বিমলেন্দুর জলপানির টাকায় সাধ করিয়া এই শাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছিলেন জয়াবতী বিমলেন্দুর বৌ বরণ করিতে।

সিন্দুক খুলিয়া সেই শাড়ী বাহির করিয়া দিয়াছেন কনকলতাকে।

কনকলতা কাপড়ের আঁচল সামাল করিতে করিতে দুধে-আলতার পাথরখানা আনিয়া বসাইয়া দিয়া তোষামোদের সুরে বলে ঃ এ কি আর তোমার হাত মেজদি, যে এক দণ্ডে হয়ে যাবে ?

জয়াবতী মন্টির মার অপ্রতিভ মুখখানার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেনঃ ছোট বৌয়ের যেমন কথা ! বুড়োমাগীর সঙ্গে ওই ছেলেমানুষের তুলনা ? এই যে অতোখানি করেছে এরই মধ্যে তাই ঢের। গাড়ীর সময় হয়ে গেল তাই তাড়া দেওয়া।

কনকলতা বাতাসের গতি আঁচ করিয়া কথার মোড় ঘুরায়—'তা তো বটেই, তা তো বটেই ! তুলনা নয়,—এমনি বলছি। যেমন অদৃষ্ট, চিরদিন পাঁচ জনের করে এসে এখন নিজের ঘরে চোর। আজ কোথায় তুমি নিজে এই চেলির শাড়ী প'রে বৌ-ছেলে বরণ ক'রে—

—থাক ছোট বৌ ওসব কথা। দেখো দিকিন, দুধ ওথলানোর কি হলো ? বৌ দোরে পা দেওয়া মাত্র যেন উথ্‌লে ওঠে।

সস্তার করুণ রস আমদানি করিয়া অন্তর্নিহিত গভীর বেদনাকে খেলো করিবার প্রবৃত্তি নাই জয়াবতীর।

গোছগাছ করিতে করিতেই বরকনে আসিয়া পড়ে।

'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান-ধারণায়'—কবিগুরুর লেখনী নিঃসৃত এই প্রেমিকের উক্তিটি অনায়াসেই বাঙালী ঘরের শাশুড়ী-বৌ-সম্বন্ধে খাটানো যায়। অধিকাংশ পুত্রবতী জননীরই কি জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ গড়িয়া ওঠে না পুত্রের বিবাহ-কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া ? সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের মাতার ধ্যানের মূর্তি কি একটি ডানাবিহীন পরীমূর্তি নয় ?

কল্পনার তো রাশ টানিতে হয় না, তাই সেই ধ্যানের মূর্ত্তিকে লইয়া লীলায়িত হইয়া ওঠে কতো স্বপ্ন, কতো সুষমা ! নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে। পরের মেয়েকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, দেখাইয়া দিবেন তিনি। করুণা হয় তাহাদের উপর যাহারা ছেলের বিবাহ দিয়া 'বৌ-কাঁটকী-শাশুড়ী' নাম কিনিয়াছে। কৃপা হয় তাহাদের উপর, যাহারা কালো-কোলো খাঁদা-বোঁচা বৌ ঘরে আনিয়াছে। পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে একটি সুন্দর মুখ দেখিলেই কৌতূহল প্রবল হইয়া ওঠে, তাহার কুল, জাতি, গোত্রের পরিচয় জানিতে।

বিশেষত জয়াবতীর মতো এক সন্তানের মার। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া ছেলেকে সংসারী করিয়া দেওয়াই যেন জীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য এঁদের।

কিন্তু ধ্যানের ধারণা যখন সত্যই মূর্তি হইয়া আসিয়া ধরা দেয় ?

না, কথাটা বলা ঠিক হইল না,—ধরা দিলে অনেক সমস্যাই মিটিত। আধুনিক মেয়েরা স্বামীকেই বড়ো ধরা দেয়—তা আবার শাশুড়ীকে ! ধরা দেয় না, শুধু মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

পরবর্ত্তী ঘটনাটা, ধরিবার চেষ্টা, আর ধরা না দিবার আক্ষেপ-বিক্ষেপের সমষ্টি।

তবু বিমলেন্দুর বৌয়ের মতো, বিয়ের কনে আসিয়াই নিজ মূর্তি ধরার দৃষ্টান্ত আধুনিক মহলেও কম। শহরে মেয়েকে বাগ মানাইতে পারিবেন কিনা, এই সন্দেহে পল্লী অঞ্চলের মেয়ে আনিয়াছিলেন জয়াবতী, প্রতিভা আসিয়া শহরকে টেক্কা দিল।

বিয়ের কনে কে কবে শাশুড়ীকে শুনাইয়া বরকে মুখনাড়া দেয় ঃ এই যে শুনেছিলাম, এতো ভালো অবস্থা—তত ভালো অবস্থা,—তার খুব দেখছি বটে ! বাড়ীতে এমন একখানা বড়ো আয়না নেই যে, দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধি। ঘরসংসার গুছিয়ে তবে ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে আনতে হয়—বুঝলে ? বাহারের মধ্যে দরজা-জানালায় ছেঁড়া-কাপড়ের পর্দ্দা ঝোলানো ! হাসি পায়।

দালান ঝাঁট দিতে দিতে কথাটা কানে গেল জয়াবতীর।

ধাক্কাটা প্রথম, তাই চলন্ত হাতটা হঠাৎ যেন অবশ হইয়া আসে। এ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে 'সাজুনে-গুছুনে-সৌখীন' বলিয়া খ্যাতি ছিল জয়াবতীর। জয়াবতীর ভাঁড়ারে প্রত্যেকটি টিন রং-করা, মাফিক-সই। শেলফ, আলমারি বোতল, কাচের জারের প্রাচুর্য্যে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। জয়াবতীর ঘর-দোর ছিমছাম ফিটফাট, ট্রাঙ্ক-বাক্স, সিন্দুক-দেরাজ—সব শাড়ীর পাড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা, বিছানা ফরসা, বালিশের ওয়াড়ে ঝালর। এ-সব আবার এদেশের ক'জনের আছে?

সম্প্রতি বৌ আসিবে বলিয়া নিজের পুরনো আমলের ভয়েল শাড়ী কাটিয়া সমস্ত জানালা দরজায় পর্দা লাগাইয়া তো পাড়ার লোকের ঈর্ষাভাজনই হইয়াছেন। লোকে বলে ঃ বৌ আসছে বৈ তো রাণী আসছে না, অতো বাড়াবাড়ি কিসের!

জয়াবতীর সেই সাধের গৃহসজ্জা দেখিয়া বড়োমানুষের মেয়ের নাকি হাসি পায়! বিমলেন্দু কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলেন জয়াবতী, কিন্তু গলা শোনা গেল না তার।

জলপানি-পাওয়া গ্রাজুয়েট ছেলে জয়াবতীর, ক্লাস নাইনের দাপটে বোবা বনিয়া গেল নাকি?

তা বোবা ছাড়া আর কি? বারে বারে প্রতিভার কণ্ঠস্বরই তো কানে আসে ঃ এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে মনে করলেই তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হয়ে আসছে! কি বললে,—আমদের হুগলীও পাড়া-গাঁ? বেশী বোকো না! কিসে আর কিসে! হুগলীতে কী নেই শুনি? কলের জল, লাইট-ফ্যান,—কিসের অভাব? বাবার যেমন কাণ্ড? বিয়ে দেবার আর দেশ পেলেন না—ত্রিবেণীতে বিয়ে!...আবার তো শুনছি,...সাংঘাতিক ম্যালেরিয়াও আছে। মরবো আর কি!

চিরদিনের শান্তশিষ্ট জয়াবতীর শীতল রক্তে হঠাৎ যেন আগুন ধরিয়া যায়। যে ছেলেকে কোনও দিন উঁচু কথাটি বলেন নাই, তাহার সম্বন্ধে একটা তীব্র কটূক্তি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া বসেন।

জিভ কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে বিমলেন্দুর? তাই একটাও উত্তর জোগাইল না?...কি করিবেন, পর্দা ঠেলিয়া জয়াবতী নিজে তো আর ছেলে-বৌয়ের ঘরে ঢুকিয়া উচিতমতো উত্তর দিতে পারেন না।

পারেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথার সমুচিত উত্তর অবিরত মনের ভিতর পাক খাইতে থাকে।

পরিপাটি করিয়া ঝাঁটপাট দিয়া ঝক্‌ঝকে মাজা ঘড়াটি লইয়া ঘাটে যাইবার সামর্থ্য ও স্পৃহা দুইই চলিয়া যায় যেন।

এই বৌ হইল বিমলেন্দুর!

জয়াবতীর দীর্ঘ তপস্যার ফল ? প্রায় আজীবনের আশার-কুসুম ?

তবু মুখোমুখি কিছুই বলা চলে না। ব্যবহারে উনিশ-বিশ করাও শক্ত। বিমলেন্দুকে যে বলিবেন কিছু, তাই বা সম্ভব কোথায় ?

বিমলেন্দুই যদি উল্টা বলিয়া বসে ঃ ছেলে-বৌয়ের ঘরে কি তুমি আড়ি পাততে গিয়েছিলে ? তখন ?

অতএব মনের রাগ মনে চাপিয়া প্রত্যহের মতোই বৈকালিক জলযোগ সাজাইয়া লইয়া স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে ডাক দিতে হয় বৌকে ! অল্পাহারের কথা তুলিয়া অনুযোগ-অভিযোগও করিতে হয়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত তিক্ত বিরস হইয়া থাকে। বৌকে আপন করিয়া লইবার সাধু সঙ্কল্প এই একটিমাত্র ঝাপটায় কোথায় উড়িয়া যায়।

দিন বারো-চৌদ্দ পরে বধূকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল বিমলেন্দু।

জয়াবতী যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু কেন এমন হইল ? বিমলেন্দুর জন্য প্রাণ কেমন করিল না কেন জয়াবতীর ? বিমলেন্দুর বিদায়-বেদনাটা যেন ভাসা-ভাসা ঝাপ্‌সা। উৎসব শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বিদায় লওয়ার মতোই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। নূতন বৌয়ের মতো বিমলেন্দুও যেন একজন অভ্যাগত মাত্র।

অথচ বিমলেন্দুর পাঠ্যাবস্থা হইতে এই বিদায় পর্বটা কী এক শোকাবহ ঘটনার সামিলই করিয়া তুলিতেন জয়াবতী ! তিনদিন আগে হইতে কান্না শুরু হইত তাহার। এজন্য স্বামীর কাছেই কি কম তিরস্কার খাইয়াছেন ?

উঠিতে বসিতে উপচাইয়া-পড়া সেই অশ্রুসমুদ্র কোথায় শুকাইয়া গেল আজ ?

বত্রিশ নাড়ীর যে বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াও মাতা-পুত্রকে কোথায় যেন অদৃশ্য ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, তেমনি কোনো অদৃশ্য আঘাতেই কি নির্ম্মূল হইয়া গেল সেই বন্ধন !

ক'দিনের অগোছালো সংসারটাকে গুছাইয়া লওয়াই কি এতো বড়ো দরকারী কাজ হইল জয়াবতীর, যে ছেলে-বৌ বাড়ীর চৌ-কাঠ ডিঙাইতে না ডিঙাইতেই আগাগোড়া ওলট-পালট করিয়া গুছাইতে শুরু করিয়া দিলেন ?

মুক্তি জিনিসটা কাম্য হইতে পারে, কিন্তু বেশ সহজপাচ্য কি ?

পরিপাক করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় ?

মাস দুই পরে আবার নিজে হইতেই তো বৌ আনার কথা তুলিতে হইল। কিসের যেন একটা ছুটিতে সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছিল বিমলেন্দু। জয়াবতীর মনে হইল—ছেলে যেন ভার-ভার, মনঃক্ষুণ্ণ।

মায়ের দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিতেছে, সে কি অভিযোগের নয় ?

বরাবর বাড়ী আসিলেই মায়ের সঙ্গে যতো গল্প হয় তাহার রাত্রে খাওয়ার সময়। সারা পাড়া নিশুতি হইয়া যায়, শুধু জয়াবতীর ঘরে তিন দিনের খরচের কেরোসিন একদিনে পোড়ে।

এবারে পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল বিমলেন্দু, মাকে একবার বলিয়াও গেল না। জয়াবতী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন ছেলের গমন-পথের পানে।

অনেক রাতে যখন নীচের কাজকর্ম সারিয়া জয়াবতী উপরে উঠিলেন, তখন ছেলে ঘুমে অচেতন। মাথার কাছে চিঠির প্যাড আর ক্যাপ্-খোলা ফাউন্টেনপেনটা পড়িয়া আছে। হ্যারিকেনের সামনে একটা বই আড়াল করিয়া দিয়া দিব্যি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

চিরদিনের ঘুম-কাতুরে ছেলে, পরীক্ষার পড়ার সময় যেমন হ্যারিকেনে বই আড়াল করিয়া দিয়া খাতাপত্র ছড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িত! জয়াবতী আসিয়া আলোটাকে মাথার কাছ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া পরম যত্নে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেন বই-খাতাপত্র।

আজ শুধু বিনাবাক্যে আলোর শিখাটা একটু কমাইয়া দিয়া পাশের ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়েন। ওঃ বৌকে চিঠি লেখা হইতেছিল বাবুর! তাই মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলারও ফুরসৎ হইল না!

পরদিনই ছেলের কাছে বৌ আনার কথা তুলিলেন জয়াবতী।

বিমলেন্দু যেন আলগোছ হইয়াই ছিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একবার বলিল না ঃ "থাক্ না আরো কিছুদিন, এতো তাড়া কি?"

বিয়ের কনে এবার ঘর করিতে আসিল।

ঘর করিতেই যে আসিয়াছে সে দাবীর ভাব প্রতিভার ব্যবহারে ষোলো আনা ছাপাইয়া আঠারো আনায় ওঠে। এ বৌ লইয়া ক'দিন সদ্ব্যবহার রাখিতে পারে লোকে? নতুন বৌ একটু কুণ্ঠিত, একটু নম্র, একটু সলজ্জ হইবে না? কেন, আর কারো বাড়ীতে কি বৌ কোনোদিন দেখে নাই প্রতিভা?

প্রতিভার কথা-বার্ত্তা 'চ্যাটাং চ্যাটাং,' হাঁটা-চলা দুমদাম, কাজকর্ম্ম বেপরোয়া। এই তো বৌ আনার পর পাঁচ দিনও যায় নাই, শনিবার বাড়ী আসিয়াছে ছেলে, বিমলেন্দুকে জল-খাবার দিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া আসিতেছেন জয়াবতী, রান্নাঘরে ঢুকিয়া অবাক!

প্রতিভা চায়ের জল চাপাইয়া দিয়া নিমকির ময়দা মাখিতে বসিয়াছে!

মিনিট খানেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জয়াবতী কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, আকাচা কাপড়ে ছিষ্টি ভাঁড়ার ছুঁলে বৌমা?

প্রতিভা খুন্তির কোণ্ দিয়া নিমকির গায়ে ঠোক্কর মারিতে মারিতে তীক্ষ্নস্বরে বলে, আকাচা কাপড় মানে? আপনার সামনেই তো কাপড় কেচে এলাম দেখতে পেলেন না?

দেখবো না কেন, কানা তো নই? পরলে তো সেই তোমাদের ঘরের আলনার জামা-

কাপড় ? আর সেই অবধি তো বিছানায় বসে ছিলে !

আপনার সংসারে বুঝি কাচা কাপড় পরলে একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ? জানতাম না তা—বলিয়া চাকি, বেলুন ছাড়িয়া আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়ায় প্রতিভা ! ফর্সা রং, এতটুকু এদিক ওদিকেই লাল হইয়া ওঠে।

চায়ের জলটা উথলাইয়া উথলাইয়া উনুনের গায়ে পড়িতে থাকে। জয়াবতী বোকার মতন দাঁড়াইয়া থাকেন। করিবেন কি ? বৌকে খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া আনিবেন, না নিজেই তাহার পরিত্যক্ত কাজটা শেষ করিবেন ?

দুইটাই যে সমান অসম্ভব।

হঠাৎ এক সময় চোখ পড়িল, চা খাবার না খাইয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল বিমলেন্দু। বোধ করি জীবনে এই প্রথম।

বৌ যে 'সাতখানা করিয়া' লাগাইয়াছে গিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি !

দিন যায়।

কেমন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে ছেলে, আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে বৌ, নিরুপায় আক্রোশে শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখেন জয়াবতী।

প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসে বটে বিমলেন্দু, রবিবার থাকিয়া সোমবার ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফেরে, কিন্তু ক'টি কথা কহিতে পান জয়াবতী ? চোখে দেখিতে পান ক'বার ?

বাড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিবার আগে যা দুই একটা মামুলী কুশল-প্রশ্ন করে, নিতান্তই দায়-সারা সেটা। তারপর সেই যে 'ইষ্টদেবী'র মন্দিরে গিয়া ঢুকিল, আর পাত্তা পাওয়া যায় না ছেলের !

রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।

চির-অভ্যাসের বশে ছেলের রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যবস্তুগুলার আয়োজন করেন ঠিকই, কিন্তু কাছে বসিয়া মাথার দিব্যি দিয়া সবগুলি ছেলের উদরসাৎ করাইবার স্পৃহা যেন আর নাই।

ভালো করিয়া না খাইলে শুধু রাগই বাড়িয়া ওঠে।

একদিন তো ফট্ করিয়া বলিয়াই বসিয়াছিলেন, এবার থেকে বাড়ী এলে বৌমাই যেন রাঁধে, নইলে খেয়ে পেটও ভরে না, ভালোও লাগে না দেখি।

বিমলেন্দু কিন্তু অপ্রতিভ হওয়ার পরিবর্তে মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল, তোমার মনটনগুলো আজকাল কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ! আশ্চর্য্য !

অপমানাহত কালো মুখ লইয়া বসিয়া থাকিলেন জয়াবতী, উত্তর জোগাইল না। উত্তর দিবেনই বা কাকে ? ছেলে ততক্ষণ উপর কোঠায়।

পাড়াগাঁয়ে পাড়া বেড়াইবার প্রথাটা রীতিমতই আছে, বিশেষত একটা উপলক্ষ্য জুটিলে।

কারো বাড়ী নতুন বৌ আসা তো বেশ একটা বড়ো দরের উপলক্ষ্য। বৌ কেমন হইল—এই কৌতূহল লইয়া পাড়া ঝাঁটাইয়া মহিলার দল বেড়াইতে আসেন জয়াবতীর বাড়ী।

অপরের কাছে জয়াবতী খেলো হইতে রাজী নন, তাই বৌয়ের তিনি প্রশংসাই করেন। কিন্তু অন্তঃসারহীন কৃত্রিম সেই ভাষা বুঝিয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি এ দেশের বারো বছরের মেয়েটিরও আছে।

জয়াবতীর কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য সব সংগ্রহ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা আবার উপরে উঠিয়া বৌয়ের ঘরেও উঁকি মারিতে যান। সেখানেও তথ্যসংগ্রহ হয় কিছু।

পাড়ার লোকে বেড়াইতে আসিলে তাঁহাদের সম্মানার্থে যে নীচে নামিয়া আসিয়া আসন পীড়ি দিবে—এতো গরজ পড়ে নাই প্রতিভার। তবে উপরে কেউ উঠিয়া আসিলে গুছাইয়া গল্প করিতে আপত্তি নাই তার। জয়াবতীর দুর্ব্ব্যবহারের পরিচয় দিবার জন্যও তো শ্রোতার প্রয়োজন ?

শ্রোতারাও অবশ্য শুনিতে অরাজী নয়।

শুনিয়া আবার জয়াবতীর কাছে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের অভিনয় করিতেও তো মজা আছে।

—বৌয়ের তো খুব সুখ্যাতি করিস্, শুনেছিস তোর বৌয়ের কথা ?

কথাটি বলিয়া লাহিড়ীদের বড়ো গিন্নী আঁচলের কোণ খুলিয়া দোক্তার কৌটোটি বাহির করেন।

জয়াবতী নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলেন, কেন, কি বললে ?

—শুনলে তুই রেগে মরবি মেজবৌ, তবে আমাদের শুনলে কষ্ট হয়। আহা, একটা ছেলের বৌ,— মনের মতন না হলে কি কম দুঃখের কথা !

জয়াবতী উদাসভাবে বলেন—আর দিদি, মনই নেই, তা মনের মতন ! সেই একজনের সঙ্গে সবই চিতায় গেছে। এখন ওরা ভালো থাকলেই ভালো।

—আহা, তা তো বুঝলাম, তবু বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই। বেটার বৌ এসে কোথায় একটু দেখবে শুনবে—তা নয়, বৌ যেন মানোয়ারি গোরা ! আমি কোথায় ভালোমানুষি করে বললাম—হ্যাঁ গা বাছা, আজ একাদশীর দিন ঝি আসেনি, শাশুড়ী মাগী খেটে মরছে, তুমি বরং বাসন ক'খানা মাজলে পারতে,—মুখ ঝামটা দিয়ে বললে কি—কে জানে, কবে কি তিথি-নক্ষত্র পড়ছে, পাঁজী-পুঁথি নিয়ে তো বসে নেই। আমার কাজ ওঁর পছন্দ হলে তো ! — শোনো দিকি কথা !

জয়াবতী অবশ্য অনেক শুনিতেছেন, তবু অপরের সামনে দোষারোপে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন— হ্যাঁ, এখন তো ওই বদনামই হবে। আমার ভ্যাড়াকান্ত ছেলেকেও তাই বুঝিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে চব্বিশ ঘন্টা ওপরতলায় বসে আছেন। কুটোটি নাড়েন না। পছন্দ-মতন কাজ করলেই পছন্দ হয়। কাজ দেখলে গা জ্বলে যায় !

চেষ্টাকৃত ভদ্রতার আবরণ খসিয়া পড়ে।...কেন কি দায় পড়িয়াছে জয়াবতীর বৌয়ের সুনাম রাখিতে ? বৌ যদি পাড়ার লোকের কাছে নিন্দা করিয়া বেড়ায় তাঁহার ?

লাহিড়ী গিন্নী গভীর পরিতাপের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া বলিয়া ওঠেন —হ্যাঁরে, বিমল যে তোর সোনার ছেলে ! সে কিছু বলে না ?

—তেমন স্যাকরার হাতে পড়লে সোনাও লোহা হয়ে যায় দিদি !

—কি জানি বাবা ! কলিকাল আর কাকে বলেছে ! আহা পাঁচটা সাতটা নয়—একটা ছেলে, বৌ ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে পর করে নিলে ! মরে যাই. চিরদিনের ভালোমানুষ, তোর কপালে এতো দুর্ভোগ !

লাহিড়ী-গিন্নী বোধ হয় সহজে থামিতেন না, এমন মনোহর পরিবেশটি গড়িয়া উঠিয়াছিল ! আসর মাটি করিয়া দিল নাতনী লাবণ্য আসিয়া ঃ দিদিমা, শীগগির চলো, বাবা এসেছে, মামিমা তোমায় ডাকছে।...

যতো মুখরোচক আলোচনাই হোক, জামাই আসিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না। লাহিড়ী-গিন্নী উঠিয়া পড়েন।

উঠিতে পারেন না জয়াবতী।

হাতের ঘড়া-ঘটিটার মতোই নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আবরণ জিনিসটা একবার খসিয়া গেলে অবস্থাটা হইয়া ওঠে মারাত্মক।...চক্ষুলজ্জার বালাই আর থাকে না কোন পক্ষেরই।

জয়াবতী প্রায় প্রত্যহই কাঁদিয়া কাটিয়া পাড়ার কারুর না কারুর বাড়ী বেড়াইতে যান, আর মনের ভার লাঘব করিয়া আসেন। প্রতিভা বাড়ীতেই সমব্যথী জুটাইয়া আনিয়া সারাদিন 'শাশুড়ী-চরিত' আলোচনান্তে পড়ন্ত বেলায় উঠিয়া চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিপাটি করিয়া সাজিয়া ছাদে গিয়া বসে, নয় তো বরকে চিঠি লেখে।

জয়াবতী আসিয়া দুম-দাম করিয়া সংসারের কাজ করেন আর বৌকে শুনাইয়া শুনাইয়া রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন,...বৌ কখনো অগ্রাহ্যভরে ঠোঁট উল্টায়, কখনো পাল্টা একটা কটু মন্তব্য করে।

তবু সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না বিমলেন্দুর পরিবর্ত্তন।

আজকাল আর মায়ে-ছেলেয় কথাবার্ত্তা নাই বলিলেই চলে, গুম হইয়াই থাকে বিমলেন্দু। অথচ বৌয়ের সঙ্গে যে গল্প ফুরাইতে চায় না, সেটা তো চোখে পড়ে অহরহ।...

মা বলিয়া তো সমীহ করে না কেউ।

তা' ছাড়া—আর একটি বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হইয়াছে জয়াবতীর —ছেলে-বৌয়ের ঘরের জানলার ধারে-কাছে কোন একটা কাজের ছুতায় দাঁড়াইয়া পড়া।

হায় ! কেন জয়াবতীর এতো অধঃপতন !

সুখ তো তাহাতে নাই-ই, বরং দুঃখই বাড়ে।...ঘরের জানলায় কান না পাতিলে কি

একথা শুনিতে পাইতেন জয়াবতী ঃ আসল কথা হিংসে ! হিংসে ! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়, বরাবর জানি আমি। নিজেদের সাধ-আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কিনা,তাই পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে। এই যে– তুমি আমার কাছে একটু বসো কি দু'দণ্ড গল্প করো—সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।

হয়তো বিমলেন্দু ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ করে, কিন্তু সে এমনই ক্ষীণ যে জয়াবতীর কানে আসে না।...বৌয়ের পরবর্ত্তী উত্তরটাই কানে আসে ঃ আহা, তুমি আর বুঝবে কি ? তোমার সামনে তো ভিজে বেড়ালটি।...বলি পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে ছড়ায় কি বাতাসে উড়ে গিয়ে ? বাড়ীর লোক না রটালে ? এতো বলে মরে যাচ্ছি, কলকাতায় নিয়ে চলো আমায়—

—আমিও তো খুঁজে মরে যাচ্ছি গো প্রতিভারাণী। বাড়ী পাচ্ছি কই ?

কে বলিল কথাটা ?

বিমল ?

জয়াবতী বাঁচিয়া আছেন তো ?...সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে ? আরো বাঁচিবার প্রয়োজন আছে ?

তবু ভাত বাড়িয়া খাইতে ডাকিতে হয়।

এই দুর্গতি জয়াবতীর। বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই যে ডাকিয়া দিবে।...অবশ্য ডাকেন বলিয়া যে, সে ডাক স্নেহে বিগলিত এমন নয়। স্বভাব-বহির্ভূত স্বরে কথা কহিতে দেখা যায় আজকাল জয়াবতীকে—কি গো, বড়মানুষের মেয়ের ভাতটাত খাওয়ার ফুরসৎ হবে ? না কি বাঁদী হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে বেলা বারোটা অবধি ?

তা' এহেন সম্বোধনে যাকে ভাতের থালার গোড়ায় আসিয়া বসিতে হয়, মেজাজ তাহারই-বা ভালো থাকিবে কোন্ হিসেবে ?

প্রতিভা সশব্দে আসে, ভাত-তরকারি ফেলিয়া ছড়াইয়া যথেচ্ছভাবে খায় ! উপকরণের ত্রুটি ধরিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে।...তাহার বাপের বাড়ীতে নাকি তিন রকম মাছ রান্না না হইলে পাতের কাছেই আসে না কেউ, ভাতের চাইতে তরকারির পরিমাণ বেশী না হইলে যে আবার খাওয়া যায়, বিয়ের আগে নাকি জানাই ছিল না প্রতিভার, ইত্যাদি।

এমনি কি একটা মন্তব্যের পরদিন জয়াবতী প্রতিভার ভাত বাড়িয়া দিয়া থালার পাশে একটি কাঁসি সজনে খাড়ার চচ্চড়ি আনিয়া বসাইয়া দেন।

—এটা কি হলো ?

প্রতিভার তীক্ষ্ণ প্রশ্নে আজকাল তেমন আহত হন না জয়াবতী, সমান তীক্ষ্ণ সুরে তিনিও বলেন—তরকারির অভাবে কষ্ট করে খাবার তো দরকার কিছু নেই বৌমা, বেশী খেলেই রাঁধবো বেশী বেশী।

প্রতিভা হাতের উল্টোপিঠের সাহায্যে পাত্রটা খানিকটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলে—তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট

করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে ! আপনার লোভের জিনিস !'

—কী ! কী বললে বৌমা !

আহত জন্তুর মতো একটা বিকৃত চীৎকার বাহির হয় জয়াবতীর কণ্ঠে। দুঃসহ স্পর্দ্ধার এই নূতন রূপ দেখিয়া সমস্ত শরীর যেন থরথর করিয়া ওঠে।

প্রতিভা অবশ্য দমে না তাহাতে, মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—মিথ্যে আর কী বলেছি ? কাঁসি-ভর্ত্তি চচ্চড়ি তো খান বসে বসে। দেখেছি বলেই বলছি।

কথাটা যদি মিথ্যা হইত, তবে বোধ করি জয়াবতীর সর্ব্বাঙ্গে এমন আগুন ধরিয়া যাইত না।...মিথ্যা নয়, বড়ো বেশী সত্য। এই সজিনা খাড়ার ওপর আজীবন দুর্ব্বলতা জয়াবতীর।

বাড়ীর উঠানেই গাছ, ফলও ধরে অজস্র, আর প্রত্যহ রাঁধা চাই জয়াবতীর।...এই লইয়া দেবনাথ কতো হাসিতেন। হাসিতেন বটে, আবার দৈবাৎ কোনোদিন একটু কম আছে দেখিলে নিজেই গাছ ঠেঙাইয়া পাড়িয়া দিতেন।

শুনিতে হাসির কথা—কতো সময় একা হাতে জয়াবতী ইচ্ছার অনুরূপ কুটিয়া উঠিতে না পারিলে পেন্সিলকাটা ছুরি লইয়া ছাড়াইয়াই দিয়াছেন রাশি রাশি।

জয়াবতী অনুযোগ করিলে বলিতেন—'তা হোক, হাসুকগে পাড়ার লোকে। ডাঁটা-চচ্চড়ির বহর কম হলে মহারাণীর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে ! তখন—উপায় ?...কেন ছাড়ানো কিছু খারাপ হচ্ছে কি ? দেখো না !'

বিমলেন্দুও কতো দিয়াছে ছেলেবেলায়।

জয়াবতীর সজিনাখাড়া-প্রীতি পাড়ার লোকেরও অবিদিত নয়। তাঁর নিজের বাড়ী গাছ থাকা সত্ত্বেও যে যার গাছের ডাঁটা উপহার দিয়া যায় প্রত্যেক বছর।

প্রীতির সেই দুর্ব্বলতাকে 'লোভ' বলে নাই কেউ কোনোদিন। হেনস্থার চোখে দেখে নাই ব্যাপারটা। আদরের ছিল।

আজ বিমলের বৌ আসিয়া সেই বস্তুটার খোঁটা দিল এমন নির্লজ্জ ভাষায় !

অনেক মুখরা হইয়াছেন আজকাল জয়াবতী, তবু আজিকার এই আঘাতটা যেন মূক করিয়া দিল তাঁকে।...কিভাবে যে তিনি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন, কিভাবে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, সে আর মনে নাই।

হঠাৎ কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হইয়া গেলে, মানুষ যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতে থাকে আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক প্রেরণায় তেমনি আত্মরক্ষার ভাবই যেন ছিল জয়াবতীর পলায়নে।

কিন্তু অমন আছড়াইয়া পড়িয়া নালিশ জানাইলেন তিনি কাহার কাছে ?

ঘোর সংসারী জয়াবতী এমন আকুল হইয়া কবে ডাকিয়াছেন ঠাকুরকে ?

আজই কি এতো প্রয়োজন পড়িয়া গেল দর্পহারী মধুসূদনকে ? তাই অনবরত মাথা কুটিতে থাকেন তাঁহার উদ্দেশে !

কিন্তু মধুসূদনের এতো প্রখর শ্রবণশক্তির প্রমাণই বা কবে কে পাইয়াছে ? বধির বলিয়াই তো চিরদিনের দুর্নাম তাঁহার। আজ জয়াবতীর আবেদনটাই এতো তাড়াতাড়ি কানে ঢুকিয়া গেল ?...আর আশ্চর্য্য ! প্রতিভার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীরপুরুষের !

বিরাট সেই গদাটা যে প্রতিভার দর্পের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারিণীর পাঁজর ক'খানাও চূর্ণ করিয়া বসিবে, সে বোধও রহিল না ? এমনি বেহুঁশ ?

না কি জয়াবতীর কাণ্ডজ্ঞানহীন আবদারে নিতান্তই বিরক্তচিত্তে বেপরোয়া ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন মারাত্মক অস্ত্রটাকে ? আচমকা সেই ধাক্কাটা লাগিল গিয়া বিমলেন্দুর গায়ে ?

তা নয় তো—যে বিমলেন্দু নিত্য দুই বেলা ট্রামের ফুটবোর্ড হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়ে সেইদিনই বা সে সোজাসুজি রাস্তার বদলে রাস্তায় চলন্ত বাসের তলায় পড়িল কেন ?

সেদিনের মাথা-কোটার মাত্রাটা কি বড়ো বেশী হইয়া গিয়াছিল জয়াবতীর ? তাই নিজেও তিনি বিমলেন্দুর নিস্পন্দ মূর্ত্তিটার মতোই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন হাসপাতালের খাটখানার সামনে ? বিমলেন্দুর মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ডের জন্যও মাথা কুটিবার শক্তি আর খুঁজিয়া পাইলেন না ?

পাড়ার লোকে বলাবলি করিয়াছিল—এ ধাক্কা সামলাতে পারবে না মাগী, পাগল হয়ে যাবে—

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল—পাগল হওয়া অতো সোজা নয়।

দুই চোখের কোলে কালির রেখা আর গালের হাড় দুইটা একটু উঁচু দেখানো ছাড়া বিশেষ আর কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না।

আবার একদা দেখা গেল—শীত পড়িতে না পড়িতেই চির-অভ্যাসবশে রোদে পিঠ দিয়া বড়ি দিতেছেন জয়াবতী, আলাদা আলাদা পাত্রে তিল, পোস্ত আর ছাঁচি কুমড়োর বড়ি। নৈপুণ্যের ঘাটতি কিছু নাই।

দেখা গেল—শীতের শেষের দিকে নাড়াচাড়া করিতেছেন কোটা আমসি আর কুলের আচারের পাথর লইয়া।

দেখা গেল—কুয়োর জলে ডাল আধ-সিদ্ধ থাকিবার ভয়ে মাজা চকচকে পিতলের ঘড়াটা লইয়া 'ঘাটের জল' আনিতে।

এই তো উঠানের মাচা হইতে লক-লকে কুমড়ো ডাঁটার ডগা কাটিয়া কাটিয়া চুপড়ি বোঝাই করিতে দেখিলাম আজ !

অতএব অনায়াসেই কল্পনা করা যায়—ভাঙা পাথুরিখানায় করিয়া সর্ষে-বাটা, লঙ্কা-বাটা আর পোস্ত-বাটা সাজাইয়া লইয়া দিব্য গুছাইয়া রান্না করিতে বসিয়াছেন জয়াবতী।

তা পৃথিবীর নিয়ম্‌ই তো এই—

পাঁজর ভাঙিয়া গেলেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না মানুষের।

এখনো অবশ্য প্রতিভার ভাত বাড়িয়া আহারে তাগিদ দিতে ডাকাডাকি করিতে হয় জয়াবতীকেই—তৃতীয় প্রাণী আর কই ? তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাবের সমস্ত সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তো মুছিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে বিমলেন্দু।

চকচকে কালো পাথরের বড়ো থালায় পরিপাটি করিয়া সাদা ধবধবে আতপ চালের অন্ন বাড়িয়া রাখিয়া জয়াবতীই ডাকেন—'বৌমা, অ বৌমা, নেবে এসো মা, মুখে দুটো দিয়ে যাও।

কণ্ঠস্বরে মমতার মাত্রাটা বড়ো বেশী পরিস্ফুট হইয়া ওঠে না ? আশেপাশে জ্ঞাতিদের বাড়ী হইতে শুনিতে পাওয়া যায়...অবাক হয় তাহারা জয়াবতীর মমতা আর মহানুভবতার পরিচয়ে !

স্নেহ-বিগলিত করুণ স্বর করুণতর হইয়া ওঠে অনুরোধ-উপরোধের সময় !...পাখা হাতে করিয়া কল্পিত মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলেন—খেতে পারছি না—বললে চলবে কেন মা ? শরীরটাকে তো রাখতে হবে ? ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক-পাতা ডাল-চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি ? ভাত ক'টা ফেলে উঠো না মা, বরং আর দু'গাছা ডাঁটা দিই।

মহিলা-সমাজের চিত্ত-জগতে প্রতিবেশীর ঘরের সদ্য-বিবাহিত বধূর আচার-ব্যবহার যতোটা কৌতূহলকর, সদ্য-বিধবার আহার-বিহারটা তার চাইতে কিছু কম নয়, হয়তো বা বেশী।...কাজেই—প্রায়ই ঠিক আন্দাজ মতো সময়ে জয়াবতীর বাড়ীতে আবির্ভূতা হন কনকলতা, লাহিড়ী-গিন্নী, মন্টির মা।...

ইঁহাদের মুখপানে চাহিয়া করুণ নালিশ জানান জয়াবতী : এই দেখো তাই, খাওয়ার দশা ! তাই তো বলি বৌমাকে, মরবার তো পথ নেই মা, বেঁচে থাকতেই হবে চিরকাল। বিধবার পরমায়ু মার্কণ্ডের পরমায়ু, না খেলে চলবে কেন ? কচু, ঘেচু শাকপাতাই খেতে হবে গুচ্ছির। যেমন কপাল !

সমস্বরে সায় দেন সমাগতার দল।

জয়াবতীর দুঃখেই শুধু বিগলিত হ'ন না তাঁরা, বিগলিত হ'ন জয়াবতীর করুণ হৃদয়ের পরিচয়ে।...আর কেউ হইলে হয়তো বা "অপয়া" রব তুলিয়া বিদায় করিয়াই দিতো বৌটাকে।

আচ্ছা—জয়বতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে ?...কণ্ঠস্বরে—মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধচ্ছায়া ?...চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে ?

❑

ঘূর্ণমান পৃথিবী

গতকাল থেকেই অনুভব করছেন শিবনাথ ওদের মধ্যে কিসের যেন একটা আয়োজন চলছে। 'ওদের' মানে শিবনাথের-ছেলে আর বৌ—শঙ্খনাথ, আর রুচিরার মধ্যে। মনে হচ্ছে রুচিরা শঙ্খনাথকে দুদিন ছুটি নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে, শঙ্খ রাজী হচ্ছে না, বলছে এখন অফিসে কাজের ভীড়, এমনিতেই তো দু'দিন ছুটি পাওয়া যাচ্ছে, ওতেই হবে।

নিজে থেকে কিছু জিগ্যেস করতে আজকাল কেমন বাধে শিবনাথের। আগে সব কিছু ব্যাপারেই মহোৎসাহে জিগ্যেস করতেন, 'কিরে শঙ্খ, কি কথা হচ্ছে রে?' কিন্তু ক্রমশঃই যেন টের পাচ্ছেন, শিবনাথের এই অকারণ কৌতূহল ওরা তেমন প্রীতির চক্ষে দেখছে না।

ছেলে আর বৌ!

এদের শিবনাথ, 'ওরা' ছাড়া আর কিছু ভাবেন না, ওদের বিষয়ে কিছু ভাবতে গেলে একত্রে 'ওদের' বলেই ভাবেন। তার কারণ আলাদা করে শঙ্খর যেন কোনো সত্তা খুঁজে পান না আর।

শৈশবে মাতৃহারা 'শঙ্খ' নামের যে ছেলেটাকে শিবনাথ ছাব্বিশ আটাশ বছর ধরে চিনে এসেছেন, জেনে এসেছেন তার ইচ্ছে,পছন্দ, রুচি, মনোভাব, মতবাদ, সেই ছেলেটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। একটি সত্তাই শুধু চোখে পড়ে, সে হচ্ছে 'রুচিরা' নামের একটি সুন্দরী সুশিক্ষিতা মধুভাষিণী মেয়ে।

ওকে যেন কেমন ভয় ভয় করে শিবনাথের, অথবা সমীহ সমীহ। ওর আড়াল থেকে শঙ্খকে ঠিক দেখতে পান না। অতএব শিবনাথ দু'জনকে এক করেই ভাবেন।

ভাবেন—থাকগে, ডেকে ডেকে জিগ্যেস করাটা ওরা যখন পছন্দ করে না!

কিন্তু ওরা তো আর অবিবেচক নয়, যে যা করবে বাপকে জানাবে না। সকালবেলা চায়ের টেবিলে একথা সেকথার মধ্যে জানিয়ে দিল, পরপর দুদিন ছুটির সুযোগে ওরা বর্ধমান যাচ্ছে। আর যাচ্ছে নতুন কেনা গাড়িটা করে।

বর্ধমানটা অবশ্যই বেড়াতে যাবার পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় জায়গা নয়, কিন্তু বর্ধমানে রুচিরার দিদির বাড়ি, অতএব পরম আকর্ষণীয়।

কথাটা শুনেই শিবনাথ ফস করে একটা বোকার মত কথা বলে বসেন। বলেন, গাড়িতে যাবে? তেল তো অনেক খরচা হবে।

বলেই মনে হল, কথাটা বোকার মত হলো, তেল পোড়াবার জন্যেই তো গাড়ি কেনা। কিন্তু বলে যখন ফেলেছেন, একটা অদৃশ্য হাসি দেখতেই হবে। মাঝে মাঝে ওই অদৃশ্য হাসি দেখতে হয় শিবনাথকে শঙ্খ হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া থেকে।...হ্যাঁ হঠাৎই বড়লোক হয়ে গেছে সরকারি অফিসের ভূতপূর্ব কেরাণী শিবনাথের ছেলে শঙ্খনাথ।

কিন্তু শিবনাথ যেন সেটা এখনো অনুভবে পাচ্ছেন না। শিবনাথের যেন মনে হয় এ একটা অলীক কথা।

শিবনাথের ছেলে একখানা অ্যামবাসাডার গাড়ি কিনে ফেলেছে, যত ইচ্ছে তেল পুড়িয়ে পুড়িয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, এটা স্বপ্ন না মায়া কে জানে। শুধু গাড়ি কেনাই নয়, চালাতেও শিখে ফেলেছে, শুধু শঙ্খই নয়, তার বৌও, সবই যেন অবাস্তব। তাই হঠাৎ হঠাৎ এক একটা বোকার মত কথা বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

অবশ্য ছেলে বৌ শিবনাথের কর্তব্য বুদ্ধিহীন নয়, চক্ষু-লজ্জাহীনও নয়। গাড়ি কিনেই প্রথমদিনই বাবাকে নিয়ে কালীঘাটে পূজো দিইয়ে এসেছে, এবং প্রথম রবিবারেই বাবাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে এনেছে। সে দিন শিবনাথের সুখে আনন্দে দুঃখের নিঃশ্বাস পড়েছে, শঙ্খর বহুদিন আগে মৃতা মায়ের জন্যে।

কিন্তু সেই মৃত্যুটা এত পুরনোকালের আর শঙ্খর কাছে এতই ঝাপসা, যে সেই নিয়ে তার সামনে আক্ষেপ করাটা হাস্যকর। শিবনাথ তো আর সেই পরলোকগতাকে ছেলের মনে চিরজাগরুক করে রাখবার জন্যে বৈজ্ঞানিক সম্মত কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি।

শিবনাথ ছেলেকে 'মানুষ' করে তোলবার জন্যে আপ্রাণ করেছেন, শিবনাথের চেষ্টা সফল হয়েছে, মানুষ হয়েছে ছেলে। আশাতীতই হয়েছে। শিবনাথ কি কোনো দিন আশা করেছিলেন এতটা হবে। শিবনাথ ওর বাড়বাড়ন্তর গতি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, এবং 'ওদের' অবাধ গতিবিধি দেখে কখনো বিস্মিত, কখনো ঈর্ষিত, আর কখনো বিরক্ত হচ্ছেন।

তবু আবার সে বিরক্তির ঈর্ষার আর বিস্ময়ের বস্তুগুলো নিয়ে লোকের কাছে গর্ব করতেও ছাড়েন না শিবনাথ। ছেলে গাড়ি কেনা মাত্রই ওঁর 'অবসরিকা' ক্লাবের বন্ধুদের কাছে খবরটি পরিবেশন করেছেন। যদিও অন্য ছলে! বলেছেন যেন কথায় কথায়, এই চারদিকে শুনি পেট্রলের দাম এতো বেড়েছে, ত্যাতো বেড়েছে, লোকে গাড়ি রাখতে পারছে না বেচে দিচ্ছে, আর এখন কিনা আমার শঙ্খবাবু দুম্ করে একখানা অ্যামবাসাডার কিনে বসলেন।

এই রকমই বলেন, যেন নিন্দাছলেই ছেলের বাড়বাড়ন্তর কথাগুলো শুনিয়ে দিয়ে আসেন বন্ধুদের।

আজও বর্ধমানে যাওয়ার খবরটা পাওয়া মাত্রই একটা বোকামি করে ফেলেও বাজারে পরিচিতজন সকলকে ধরে ধরে শুনিয়ে দিলেন, শুনেছ কান্ড। নতুন গাড়িতে বাবা আমার আজ বর্ধমানে চললেন শালির বাড়ি। ঘন্টায় ঘন্টায় ট্রেন রয়েছে বর্ধমানের, অকারণ কতটা তেল পোড়ানো, ভাবো।

কেউ বলেছে, এখনকার ছেলে-পুলেদের তো ওই, যা রোজগার করবে,দুহাতে ওড়াবে। ...কেউ বা বলেছে, ভগবানের আশীর্বাদ ! কৃতী হয়েছে। তদুপযুক্ত চলবে বৈকি।

শিবনাথের মনে হয়েছে, কেউই যেন ঠিক প্রাণ থেকে কথাগুলো বলল না। যেন শিবনাথের ছেলে শঙ্খ যে এইবার সেই একখানা গাড়ি কিনে ফেলেছে, এটা যেন একটা খবরের মত খবরই নয়। শিবনাথ বললেন, তাই শুকনো শুকনো জবাব দিল।

তারপরই কিন্তু হঠাৎ একটা ইচ্ছে মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। বর্ধমানে যাচ্ছে ওরা। তার মানে কুতুলপুরের ওপর দিয়েই। তার মানে টুনির বাড়ির কাছ দিয়ে।

ট্রেন নয় যে সামনে দিয়ে চলে গেলেও অমোঘ নিয়মে চলেই যাবে,থামতে বললে থামবে না। এ বাবা নিজের ইচ্ছেয় থামা চলা, আর সেই থামা চলাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিবনাথের নিজের ছেলের হাতে।

সে বাড়ি শঙ্খ চেনে না, কিন্তু শিবনাথ তো চেনেন ? অবিশ্যি বহুকাল যাননি, তবু ভুলে যাননি। আর যদিই বা ভুলে যান, বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তীর বাড়ি বললে সবাই দেখিয়ে দেবে। নামকরা লোক ছিলেন টুনুর শ্বশুর।

গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে নিয়েই চট করে বলে ফেলা যাবে, এই তো ! শঙ্খ এখানেই থামা। এখন আর তোদের নামতে হবে না, যাচ্ছিস একজায়গায়, ফেরার সময় আমায় তুলে নিয়ে যেতে তো নামতেই হবে, তখন দেখা করে যাস পিসির সঙ্গে।

শঙ্খ বিবেচক ছেলে, শিবনাথও কিছু অবিবেচক বাপ নয়। অন্যবাপ হলে হয়তো বলতো, সে কি কথা, একবার নামবি না ? পিসিকে একটা পেন্নাম করে যাবি না ? পিসি বলবে কী ? কিন্তু শিবনাথ বোঝেন, যাবার পথে বাধাবন্ধ না করাই ভাল।....

টুনুর বাড়ি যাবার কথা চিন্তা করতেই ভারী মন কেমন করে ওঠে বিধবা ছোট বোনটার জন্যে। আহা বেচারী চিরদিন গরীব। স্বামী থাকতেও যা, এখনো তাই। স্বামী তো ছিল অপদার্থ।... এই তো কলকাতা থেকে কতই বা দূরে, সাতজন্মে একবার আসতে পারে না, কেউ আনেও না। কেইবা আনবে ? শিবনাথের স্ত্রী। বেচারী টুনির বৌদিটি মারা যাওয়ার পর থেকেই ভাইয়ের বাড়ি আসা ফুরিয়েছে টুনুর। শিবনাথ যেতেন মাঝে মাঝে 'এটা ওটা' নিয়ে। রিটায়ার করার পর সেও বন্ধ হয়ে গেছে। তিন সাড়ে তিন বছর দেখেননি বোনটাকে।

তাই ঠিক ! শিবনাথ আজ এদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন, ওই পথ দিয়েই তো যাবি, যাবার সময় আমায় তোদের পিসির বাড়ি নামিয়ে দিয়ে যা, পরশু ফেরার সময় ফের তুলে নিয়ে যাবি।

তারপর হেসে হেসে বললেন, তেল পোড়ানো নিয়ে তোকে বলছিলাম, দেখ এখন আবার কেমন সুবিধেটি এঁচে নিলাম। যাক আরো খানিকটা উসুল হবে।

যতই ভাবতে থাকেন, ভারী একটা পুলক অনুভব করেন শিবনাথ। ভাবতে থাকেন টুনি হঠাৎ দাদাকে দেখে কী পরিমাণ খুশী হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন, এবারে পেন্সনের টাকাটা থেকে বেশ খানিকটা নিয়ে যাবেন

টুনির জন্যে। মাসে মাসে নাম রক্ষার্থে যে পঁচিশটি টাকা মনি অর্ডার করেন টুনির নামে, সেটা এবার দেওয়া হয়নি এখনো, তার সঙ্গেই আর গোটা পঞ্চাশ দিয়ে দেবেন ছেলে পুলেরা মিষ্টি খাবে বলে।

পেন্সনের টাকাটা তো আজকাল জমেই যাচ্ছে, শঙ্খ আর নিতে চায় না আজকাল, শিবনাথও ওদের এই সমারোহের সংসারে সেই অকিঞ্চিতকরটুকু দিতে চাইতে লজ্জাবোধ করেন। একদা যে ওইটির প্রত্যাশায় তারিখের দিকে দৃষ্টি হেনে বসে থাকতে হতো। সেকথা এখন আর কারুরই মনে পড়ে না।

যাবেন ঠিক করে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী বার করে রাখলেন, রাখলেন টাকাটা, কিন্তু ঝপ করে বলে ফেলতে পারছেন না, তোদের সঙ্গে আমিও চলছিরে— !

আসলে ভাষাটা ঠিক মনঃপুত হচ্ছে না, বারবার মুসাবিদা করছেন, কিন্তু ডেকে কথা বলার অনভ্যাসেই বোধহয় কোনো মুসাবিদাই কার্যকরী হয়ে উঠছেনা। ওরা সামনে দিয়ে ঘুরছে ফিরছে বেরুচ্ছে ঢুকছে, শিবনাথ মাঝে মাঝে কেশে নিচ্ছেন।

অবশেষে বলেই ফেললেন।

বললেন যেন খাপছাড়া ভাবে, বলে উঠলেন, তোমরা বেরোচ্ছো কখন ?

উভয়কে সম্বোধন করার অভ্যাসে ছেলেকে 'তুই' করে কথা বলাটা প্রায় ভুলেই গেছেন শিবনাথ।... ছেলে যখন একা থাকে ?

নাঃ তেমন সুবর্ণ সুযোগ জোটে না শিবনাথের । ছেলেকে 'একা' দেখার সৌভাগ্য এক মিনিটের জন্যও কই হয় না।

শঙ্খ জানে, অনাবশ্যক প্রশ্ন রুচিরা পছন্দ করে না। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠে, এইতো খাওয়ার পরই, দুটো আড়াইটে নাগাদ।

শিবনাথ বলেন, তাই ভাল, শীতের দিনে দুপুরে দুপুরে গেলেই ভাল।

শঙ্খ রুচিরার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে ফেলে, হ্যাঁ সেই জন্যেই তো—।

ও বেচারারও জ্বালা কম নয়, বাবার সব কথাই এমন বোকার মত। রুচিরার বাবার সঙ্গে তুলনা করলে মাথা কাটা যায়।

ওদিকে শিবনাথ যাকে বলে ফাঁড়া খন্ডে যাক নীতিতে ঝুলে পড়েন, ভাবছি, আমিও তোমাদের সঙ্গে গাড়িতে চলে যাই !

গাড়িতে চলে যাই !

তোমাদের সঙ্গে।

কথাটা বাংলা ভাষা ? না অন্য কিছু ?

ধাক্কাটা সামলে শঙ্খ বলে, আপনি ? মানে আপনি বর্ধমানে—।

শিবনাথ অপ্রতিভ হতে হতে অকারণ খানিকটা জোরে হেসে নিয়ে বলেন, দিয়েছি, তো চমকে ? আরে বাবা, বর্ধমানে তোমাদের ওখানে কি আর ? কুতুলপুরের ওপর দিয়েই তো

যেতে হবে ? আমায় তোমরা টুনুর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ফেরার সময় আবার আমায় পিক আপ করে নেবে। কতকাল দেখিনি। কবে আছি কবে নেই। তাছাড়া লোকমুখে ভাইপোর বোলবোলাও শুনছে টুনছে তো, গাড়ি কিনেছে দেখলে আহ্লাদে মরেই যাবে। চিরকেলে পাগলী তো।

এতক্ষণে রুচিরা কথা বলে।

বেশ শান্তভাবেই বলে, সে তো বোঝাই যায়। কিন্তু খামোকা পিসিটিকে মেরে ফেলাই কি ভাইপোর উচিত হবে ?

শিবনাথের জিভটা শুকিয়ে ওঠে, তবু শিবনাথ মিথ্যে খানিকটা হেসে বলেন, আহা সত্যি কি আর মরবে ? অধিকটা বোঝাতেই লোকে 'মরা' কথাটা বলে তো ? যাক আমিও তাহলে ঠিকঠাক হয়ে নেব।

শঙ্খ আস্তে পাশের মুখটার দিকে তাকায়, শঙ্খর মুখটা শাদাটে দেখায়, তবু শঙ্খ গম্ভীর ভাবে বলে, ঠিক আছে।

যাক বাবা ! ভয়ের ঘাটটা পার হয়ে যাওয়া গেছে। শিবনাথ জানেন না ভয়টা কিসের। তবু শিবনাথের কথা বলতে ভয় ভয় করে।

এখন ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন শিবনাথ ভাবতে থাকেন, দাদাকে হঠাৎ দেখে টুনি কী বলবে, কী করবে, কী খাওয়াতে বসবে, এবং শিবনাথ তার জবাবে কী করবেন, কী বলবেন !

নাঃ সত্যি, গাড়ি একটা থাকা রীতিমত সুখের।

বলি বটে বাবুয়ানা, কিন্তু ঠিক তা নয়, গাড়ি যেন একটা মুক্তির দূত।

ওদের আগেই খেয়ে নেন তাড়াতাড়ি, একটু বিশ্রাম করে নেওয়া ভাল, যতই হোক অনেকখানি জার্নি ! ...কিন্তু বিশ্রাম কোথায় ? দু'মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখলে কি আর বিশ্রাম হয় ?

তাইতো করছেন শিবনাথ, অবিশ্রাম ঘড়িই দেখছেন বিশ্রামের বদলে।

কিন্তু কী হল ?

ওদের আর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? খেয়ে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ? শীতের দুপুরে, খেয়ে উঠে শুয়ে কি আর সহজে উঠতে পারবে ? বেলা গড়িয়ে যাবে। নাই হোক ট্রেনের সময়। সময় একটু থাকা ভাল।

আবার ঘড়ি দেখেন।

আড়াইটা ছাড়িয়ে তিনটে বেজে গেল যে !

আর পারলেন না শিবনাথ, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গুটি গুটি, আস্তে ডাকেন, শঙ্খ !

প্রথমটা আস্তে ডাকাই ভাল, হঠাৎ জোরে ডাক শুনে জেগে উঠলে ক্ষতি হবে।

কিন্তু না, ঘুমোচ্ছে না শঙ্খ।

ডাকা মাত্রই বেরিয়ে আসে সে।

শিবনাথ বললেন, কী হল ? তিনটেও বেজে গেল যে ? কখন বেরোবে ?

এই একবার একা পেলেন ছেলেকে, তাই হেসে বললেন, খেয়ে শুয়ে পড়েছিলি তো ?

শঙ্খ বলল, বেরোনো তো হচ্ছে না।

শঙ্খর গলা নির্লিপ্ত নিথর।

শিবনাথ থতমত খেয়ে বলেন, বেরোনো হচ্ছে না !

শঙ্খ তেমনি পাথুরে গলায় বলে, না ! হঠাৎ দারুণ মাথা ধরে গেছে ওর, যাওয়া সম্ভব হবে না।

দারুণ মাথাধরা !

রুচিরার !

না, তাহলে আর যাওয়ার কথা উঠতে পারে না।

তবু নির্বোধ শিবনাথ বলে ফেলেন, ছুটির একটা দিন তো তাহলে গেল।

শঙ্খ একটু হাসির মত করে বলে, একদিন কেন দু'দিনই গেল। একদিনের জন্যে যাওয়ার তো কোনো মানে হয় না।

তাইতো বটে ! যার কোনো মানেই হয় না, তাই নিয়ে আর ভাবতে বসবেন না কি শিবনাথ ? বরং অন্য অনেক জরুরি ব্যাপার নিয়ে ভাবুন বসে বসে।

কিন্তু শিবনাথ যেন ভাবতেও ভুলে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে, নচেৎ শঙ্খ তো কথা অন্তেই আবার তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেছে বোধ করি রোগিনীর সেবা করতেই, পর্দাটা এখনো দুলছে !

কিন্তু দুলন্ত পর্দা এমন একটা কী দৃশ্য যে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে ?

না কি শিবনাথের চোখের সামনে আরো কিছু দুলছে ?... ওই দরজা জানলা দেওয়াল ছাদ, সংসার পৃথিবী ! তাই ভাবতে পারছেন না কিছু ?

না কি ভাবছেন, এরপর যদি কোনো দিন শঙ্খনাথ নামক ব্যক্তিটির গাড়িতে চড়তে না যায় শিবনাথ নামের লোকটা, তাহলে তো ওই লক্ষ্মী ছাড়া হতভাগা হিংসুটে লোকটারই নিন্দে হবে ?

হবে না নিন্দে ?

যে লোক ছেলের বাড়বৃদ্ধিতে হিংসে করে এমন কুচুটেপনা করে তার কি নিন্দে না হয়ে প্রশংসা হবে ?

অতএব লোকটাকে—

না, এখন আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

পর্দাটা থেমে গেছে, তবু পৃথিবীটার দুলুনি থামছে না।

❑

বঞ্চক

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ওরা কিছুক্ষণ সেই ধুলো-ওড়ানো রাস্তার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে দাঁড়িয়ে থেকে, হঠাৎ 'চুলোয় যাক্ আমাদের কি !' বলে হন হন করে চলে গেল।

ট্যাক্সিটা অনেক রাস্তা পাক খেয়ে আর পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল এক বিয়ে বাড়ির সামনে। বিয়েটা হচ্ছে প্রায় ত্রিশ হাজারি বিয়ে ! তদনুপাতে আলোকসজ্জা, মণ্ডসজ্জা, তোরণসজ্জা।

সাজসজ্জায় এই সব সজ্জার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ট্যাক্সি থেকে নামলেন অনিন্দিতা সেন আর তার বিবাহিতা কন্যা অজন্তা বোস।

এহেন দিনে ট্যাক্সি চেপে আসতে হ'ল বলে দুঃখের শেষ নেই অনিন্দিতা সেনের। কিন্তু কি করবেন, ভাগ্য বিরূপ ! দিন বুঝে কিনা আজই স্বামী অফিসের কাজে গাড়ি নিয়ে বারাসত না সোনারপুর কোথায় যেন গেছেন। ফিরতে রাত হবে। কথা আছে, একেবারে সোজা তিনি বিয়ে বাড়িতেই আসবেন।

বিয়ে বাড়িটা অনিন্দিতা সেনের ভাইয়ের বাড়ি, বিয়েটা তাঁর ভাইঝির। কদিনই আসা যাওয়া করছেন, সকালেও ঘুরে গেছেন কিছুটা ঘরোয়া সাজে। এখন সকন্যা ট্যাক্সি থেকে নামলেন জরিতে জড়োয়াতে কাচেতে পুঁতিতে ঝিলিক মেরে।

নামলেন হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে। বর এসে গেছে কিনা, এক ব্যাচও লোক ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে কি না, এই সব প্রশ্নে মুখর হলেন অনিন্দিতা নেমেই।

মেয়ে অজন্তা বোস অত মুখর নয়, কিন্তু সাজটা চোখ ধাঁধানো। তার সমবয়সী এবং চিরদিনের প্রিয় সখী মামাতো বোনের বিয়ের বাসরে পরবে বলে সে এক অভিনব পোশাকই তৈরি করিয়েছে। বাঙালীর মেয়ের সাজ নয়, লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীর সাজ। ওড়না, ঘাগরা, চোলি, ঝাঁপটা, চিক, রতনচূড় ইত্যাদি মিলিয়ে নতুনত্ব একটা করেছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ওরা মা মেয়ে নামতেই অনেকে যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, সে কি ওদের মা মেয়ের সাজের বাড়াবাড়িতে ?

এত দৃষ্টিশূল হল লোকের ওদের সাজ ?

বাড়াবাড়ি সাজ আরও যে কেউ করেনি তা তো নয় ! ওই তো মণিকা রায় মাথার ওপর এমন কিম্ভূত একটা খোঁপা বসিয়েছে, মনে হচ্ছে ওটা কোনো সর্দারজীর পাগড়ী ! ওই তো হেনা হালদার তার দু'হাতের দশটা নখ এমন ভাবে বাড়িয়েছে যে, আঙুলের লম্বার চেয়ে নখের

লম্বা বেশি লাগছে। কে জানে এই বিয়েটাকে লক্ষ্যে রেখে কত মাস থেকে নখ বাড়াচ্ছে সে! নখগুলোকে তিন রঙে রাঙিয়েছে হেনা হালদার।

কিন্তু ওদের দিকে তো কেউ অমন করে তাকাচ্ছে না?

অমন অদ্ভুত, বিহ্বল ত্রস্ত দৃষ্টিতে!

আর বিয়ে বাড়ির সমস্ত সমারোহ্ আর আনন্দ কলরোলের তলায় তলায় চাপা অস্বস্তি আর মৃদু বিদ্রোহের যে একটা গুঞ্জন চলছে?

সে কাদের উপলক্ষ করে?

যেখানে দুটো মানুষ কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে, কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আর ফিস ফিস করে কথা বলছে! সে কিসের কথা?

আঙুল কেউ বাড়াচ্ছে না, কিন্তু বিয়ে বাড়ির এতগুলো লোকের চোখ আর মন যেন তীক্ষ্ণ একটা আঙুলের ডগা হয়ে ওদের দিকে বাড়িয়ে রয়েছে। অনিন্দিতা সেন আর তাঁর মেয়ের দিকে।

কিন্তু মজা এই, ওরা কিছু টের পাচ্ছে না। ওরা নিজেদের খুশিতে ডগমগ করছে। অনিন্দিতা সেন অনর্গল কথার স্রোতে স্বর্গ-মর্ত পাতাল এক করে বেড়াচ্ছেন, আর অজন্তা বোস মক্ষীরাণী মধ্যমণি হয়ে বসেছে মেয়ে মহলের মাঝখানে, ছটা বিকীর্ণ করে।

তবু—

অজন্তা ভাবছে, চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা? মনে হচ্ছে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, কোনখানে যেন তাল ভঙ্গ হয়েছে, অজন্তার আঙুলের ছোঁয়া যেন ঠিক তারে পৌঁছচ্ছে না!

লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীর সাজটা কি তাহলে দৃষ্টিকটু লাগছে লোকের? কিন্তু তাই বা কেন? অজন্তার বিয়ের দিন, এই তো সেদিনের কথা, তার এই মামাতো বোন কাশ্মীরী ফলওয়ালা সেজে বাসরে নেচে গেয়ে কী মাৎটাই করেছিল! আর কী উপভোগই করেছিল সবাই সেই নাচ গান আমোদ! বছর দেড়েক হয়ে গেছে বলেই কি অজন্তা এত বুড়ি হয়ে গেছে?

যাক্ বর এসে বাসরে বসুক, দেখিয়ে দেবে একবার অজন্তা। হাসিতে আর গানেতে, চাপল্যে আর ঔজ্জ্বল্যে, বর বেচারাকে বুঝিয়ে ছাড়বে, হ্যাঁ শ্যালিরত্ন একখানি লাভ হয়েছে বটে তার।

অনিন্দিতা অত কিছু ভাবছেন না।

অনিন্দিতা শুধু ঝলসে বেড়াচ্ছেন।

কী রে এয়োরা, উলু দিতে পারবি তো? তা বাপু যে যাই বলিস, যতই তোদের ফ্যাসানের বিয়ে হোক, উলু নইলে বিয়ে বাড়ি জমে না।

ও মা তোমাকে তো এতক্ষণ দেখিনি ভাই, কখন এলে? এই সাত লহর হারটা বুঝি নতুন গড়িয়েছ?..ওরে বাবা, ও উষসী, কী 'মার কাটারী' শাড়ি একখানা পরেছিস বাবা!

কোথায় কিনলি ?— এই এই, অ ছেলেগুলো, পরিবেশনের ছুতো করে চপ ফ্রাই সাঁটছিস তো ? পান কে দিচ্ছিস রে ? পান ? দে না বাবা এদিকে এক খিলি।··· কনের মা কোথায় গেল ? চোখে ত দেখছি না একবার। অ বৌদি, শাশুড়ী না হতেই যে পায়া ভারী হয়ে উঠল তোমার।

মুখের যেন বিশ্রাম নেই। যেন বিশ্রাম দেবেন না অনিন্দিতা সেন, এমন পণ।

বর এসেছে—বর এসেছে !

হৈ হৈ রব উঠল প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত। যত লোক, তত উচ্ছ্বাস। আর বর আসা নিয়ে যারা উচ্ছ্বাস করে, তারা ঠিকই আছে। তাদের সুর কাটেনি। তারা ছেলের দল।

এখানে—

কটাং করে বড় একটা সুর কাটল। কাটল এয়ো ডালা ধরবার সময়। অজন্তা আসছিল 'শ্রী'র থালাটা ধরতে, যে 'শ্রী'টাতে নিজেই সে বহুল পরিমাণে কারুকার্য করে গেছে সকালবেলা মায়ের সঙ্গে এসে।

অজন্তার মামী, কনের মা সহসা ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে 'শ্রী'র থালাটা অজন্তার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, থাক থাক ! ঘাগরা ওড়না পরে এসব এয়োর কাজ হয় না—

অপমানে অভিমানে অজন্তার চোখ ছলছলিয়ে এল। বলল, আগে কেন বললে না মামী, তাহলে এসব ছেড়ে শাড়ি পরতাম—

মামী বেজার মুখে বললেন, দরকার কি ? এয়োর তো অভাব নেই। সাত এয়ো ছেড়ে সাতাত্তর এয়ো জমেছে।

কথাটা সত্যি।

জমেছে।

কিন্তু অজন্তা কি সেই ভিড়ের একজন ?

বড়লোকের মেয়ে আর বড়লোকের বৌ সুন্দরী অজন্তা মামা বাড়িতে কি এযাবৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাধান্য পেয়ে আসছে না ?

ঠোঁট কামড়ে ভাবল অজন্তা, ঘাগরাটাই ভুল হয়েছে আমার।

কিন্তু আশ্চর্য !

সবাই তো জানতো। ওড়নাটা তো মামীর সঙ্গেই মার্কেটে গিয়ে কিনে এনেছে অজন্তা বিয়ের বাজারের সময়।

আর কিছু নয়, ওই যে হাজারখানেক মেয়েমানুষ জুটেছে, তারাই এই সব গুলতানির আমদানী করছে। যাক, এয়োর কাজে কাজ নেই তার, বাসর আলো করে শুধু বসেই থাকবে সে।

কিন্তু তাতেও যেন সায় নেই বিয়েবাড়ির।

কলকল্লোলের তলায় তলায় যে মৃদু বিদ্রোহ আর চাপা অস্বস্তির গুঞ্জন উঠছিল, সে আর

মৃদুও থাকছে না, চাপাও থাকছে না।

তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে, রুদ্ররোষে ধিক্কার দিয়ে উঠতে চাইছে। নীচের তলায় খুরি গেলাসের ঘরে চক্রবৈঠক ডাকা হয়েছে।

অনিন্দিতা সেনের দুই দিদি আছেন এ বৈঠকে, আছেন কনের মা আর তাঁর বড় বোন, স্বয়ং কনের বাবাকেও ডাকা হয়েছে। তিনি এলেন বলে।

উত্তেজিত স্বর উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠছে—এই রকমই চালিয়ে যাবে নাকি ? ন্যাকামি !—এরপর হয়তো কড়ি খেলাতে বসবে ! বাসরের বিছানায় তো আগে থেকেই অধিষ্ঠান হয়ে আছে ? তা' অনিকে ডাক ? তাকে ডেকে চৈতন্য করিয়ে একটা বিহিত করা হোক ? কী দিনে কী কান্ড ! এখন—সোরগোলও তুলতে পারছিনে, বিয়ে বাড়ির সব 'ইয়ে' পন্ড হোক, তা চাই না। কিন্তু—

কনের দাদা এসে দাঁড়ালো। বিপন্ন বিব্রত মুখ, কপালে কুঞ্চন।

কী হল ? কী ঠিক করলে তোমরা ?

তোমরা যা বলবে তাই হবে। ওঁকে তো ডেকে পাঠিয়েছি, আসছেন কই ?

আসছেন। ওদিকে আমার অফিসের লোকজন খেতে বসেছে—

কন্যাকর্তা এলেন।

এলেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে। তাঁর মুখেও বিষণ্ণতার ছাপ নেই, আছে বিপন্নতার।

আমি বলছিলাম কি—যেমন চলছে চলুক না। অনি যখন জানেই না। ও সেন মশাই যা বুঝবেন—

আ-হা-হা, কী বুদ্ধিমানের মতন কথাই হ'ল।' কনের মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আমার একটা মাত্তর মেয়ে, আর তার বাসরে—

যে বাক্য শেষ অবধি উচ্চারিত না হয়ে থেমে যায়, তার ওজন অনেক বেশি। কনের বাবা মাথা চুলকে বলেন, তবে না হয় একটা কাজ কর। বল, সেন মশাই বারাসত থেকে ফিরে আর এখানে এসে উঠতে পারেন নি, খবর দিয়েছেন শরীর খারাপ, অতএব অনিন্দিতা আর অজন্তা যেন—

কথাটা মনঃপুত হল এদের !

হ্যাঁ বাবা, যতই হোক পুরুষের মাথা। এতে বিয়ে বাড়িতেও সোরগোল উঠবে না, অথচ মা মেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতেও পথ পাবে না !

অজন্তা তখন বাসরে বসে কনের কানের কাছে শখের আক্ষেপ জানাচ্ছিল, দেখেছিস তো ভাই কী অসভ্য লোক ! এল না। অথচ কী অনুরোধ উপরোধ ক'রে চিঠি দিয়েছি আমি। মামা মামী তো দিয়েইছেন। এরকম একটা ঘটার বিয়েতে লোকে বিলেত থেকে নেমন্তন্ন খেতে আসে, আর এতো মাত্র ক'ঘন্টার রাস্তা দুর্গাপুর !... আচ্ছা ভাই বর, তুমিই বল তো, তোমাদের এসব নিষ্ঠুরতা নয় ?

বর কি উত্তর দিত কে জানে, কনের দাদা এসে গম্ভীর গলায় ডাক দিল, অজন্তা, তুমি একবার এদিকে এস।

বুকটা কেঁপে উঠল অজন্তার। ডাকটা যেন বিপদের সঙ্কেত বাহক। উঠে গিয়ে বলল কী রাঙাদা ?

বলছি, মানে, পিসেমশাইয়ের একটু ইয়ে, শরীর খারাপ হয়েছে, তোমাদের চলে গেলে ভাল হয়।

মুখটা শুকিয়ে গেল অজন্তার। বলল, বাবা কি শরীর খারাপ বলে চলে গেছেন রাঙাদা ?'

না তো ! পিসেমশাই তো আসেনই নি !

আসেনই নি ? মা ? মা কোথায় ?

নিচের তলায় কোথায় যেন রয়েছেন।

মামাতো দাদা চলে গেল তাড়াতাড়ি।

যেখানে বিপদ, সেখানে 'হৃদয়' দাঁড়াতে পায় না !

অনিন্দিতাকেও সে-ই বলতে এল।

অনিন্দিতা প্রথমটা আকাশ থেকে পড়েছিলেন, 'ওমা কী কান্ড ! তোর পিসেমশাই আসেননি নাকি ? আমি মনে করেছি বাবু খেয়ে দেয়ে চলে গেছেন, না বলে—'

উচ্ছ্বাসটা হঠাৎ কেমন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল অনিন্দিতার চারিদিকের স্তব্ধতার প্রাচীরে ঠেকে।

তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন মেয়েকে নিয়ে।

গাড়ির লাইন ছিল দুটো রাস্তা জুড়ে, তার থেকেই কার একখানা গাড়ি পৌঁছে দেবার ভার নিল।

অজন্তা ব্যাকুল হয়ে ভাবছিল, না জানি বাবাকে গিয়ে কেমন দেখবে ! রুপুর বিয়ের রাতে গিয়ে বাবা দাঁড়ালেন না ! তার মানে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু অনিন্দিতার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না তিনি কী ভাবছেন। দিন বুঝে স্বামীর এই শত্রুতা সাধায় কি এত বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন অনিন্দিতা যে, মুখটা পাথরের মত হয়ে উঠেছে তাঁর ? চোখ দুটো কাচের চোখের মত ?

জরিতে সোনাতে কাচেতে পুঁতিতে ঝলসে গাড়ি থেকে নেমেই অজন্তা থতমত খেল। অসুখ কোথায় বাবার ? বাড়ির সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তো !

ব্যাপার কী !

ছুটে এগিয়ে এল, বাবা, কি হয়েছে তোমার ?

মিস্টার সেন ভারী থমথমে গলায় বললেন, বাড়ির মধ্যে যাও।

এ স্বরে অজন্তার চোখে জল এল।

এ কী !

আজ সবাই মিলে তাকে অপমান করছে কেন ?

বেনারসী ওড়নার আঁচল চোখে চেপে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল অজন্তা।

ঢুকে যাচ্ছিলেন অনিন্দিতাও।

স্বামীসম্ভাষণ না করেই যাচ্ছিলেন। রাগের মাত্রাটা প্রখরভাবে প্রকাশ করতেই হয়তো।

সেন বললেন, তুমি দাঁড়াও !

অনিন্দিতা ফিরে দাঁড়ালেন।

সাদা বেনারসীর জমকালো আঁচলটা ঝলসে উঠল। আর যেন বিদ্রূপে মুখটা কুঁচকে গেল অনিন্দিতার। বললেন, কী, অপরাধের বিচার হবে ? কোর্ট মার্শাল ?

সেন ধৈর্য হারালেন।

ধমকে উঠলেন, থামো ! কথার জবাব দাও আগে। তোমাদের বেরোবার আগে দুর্গাপুর থেকে দুজন লোক এসেছিল ?

অনিন্দিতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, এসেছিল।

কী বলেছিল ?

অনিন্দিতা আরও স্থির স্বরে বললেন, কিছু বলতে পায় নি। বলতে দিইনি আমি।

বলতে দাওনি ?

না।

হ্যাঁ, সত্যিই বলতে দেননি অনিন্দিতা।

তারা বলেছিল, দেখুন আমরা দুর্গাপুর থেকে আসছি—

অনিন্দিতা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। অনিন্দিতা তাদের মুখের লেখা পড়ে ফেলেছিলেন। তাই অনিন্দিতা দ্রুত ব্যস্ত ভঙ্গীতে বলেছিলেন, দেখুন, দয়া করে কাল একবার আসবেন, আজ আমি বড় ব্যস্ত, বেরিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি—

ওরা ব্যাকুল আবেদনে বলতে চেষ্টা করেছিল, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের কথাটা ভয়ানক জরুরী। নিশীথ বোস আপনারই জামাই তো ? দুর্গাপুরে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আসতে পারবে না এই তো ? জানি আসবে না। ঘটা করে বলে পাঠাবার দরকার ছিল না—

অনিন্দিতা দেবী মেয়েকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লেন।

ওরা অস্থির হয়ে প্রায় গাড়ির দরজার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আপনি আমাদের কথাটা একবার শুনুন— আজ বেলা এগারটার সময় মিস্টার বোস—

বেলা এগারটায় ? অনিন্দিতা দেবী বলে উঠেছিলেন, এগারটায় আসবে ? তখন ট্রেন কোথায় ? 'বাই কারে' আসছে বুঝি ? তবু ভাল । আচ্ছা নমস্কার ! কিছু মনে করবেন না, বড় ব্যস্ত।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল

ট্যাক্সিখানা।

অজন্তা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেছিল, কী বলছিল ওরা মা ?

অনিন্দিতা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন কথাটা।

বলেছিলেন, বাছাধন আমার আসতে পারবেন না, তাই দোষ কাটাতে খবর পাঠিয়েছেন। আবার বলা হয়েছে পারি তো 'বাই কারে—'

অজন্তা মুখখানা হাঁড়ি করে বলেছিল, জানি আসবে না। গোড়া থেকে বলছে, মামাশ্বশুরের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে ছুটি নেব ? পাগল না কি ?

এ সবের সব কিছুই স্পষ্ট মনে আছে অনিন্দিতার।

সেন ক্রুদ্ধ বাঘের মত একটা গর্জন করে বলে উঠলেন, নেমন্তন্নে যাওয়ার এত তাড়া যে, লোক দুটো কী বলতে এসেছে, তা শোনবার সময় হল না ?

অনিন্দিতা স্বামীর চোখের ওপর চোখ ফেলে আস্তে কেটে কেটে বললেন, কী বলতে এসেছে তা শোনবার তো দরকার ছিল না। কী বলতে এসেছে, সে কথা ওদের মুখেই লেখা ছিল।

তার মানে ? সেন হঠাৎ সালঙ্কারা পরিপুষ্টদেহী স্ত্রীকে একটা ছেলেমানুষের মত দু'হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, কী বলতে চাও তুমি ? ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলে তুমি ? আর নিশীথ মারা গেছে জেনে বুঝেও তুমি—

হ্যাঁ, জেনে বুঝেও আমি। কিন্তু বলতে পার এতবড় এই পৃথিবীটার কতখানি লোকসান গেল তাতে ? আর অজন্তা যখন রঙে রসে রূপে উছলে জীবনের ভরা পাত্রখানি হাতে নিয়ে উৎসব বাড়িতে যাচ্ছিল, তখন সেই মুহূর্তে তাকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে যদি বলতাম,—তোর সব শেষ হয়ে গেছে, বুঝলি তোর সব চুকে বুকে গেছে। তুই আর এ পৃথিবীর কেউ নস্।—তাতেই বা কতখানি লাভ হত পৃথিবীর ?

কাব্য রাখ ! ন্যাকামির একটা সীমা আছে। নিশীথের এক মামা তোমার বৌদির বাপের বাড়ির কে যেন হয়, জান না তা ? সমস্ত বিয়েবাড়িতে কী টি টি পড়ে গিয়েছিল ! আর তখন তোমরা দুই মায়ে ঝিয়ে নাচউলি সেজে—'

অনিন্দিতা এ ধিক্কারে বিচলিত হলেন না। অনিন্দিতা বুঝি বিচলিত হতে ভুলে গেছেন। তাই শান্তস্বরে বলেন, জানতাম বৌদির বাপের বাড়ির কে যেন হয় নিশীথের মামা ! শুধু জানতাম না, ওই অতগুলো সম্পর্কের বেড়া ডিঙিয়ে খবরটা অত তাড়াতাড়ি বিয়ে বাড়িতে এসে ধাক্কা দেবে। ভেবেছিলাম রুণুর বিয়ের আমোদ করবে বলে ছ'মাস ধরে লাফাচ্ছে মেয়েটা, সেটুকু যদি করেই নেয় নিক। জীবনের শেষ আমোদ, শেষ কাজ ! তারপরে সারা জীবন তো রইলই তুষানল। ভাবলাম, অগাধ কাল-সমুদ্রের মধ্যে থেকে তিনটে ঘন্টা চুরি করে নেব, কেউ টের পাবে না। দেখছি তা হল না। সেই চুরিটুকুর ওপর ছুরি শানিয়ে ধরলে বিশ্বসুদ্ধ

লোক—

সেন অনিন্দিতার ওই রং মাখা গালের ওপর গড়িয়ে পড়া অশ্রুরেখার দিকে মিনিট খানেক নির্নিমেষে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ ধিক্কারে বলে ওঠেন, আর্গুমেন্টটা তো বুঝলাম। কিন্তু আশ্চর্য, পারলেও তো ? ও বোঝেনি, তুমি তো বুঝেছিলে ? তার পরও তো পেরেছিলে বিয়েবাড়িতে হুল্লোড় করে বেড়াতে ?

ভেবেছিলাম ওতেই বুঝি লোকের চোখে ধুলো পড়বে। বোকামী ! কিন্তু পারবার কথা বলছ ? মানুষ আবার পারে না কি ? তুমিও তো পারলে— তোমার মেয়ের অনন্ত বৈধব্য থেকে দুটো ঘন্টা কেন চুরি করে নিয়েছি, তার কৈফিয়ত তলব করতে !

কার্বন কপি

লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে রংচটা ওই কাঠের গেটটার সামনে। শেষ হওয়া ছাড়া রাস্তাটার আর গতি ছিল না। কারণ শহরটাও শেষ হয়ে গেছে এখানে।

বাড়ীর পিছনেই রেললাইনের উঁচু বাঁধ। আর ওপাশেই অনেকখানি বালির চড়ার ওধারে একটা বালুনদী। নাম নেই, দেহাতিরা ওর প্রকৃতি বিচার করে একটা নাম দিয়ে রেখেছে। ওরা বলে 'হঠাতি'। তার মানে ওই ওর প্রকৃতি। মাসের পর মাস কোথায় কোনখানে লুকিয়ে আছে, অনড় রোগীর মত পড়ে আছে, হঠাৎ কোনও একদিনের আমাপা বর্ষণে লাস্যময়ী নবযৌবনার মত উথলে ওঠে।

এখন নদীটার অনড় রোগীর মূর্তি।

কিন্তু তখন ছিল ভরা যৌবন। অনেক দিন আগে যখন আর একবার এসেছিল উত্তরা 'ফুলমাটিতে'।

তাই এবারে এসে প্রথমটা চিনতে ভুল হচ্ছিল, 'চৌধুরী বাংলো' নামটা পড়ে নিঃসংশয় হলো।

ভাবল—সেদিন নদীতে জল ছিল, আর সেই ছোট মেয়েটার চোখেও জল ছিল। অবিরাম কান্নায় বালিশ ভিজিয়েছিল সে, আর এক নদী বইয়ে ছিল।

অন্ততঃ উত্তরার পিসিমা সেই কথাই বলেছিলেন, ও-দাদা মেয়ে যে তোমার কেঁদে নদী বইয়ে দিল গো!

কিন্তু পিসিমার দাদা ওই নদী বহানোর মধ্যে আতিশয্যতা দেখেননি, তিনি জানতেন এমন ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়ে এমন অনেক কিছু করে বসে—যা চোখের জলে নদী বহানোর চাইতে অনেক ঘোরালো।

উকিল মানুষ, কেস তো অনেক আসে? দেখছেন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, দেখছেন আত্মহত্যা করতে। তাই সকরুণ হাসি হেসে বলেছিলেন, অমন হয় রে মনীষা। সময় লাগবে সামলাতে!

সামলাবার জন্যেই না মেয়েকে নিয়ে বিভাসবাবু কলকাতার জনসমাজের বাইরে, এখানে এসে উঠেছিলেন। নইলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বোনের একটা বাড়ী আছে বলে, স্বাস্থ্য উদ্ধার করে নিতে আর কবে এসেছেন বিভাস?

উত্তরার মা আসেননি।

উত্তরার মা এটাতে আতিশয্য দেখেছিলেন। যার জন্যে মায়ের এই মর্মান্তিক কষ্ট, সেটা তো মেয়ের নিজেরই বোকামির ফল। তবে ?

যা নিজের দোষে ঘটেছে তার জন্যে আবার এত সহানুভূতি কিসের ? এই অভিমত ছিল উত্তরার মায়ের, উত্তরা যত ধিক্কৃত হবে, যত তার লোকসমাজে মুখ দেখাতে মাথা হেঁট হবে ততই আগামী বছরের চেষ্টা আসবে, শপথ গ্রহণের সঙ্কল্প আসবে।

বিভাস তা' বলেননি।

বিভাস নিজের কাজকর্মের ক্ষতি করে মেয়ে নিয়ে একমাসের জন্যে এখানে এই 'চৌধুরী বাংলোয়' এসে উঠেছিলেন মেয়ের মনের সদ্যক্ষতের উপর একটা পলস্তরা পড়বার সুযোগ দিতে।

এখানে লোকসমাজ কম।

উত্তরার পিসেমশাই অনেক দেখেশুনে এই জমিটুকু কিনেছিলেন বাড়ী করবার জন্যে। শহর ছাড়িয়ে রেললাইনের বাঁধের নীচে।

তা' পিসেমশাইকে আর বেশীদিন সে বাড়ী ভোগ করতে হয়নি, উত্তরার বিধবা পিসীই সময় সুযোগ মিললে এসে হাজির হতেন। কাঠের গেটের গায়ের মরচে-পড়া তালাচাবিটা খুলে ফেলে ঢুকে পড়তেন, থেকে যেতেন কিছুদিন।

সেই 'কিছুদিন'র মধ্যে সেবার বিভাস আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আসার কারণটা পিসী হয় তো ছেলেমানুষী বলে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন— দাদার একটা মোটে মেয়ে, তাই দাদা এত নাচাতে পারছেন। কিন্তু আসাটা পিসীর বড় ভাল লেগেছিল। 'বৌদির' আবরণমুক্ত দাদাকে পেয়ে ছেলেবেলার স্বাদ ফিরে পেয়েছিলেন যেন !

আর বিভাসও হয়তো সে আবরণের প্রভাব মুক্ত হয়ে বদলে গিয়েছিলেন, হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সহজ আবহাওয়ার মধ্যে থেকে উত্তরার চোখের জল শুকোতে বেশী দেরী লাগেনি, ম্যাট্রিক ফেল করার মত মর্মান্তিক শকও সামলে নিতে পেয়েছিল।

হ্যাঁ, উত্তরা তার মায়ের মুখে কালি দিয়ে ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত ! প্রথম দিন প্রশ্নপত্রগুলো হাতে পেয়েই নাকি তার মাথার মধ্যেটা একেবারে ঝাপসা ধূসর হয়ে গিয়েছিল, সেই ধূসরতার মধ্যে থেকে একটা কথাও উদ্ধার করতে পারেনি উত্তরা। শুধু কলম কামড়েছিল, শুধু আকুল হয়ে মগজের সমস্তটা ওলট-পালট করে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা কাজে লাগেনি।

নার্ভাসনেস।

সম্পূর্ণ নার্ভাসনেস !

নইলে পড়াশোনা যথেষ্ট তৈরী করেছিল, বাড়ী এসে সেই প্রশ্নপত্রগুলোকেই টকাটক মেরে নিয়েছিল।

পরদিন থেকে বাকী দিনগুলো দিল পরীক্ষা, কিন্তু প্রথম দিনের ওই ব্যর্থতা সমস্ত উৎসাহ আর চেষ্টাকে শিথিল করে দিল।

ফলশ্রুতি—ফেল।

উত্তরার মা এতটা আশঙ্কা করেননি।

ভেবেছিলেন হয়তো থার্ড ডিভিশন পেয়ে ডোবাবে। একী এ যে মুখে কালির বুরুশ!

উত্তরা ঘর থেকে বেরোয় না, কাজেই কালিপড়ামুখ মায়ের সমস্ত আক্ষেপ আর অভিযোগের ভারটা তার উপর গিয়ে পড়ে। বিভাসবাবু দেখলেন মেয়েটাকে ওর মায়ের কবল থেকে কিছুদিনের জন্যে সরানো দরকার।

তাই মেয়ে নিয়ে ফুলমাটিতে চলে এলেন বোনের কাছে।

তা' বিভাসের বিবেচনাটা ভুল হয়নি।

শুধু শোকই সামলে উঠল না উত্তরা, যেন নতুন রক্তে লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল, নতুন আবেগে চঞ্চল!

কিন্তু সে আবেগ কি শুধুই 'ফুলমাটির' আকাশ বাতাস আর পাখীরা ফুলেরা নিয়ে এসেছিল? সে লাবণ্যের উৎস কি শুধুই 'ওয়েদার'?

বিভাস শতমুখে 'ওয়েদারের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

মনীষা বলতেন, হ্যাঁ, নতুন বর্ষায় এখানের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।'

কিন্তু মনীষা ভাইঝির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন।

আজ আর চৌধুরী বাংলোয় কোনও দৃষ্টি নেই। না স্নেহের, না সন্দেহের। মনীষা মারা গেছেন। অনেকদিন হল গেছেন।

বিভাস খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওকালতি ছেড়ে ফিল্ম ডিরেক্টর বনে গিয়ে বম্বে চলে গেছেন। আর হয়তো উত্তরার মা এতদিনে মনের মত সমাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু উত্তরা?

উত্তরা হঠাৎ যেন সমাজের পক্ষপুট থেকে পিছলে পড়েছে। উত্তরা তার সেই ঘটার বিয়ের স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধর্মাধিকরণের কাছে যে আর্জি পেশ করেছিল, তা' মঞ্জুর হয়েছে। উত্তরা আবার তার বাবার পদবীতে ফিরে গেছে, যে বাবা বলেছেন জীবনে আর ওর মুখ দেখবেন না।

মা ওকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেছিলেন, মা ওর কাজটাকে ম্যাট্রিক ফেল করার চাইতে বেশি গর্হিত ভাবেননি। কিন্তু বিভাস বলেছেন, চুপ! যে মেয়ে আমার মুখে কালি মাখিয়েছে—

উত্তরা একবার মার মুখে কালি লেপেছিল, একবার বাবার মুখে লেপেছে।

আর অবাক হয়ে ভেবেছে উত্তরা, আশ্চর্য, তবু বাবার পদবীটাই গ্রহণ করতে হচ্ছে তাকে! তাছাড়া আর কিছু নেই।

এই অস্বস্তিকর মানসিকতায় হঠাৎ 'ফুলমাটির' কথা মনে পড়ল উত্তরার। মনে পড়ল

'চৌধুরী বাংলোটাকে।'

পিসি নেই, পিসির ছেলেরা তো আছে ? ওদের কাছে বাড়ীর চাবিটা চাইল উত্তরা। বলল, দু' চারদিন থেকে আসব–

ওরা বলল, চাবি খোলা আছে। মালি রেখে দিয়েছি একটা, আর তো যায় না বড় কেউ, শেষে জানলা-দরজাগুলো চুরি হয়ে যাবে ? তা' গেলে ওই মালিটাই রেঁধে বেড়ে দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে–

উত্তরা হাসল। বলল, বল শুনেই যাই তোমাদের 'কথা হচ্ছেটা'। বোধহয় এই পাপীয়সীকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়েছ !

পিসতুতো দাদা বলল, আঃ কী যে বলিস ! কথা এই, ঠিক এই সময়ই অরণি গেছে ওখানে হপ্তাখানেকের জন্যে। ও এলে–

উত্তরা স্থির চোখে তাকাল।

অরণি !

দাদা বলল, হ্যাঁ, অরণি, আমাদের পিসতুতো ভাই ? কেন তাকে তো দেখেছিস ? সেবারে মামার সঙ্গে যখন গিয়েছিলি, অরণি গিয়েছিল যে ?

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, মনে পড়ছে। কিন্তু ওরা থাকতে আর কারো যাওয়ায় বাধা আছে ?

পিসতুতো দাদা মাথা চুলকে বলল, বাধা মানে আর কি, ও তো একা রয়েছে–

কেন ওর স্ত্রী ?

স্ত্রী ? হায় কপাল, মাথা নেই তার মাথাব্যথা ! ওই এক ছেলে ! অমন কাজকর্ম করছে, অথচ না বিয়ে, না সংসার। ওই ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে। কদাচ কখনো ফুলমাটিতে যায়। এবারে–তা' ও তো বলেছে সামনের শনিবার পর্যন্ত থাকবে, তুই বরং রবিবার–

উত্তরা বলেছিল, দেখি !

কিন্তু সেই দেখাটা দেখবার জন্যে যে সেই রাত্রেই ট্রেনে চেপে বসবে উত্তরা, একথা কি ভেবেছিল উত্তরার পিসির ছেলে ?

ভাবেনি।

ভাববে কেন ? ভাববার মত তো কথা নয় ? কিন্তু উত্তরা ভেবেছিল, হয়েছে কি ! বরং তো সুবিধেই। সাতকালের ধুলো জমানো নেই বাড়িতে, রান্নাঘরটা চালু রয়েছে !

ঘরও তো চৌধুরী বাংলোয় গুনতিতে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক।

লাল সুরকির রাস্তাটা শেষ করে সাইকেল রিকশটা থামল। নেমে পড়ে গেট ঠেলে ঢুকে সেই পাঁচটা ঘরের দিকে তাকাল উত্তরা। কোন ঘরটায় যেন ছিল সেবারে ? ওই পিছনের কোণেরটায় না ? রেললাইন দেখা যায় বলে বেছে নিয়েছিল।

না, প্রথমটা বেছেছিল বোধহয় কেবল মাত্র পিছন বলেই। যাতে মুখ দেখাতে কম হয়।

তারপর ঘরটা ভাল লেগে গেল। ঘরের পিছনে বাগান ছিল। তা-ই বলেছিল বাবাকে, পিসিকে।

বাগান আছে এখনো ?

আস্তে এগিয়ে এল উত্তরা, রিকশওলাটার মাথায় নিজের ব্যাগ বিছানা চাপিয়ে।

কিন্তু কই ?

কোথায় কে ? পিসতুতো দাদার পরিবেশিত খবরটা ভুল তা'হলে।

ওকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় জিনিস দুটো ফেলে রেখে মালিকে খুঁজতে রান্নাঘরের দিকে এগোল উত্তরা।

এমনি একটু জনমনুষ্যহীন জায়গার জন্যেই তো তৃষিত হয়ে উঠেছিল উত্তরা, হাতড়ে মরেছিল সেই জায়গা ভাবতে, যেখানে কারো 'দৃষ্টি' নেই। না স্নেহের, না সহানুভূতির, না সন্দেহের।

অথচ—

শূন্য খাঁ খাঁ বাড়ীটা দেখে মনটা বিশ্রী হয়ে গেল কেন ? খাঁ খাঁ করে উঠল কেন ?

মালিকে খুঁজতে বেশী দূর যেতে হল না।

রিকশর শব্দ শুনে নিজেই সে বেরিয়ে আসছিল কোন এক কোটর থেকে। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উত্তরা অপ্রতিভ হ'ল।

বলল, এটা আমার পিসির বাড়ী, বুঝলে ? থাকবো দু'চারদিন—

মালি মাথা চুলকে বলল, চিঠি এনেছেন ?

চিঠি !

আজ্ঞে মানে দাদাবাবুদের কারো চিঠি না হলে—

সেরেছে ! তোমাদের আবার এইসব নিয়ম আছে নাকি ? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে—

মালি সবিনয়ে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, বসুন, একটু বসুন। যে দাদাবাবু রয়েছে এখানে, তিনি এলেই—

উত্তরা এক মিনিট শিথিল হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না।

তারপর নিজেকে চোস্ত করে নিয়ে বলে, দাদাবাবু ? কোন দাদাবাবু আবার ? আমি তো তোমার সব দাদাবাবুদেরই কলকাতায় দেখে এলাম। রমেন, সোমেন, শুভেন—

মালির মুখে এবার হাসি ফোটে। বলে, তবে তো সবই জানেন। ইনি হচ্ছেন 'অরাণী' বাবু ! এই বাড়ীটা অরাণীবাবুর মামার বাড়ী !

ওহো হো তাই বল— উত্তরা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, খুব চিনি। বলতে হয় এতক্ষণ ? তা' কোথায় গেছেন ?

আজ্ঞে পাখী মারতে—

পাখী মারতে ? আজকাল আবার শিকারী হয়ে উঠেছেন বুঝি বাবু ?

মালি হাস্য গোপন করে বলে, 'আজ্ঞে শিকার বলেন শিকার, খেলা বলেন খেলা। যান রোজ ভোরে বন্দুক ঘাড়ে করে। আর পাখী ?'

বুড়ো আঙুলটা তুলে নাচিয়ে নেয় লোকটা। আর এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাঝখানেই আসামীর আবির্ভাব। বন্দুক হাতে বীরের বেশ।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অবাক হয়ে বলে, কে ?

উত্তরা একটু বাঁকা হাসি হাসে, চিনতে পারছ না ?

পারছি বৈকি ! পারছি বলেই তো বিশ্বাস করতে দেরী লাগছে।

খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ?

খুব।

কেন, তোমার মামার বাড়ীতে আসতে আছে, আর আমার পিসির বাড়িতে আসতে নেই ?

নেই কে বললে ? আছে বলেই তো সেই দুর্লভ ঘটনা একাধিকবার ঘটল।

কি মনে হচ্ছে ?

মনে হচ্ছে 'অকস্মাৎ' 'দৈবক্রম' এগুলো কেবলমাত্র উপন্যাসেরই বস্তু নয়।

আর যদি বলি, অকস্মাৎও নয়, দৈবক্রমও নয়, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এসেছি ?

তাহলে সেই মধুর মিথ্যেকে পরম সত্য বলে গণ্য করে স্বর্গসুখ পাবো।

এখনো সেই রকম সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি।

সাজিয়ে-গুছিয়ে হয়তো, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে নয়।

তোমার কাঁধের বন্দুক দেখে ভয় করছে। গুলিটুলি করে বসবে না তো ?

ইচ্ছে করছে।

মালি বোঝে রহস্য আছে।

কারণ বুদ্ধিমানেরা যাদের বোকা ভাবে, তারা যে সব সময়ই বোকা হয় না, তার প্রমাণ হামেসাই মেলে। মালিটা বোকা নয়। আর বোকা নয় বলেই আর বেশীক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার ভূমিকা অভিনয় না করে বলে, দিদিমণি খাবেন তো ?

খাবো বৈকি ! বাঃ খাবো না তো কি উপোস করতে এলাম ? খুব ভাল ভাল খাবো। কী কী রাঁধছ বল ?

মালি বিনীত ভঙ্গীতে জানায়, রান্না এখনো শুরু হয়নি, বাবু পাখী মেরে আনবেন এই আশায়—

এই আশায় !

বাবু ধমকে ওঠে, পাখী আবার আমি কবে আনি হে ? শিকার করতে যাই বলেই শিকার

করে আনতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

উত্তরা মৃদু হেসে আস্তে বলে, 'না তা' নেই বটে। অন্ততঃ তোমার কাছে নেই।

কোণের সেই ঘরটাই নির্দিষ্ট করে দেয় উত্তরা নিজের জন্যে।

অরণি বলে, দক্ষিণের ঘর থাকতে, উত্তরের ঘর—

উত্তরা মৃদু হেসে বলে, উত্তরা যে! আর ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে যার কপালে ঘরই সইল না, তার আর একদিনের ঘরে দক্ষিণের বাতাস লেগে লাভ?

একদিন! একদিন থাকবে বলে এসেছ?

কিছুই 'বলে' আসিনি। একদিনের বেশী থাকা সম্ভব কিনা তাও জানি না।

পিছনের সেই বাগানে এসে বসেছে ওরা। বিকেলের চা খাচ্ছে, বেতের চেয়ার পেতে।

মালিটা সব গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাইয়েছে চর্ব্যচোষ্য করে, আবার রাত্রের ব্যবস্থাকল্পে বাজারের দিকে গেছে। মনে মনে হেসে গেছে, সুবিধে দিয়ে গেলাম তোদের! যার জন্য যোগসাজস করে দুজনে এসেছিস এখানে! ভাবটা দেখাচ্ছিস যেন হঠাৎ যোগাযোগ! যেন এখানে হঠাৎ দেখা! কিন্তু সব বুঝি বাবা!

এরা ধরতে পারেনি ওর মনের কথা। এরা নিশ্চিন্তে চা খাচ্ছে।

অরণি টেবিলে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলে, থাকা অসম্ভবই বা মনে হচ্ছে কেন? ভয় করছে?

করলে হাসির কিছু নেই। অরণি সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে রহস্যভরা গলায় বলেন, অথচ সেদিন ভয় করেনি। যখন বয়েস ছিল—বোধহয় মাত্র ষোল।

ষোল বলেই তো ভয় করেনি! ছাব্বিশ হলে করতো।

অরণিরও কি ভয় করছে?

নইলে অরণির দেশলাই জ্বালতে অত দেরী কেন? কথা শুরু করতে জল খেতে ইচ্ছে করছে কেন?

স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল কেন?

ভাব না থাকলেই বিচ্ছেদ হয়।

ভাবের অভাব কিসের? অত ঘটার বিয়ে—

বিয়েতে তো আসোনি, জানলে কি করে ঘটার বিয়ে?

না এলেও জানা যায়।

আমার খবর রাখার তোমার দরকার কি?

কিছু না! দেশের বহুবিধ খবরই তো রাখা হয়ে যায়।

শুধু এই?

তা' ছাড়া কী হবে?

ওঃ !

মনে হচ্ছে ক্ষুণ্ণ হলে !

হয়তো হ'লাম।

কেন ?

আশা করেছিলাম, বলবে আমার খবরই তোমার ধ্যান-জ্ঞান।

মেয়েরা নিজেরা মধুর মিথ্যা বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে কি ?

উত্তরা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর খুব কেটে কেটে বলে, সেদিন কিন্তু করেছিলাম।

সেদিন ! অরণি বিমূঢ় গলায় বলে, কোন দিন ? কোন মিথ্যে ?

মনে নেই ? সেই ভয়ানক মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করে একটা অবোধ মুখ্যু স্কুলের মেয়ে নিজেকে হারিয়ে বসেছিল, আর—

সে কথাটা মিথ্যা, এই সত্যটাই বুঝি আবিষ্কার করেছ এতদিনে ?

সত্যি তারই বা প্রমাণ পেলাম কই ?

অরণি আর একটা সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে হাতে রেখে দেয়। বলে, হিসেবে একটু ভুল আছে তোমার। মেয়েটা অবোধ মুখ্যু বালিকা, এটা ঠিক বসিয়েছ, কিন্তু ছেলেটা যে নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞান কুড়ি বছরের একটা ছেলে মাত্র, সেটা বসাওনি হিসেবের খাতায়। তা' যদি বসাতে, প্রমাণ পেতে। সহজেই বুঝতে পারতে তার কাছে সেটাই সত্য ছিল। সেই প্রথম ভাললাগাটাকেই সে ভালবাসা বলে বিশ্বাস করেছিল।

কিন্তু মাত্র কুড়ি বছরের মূঢ় ছেলেটার দুঃসাহসের তো অভাব ছিল না কিছু ?

মূঢ় বলেই অভাব ছিল না। দুঃসাহস তো মূঢ়দেরই !

পিসি তাই বলেছিলেন বটে—

পিসি ! ওঃ মামী ! হ্যাঁ মামী বলেছিলেন 'তোর যদি বয়েসটা সাবালকের কোঠায় পৌঁছত, তা'হলে তোর বাপকে বলে দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়তাম শাস্তি কাকে বলে—'

আমাকেও তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, পরিণাম জানলে আগুনে হাত দিতে যেতিস না। ভগবানের অশেষ দয়া তাই আমি এসে পড়েছিলাম।

ঠোঁটটা কামড়ে তিক্ত একটা হাসি হেসে উত্তরা কথা শেষ করে, বলেছিলেন 'নেহাৎ দয়া করেই একথা দাদার কানে তুললাম না।' অথচ মজা এই, আমি ভেবেছিলাম, অনেক দিন পরে পর্যন্ত ভেবেছিলাম, অতটা দয়া প্রকাশ না করলেও হতো। হয়তো বাবার কানে তুললে—

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অরণি। ওর মুখের রঙটা অস্বাভাবিক লাল দেখায়। ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা যেন টেবিলের এধারে এসে উত্তরার গালে লাগে।

টেবিলের এধারে ঘুরে আসে ও।

উত্তরার কাঁধের দিকে এসে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, ভয়ানক একটা চাপা

অথচ উদ্ধত গলায় বলে, তোমার পিসি, আমার মামী, সেই মহিয়সী মহিলাটি যা করেছিলেন, প্রকৃতির আইনে সেটা জঘন্যতম অপরাধ তা' জানো ? অথচ তিনি এটা করতে সাহস পেয়েছিলেন, সামাজিক নিয়মে আমাদের বয়েস তখনো নাবালকত্বের গণ্ডিটা অতিক্রম করেনি বলে।

থাক তাঁর কথা···উত্তরার রক্তের মধ্যে একটা উত্তাল সুর বাজছিল, উত্তরার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটাছুটি করছিল, উত্তরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, বুঝি সাবালক অরণি তীব্র আক্রোশে সেই নাবালক ছেলেটার ওপর অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, তবু কষ্টে কথাকে সহজ সুরে শেষ করেছিল সে, তিনি বেঁচে নেই।

উত্তরা যা আশঙ্কা করছিল—(নাকি, শুধু আশঙ্কাই নয়, আশাও ?) তা যদি অকস্মাৎ ঘটে যেত, হয়তো উত্তরা বাধা দিতে ভুলে যেত, হয়তো ওই বালুনদী 'হঠাতির' মত বালুস্তর ভাসিয়ে দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠত, কূল ছাপিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ভাঙত !...কিন্তু উত্তরার আশা আর আশঙ্কা দুই-ই থমকে থাকল।

অরণি সরে গিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগল।

উত্তরার ঘামে ঠাণ্ডা হাতটা আবার স্বাভাবিক উষ্ণতায় ফিরে এল।

কখন যেন পড়ন্ত বেলার সূর্য বিদায় নিয়েছে...চেতনায় এল যখন সমস্ত বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, দু'জনার কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

অরণি পায়চারি করতে করতে আবার সরে এসেছে, টেবিলের দুটো কোণ চেপে ধরেছে। আর তার মৃদু ভাঙা ভারী গলাটা থেমে থেমে উচ্চারণ করছে, তিনি মারা গেছেন কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি ? সেদিনের সেই অবিচারের শোধ নেওয়া যায় না উত্তরা ? এই সন্ধ্যাটাকে ঊনিশশো তেষট্টির মনে না ক'রে ঊনিশশো তিপান্নর মনে করা যায় না ? আমরা তো দু'জনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি না, কী এসে যায় যদি আমরা ভেবে নিই, আমাদের ওপর দিয়ে প্রায় একটা যুগ চলে যায়নি ! যদি ভেবে নিই, সেই আবেগ, সেই রোমাঞ্চ, সেই মরে যাওয়ার মত অসহ্য সুখের মুহূর্তে কেউ এসে রক্তচক্ষু তুলে দাঁড়ায়নি আমাদের সামনে, আমরা শুধু সেই মুহূর্তটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি...এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি...

অরণি ! তুমি কী আমায় পরীক্ষা করছ ?

পরীক্ষা ! কী বলছ তুমি উত্তরা ?

হয়তো তুমি ভাবছ, তুমি আছ জেনে, একা আছ জেনে, আমি ইচ্ছে করেই—

নিজেকে অত সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি, এত সঞ্চয় আমার কোথায় উত্তরা ? আমি শুধু মুষ্টিভিক্ষার কাঙালী !

ঘরে চল অরণি ! আলো জ্বালাইগে--

না ! অরণি সবলে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে। বলে, ঘরে গেলে আলো জ্বাললে আমরা হারিয়ে যাব, ফুরিয়ে যাব, সমাজের শেকলে বাঁধা পড়ে যাব। এখানে প্রকৃতি বন্য, নিরাবরণ !

জীবনের একটি সন্ধ্যা কি এই প্রকৃতিকে উৎসর্গ করা যায় না—উত্তরা ?

উত্তরা মৃদু নিশ্বাস ফেলে।

উত্তরার সেই প্রতীক্ষায় উত্তাল রক্তপ্রবাহ 'সমে' এসেছে, সুস্থির গতি পেয়েছে, তাই গলার স্বর আর কাঁপে না ওর। খুব নরম গলায় বলতে পারে, মুষ্টিভিক্ষায় লাভ কি অরণি ?

মনে কর, আমার দুর্লভ সঞ্চয়ের ঘরে জমা রাখবো সেই ভিক্ষাটুকু ! পরে, অনেক পরে, জীবনকে যদি কোনদিন নিতান্ত মূল্যহীন মনে হয়, স্মরণ করবো এই সন্ধ্যাটিকে। তোমার আর কতটুকু ক্ষতি উত্তরা, অথচ আমার অগাধ সমুদ্রের লাভ, অনন্ত আকাশ ব্যাপী লাভ !

অরণি আমায় দুর্বল করে দিও না।

ভুল করছ উত্তরা ! দুর্বলতার অথই জলেই তো ডুবে রয়েছ তুমি ! আমি তোমাকে সেই দুর্বলতার পাথার থেকে উঠে আসতে ডাক দিচ্ছি। সবলে নিজেকে প্রকাশ কর তুমি। তুমি যে তোমার নিজের, একান্ত নিজের, সেই সত্যকে মহিমার সঙ্গে স্বীকার কর। এতবড় জীবনের একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা ! সেটুকু দিতে কিসের এত দ্বিধা তোমার ? তুমি এখন কারো বিবাহিতা স্ত্রী নও, কারো কুমারী মেয়ে নও, আর তুমি তোমার পিসির নাবালিকা ভাইঝিও নও। তুমি তো কেবল মাত্র তোমার !

সে জোর খুঁজে পাচ্ছি না অরণি...

উত্তরা মনে মনে বলে, বরং তুমি সবল হও, তুমি আমায় লুঠ করে নাও...তোমার সেই জোরের কাছে আমি হারিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। মনে মনে এমনি কত কথা বলে উত্তরা। কিন্তু মুখে বলে, আমার বুকের মধ্যে কী রকম যেন করছে ! অন্ধকারে আমার ভয় করছে ! ঘরে চল অরণি, আলোজ্বালা ঘরে।

সমস্ত যৌবনকালটা ধরে শুধু— গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে অরণি, কৃপণতাকে বাড়িয়েছ উত্তরা ! অথচ সেদিন যখন এত লাবণ্যের কিছুই ছিল না—

সেদিনের কথা বারবার তুলো না অরণি ! বরং সেদিনের মত নিজের জোরে কেড়ে নাও আমায়—

অরণি এগিয়ে আসে, আরো কাছে, উত্তরার পিঠটা নয়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, হতাশ গলায় বলে, তা হয় না উত্তরা ! ভিক্ষুক হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।...তুমি এসে একা বাড়ীতে আমায় দেখে তক্ষুনি ফিরে গেলে না, নিশ্চিন্ত মনে রয়ে গেলে, এই বিশ্বস্ততার মূল্য শোধ করবো কি নীচ হয়ে ? ছোট হয়ে ? যদি স্বেচ্ছায় দিতে, মাথায় করে নিতাম।...জানো উত্তরা, সেই কুড়ি বছরের ছেলেটা কত বছর ধরে কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে ?

উত্তরার গলা থেকে যে অস্ফুট আওয়াজটা বেরোয় সেটা বোধহয়, কি ?

অরণি আবেগরুদ্ধ গলায় বলে, সে স্বপ্ন, উঁচু বাঁধের ওপর রেল লাইন, চোখের সীমানায় এক দুরন্ত নদী, আর একটা বাড়ীতে শুধু তুমি আর আমি—

তোমার সে স্বপ্নের কথা তো কোনও দিন আমার বাবার কাছে এসে বলনি অরণি ?

বলেছিলাম উত্তরা ! তুমি জানতে পারনি। তোমার বাবা বলেছিলেন, আমার মত ইতর ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়েকে বরং কেটে জলে ভাসিয়ে দেবেন।

অরণি !

বানিয়ে বলছি না উত্তরা ! দিনে দিনে তাই সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ... আজ আবার তুমি কেন এলে উত্তরা ? একা একজন পুরুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে কেন রইলে ?

আমায় মাপ কর অরণি !

মোহময়, জ্যোৎস্নাময় রাত্তিরটা তোমার হাতে আছে উত্তরা, ভাববার, সিদ্ধান্ত করবার—

রাতটা নেই অরণি, নটার গাড়ীতে আমি ফিরে যাব।

ট্রেনের টাইমে তাড়াতাড়ি লুচি ভাজতে ভাজতে মালিটা ভাবে, দূর, যা ভাবছিলাম তা নয় দেখছি। যতই হোক—নির্জন নিরম্বু একটা বাড়ী, বলতে থেলে নিষ্পর একটা লোক...এখনকার মেয়েদের বেপরোয়া সাহস দেখে দেখে মনে করেছিলাম বুঝি...ছিঃ ভারী লজ্জা করছে।

উত্তরাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে অরণি ভাবে, ঘৃণা হচ্ছে নিজের ওপর। চাবুক মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কী লজ্জা ! কী দৈন্য ! দৈন্যের কী হাস্যকর প্রকাশ ! কেন আমি ভিক্ষুকের মত এত খেলো করলাম নিজেকে ? সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার ?

ট্রেনটা একটানা শব্দ করে চলেছে ঝিক্‌ঝিক, ঝিক্‌ঝিক্।

সেই শব্দের মধ্যে উত্তরার ভাবনাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে...মিলিয়ে যাচ্ছে। উত্তরাও ভাবছে, সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার ? এতটা শুচিবাইয়ের ? আমার এই মহান শুচিতার জবাবদিহি করতে যাব আমি কার কাছে ? যদি নিজের কাছে হয়, সবটাই তো হাস্যকর রকমের মূল্যহীন। প্রতি মুহূর্তেই তো আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি ওকে, আশা করেছি ও লুঠ করে নিক আমায় !

তবে ?

জবাবদিহিটা তা'হলে সেই সংস্কারের কাছে ! বুঝতে পারছি, আমি জীবন-বিশ্বাসী নই, আমি সত্যধর্মি নই, এমন কি আমি আধুনিকও নই। আমি আমার সেই সেকেলে পিসির কার্বন কপি মাত্র ! এছাড়া আর কিছু হ'বার ক্ষমতা নেই আমার।

❑

আয়োজন

ছেলেটার উপর চোখ পড়ল না। পড়ল তার মা'র ওপর।

কাঁধকাটা পিঠকাটা একবিঘতি ব্লাউজ, পিঠে ফেলা শাড়ীর আঁচলটা গোছা করে বাঁ হাতের তলা দিয়ে পেঁচিয়ে ফের আবার সামনের দিকে ঘুরিয়ে আনার দরুণ কাটা-পিঠ ব্লাউজ সমেত সমস্ত পিঠটা দৃশ্যমান, কাজেই পাঁজরের পাশের মাংসের থাক দুটোও স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আর লোকনাথের মনে হল এর চাইতে অশ্লীল দৃশ্য বুঝি জগতে আর নেই।

তারপরই মনে করতে চেষ্টা করলেন লোকনাথ, কতবছর বিয়ে হয়েছে ধ্রুবর। সাত ? আট ? নয় ?

হ্যাঁ, নয়, ন বছরই। উনিশশো চুয়ান্ন সাল সেটা। তার পরের বছরই তো লেক গার্ডেনসের এই জমিটা কিনেছিলেন লোকনাথ।

তা' তার মানে রুমার এ বাড়িতে আসার পর পুরো একটা দশকও কাটেনি। অথচ এই দশের আগেই দশ মূর্তি, ভাবলেন লোকনাথ, একেবারে 'দশমহাবিদ্যার মূর্তি!

রুমা যতক্ষণ ধরে ওর সম্প্রতি গ্রহণ করা বিশেষ একটি ছন্দের ভঙ্গীতে সিঁড়ি দিয়ে নামল, আর তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার পর যতক্ষণ তাকে দেখতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ যাকে বলে 'রীতিমত অবলোকন করা', তা করলেন লোকনাথ।

রুমার চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও যেন দেখতে থাকলেন কিছুক্ষণ। আর সেই শূন্যতার ওপর হঠাৎ একটা ছবি ফুটে উঠল।

রুমাকে প্রথম দিন দেখতে যাওয়ার ছবিটা। ওর বাপের বাড়ির সেই ঘরখানা সমেত।

লোকনাথের মনে হয়েছিল যেন একখানি সরস্বতী প্রতিমাকে এনে বসিয়ে দিল ওর বাবা। লোকনাথ বিমুগ্ধ নেত্রে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে ওর বাবাকে বললেন, দেখতে তো আপনার মেয়ে চমৎকার, তবে একটু যেন রোগা না ? হাত-টাত বড্ড সরু—

বাপ হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, ও কিছু না, ও আপনার ঘরে গেলেই দেখবেন দু'দিনে—একটু হেসে কথার শেষ করেছিলেন, গরীব বাপ, কতই আর যত্ন করতে পারে বলুন ? এবার তাই 'জজ' বাপ করে দিচ্ছি—

হ্যাঁ তাই। তখন 'জজ' ছিলেন লোকনাথ, এক্সটেনশনের পিরিয়ড চলছিল। এখন বাড়ীতে বাসা। সিঁড়ির সামনের এই ঘরটাই এখন তাঁর আবাসস্থল।

আর ঘরের সামনের দরজাটা এবং পাশের ওই জানলাটা লোকনাথের দুই চক্ষু। খবরের কাগজের আড়াল থেকেই তিনি অবলোকন করেন, কে বেরোচ্ছে, কে ঢুকছে।

সংসার সদস্যদের আগমন-নির্গমনের এই হিসেবটা কেন রাখেন, রেখে কী লাভ, তা' নিজেই জানেন না লোকনাথ, তবু রাখেন।

আজও ব্যতিক্রম হল না।

হাতের কাগজখানা একরকম আছড়ে একধারে ফেলে দিয়ে চটিতে পা গলাতে গলাতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বৌমা, এখন সকালবেলা ছেলে নিয়ে গেল কোথায় ?

সুপ্রভাকে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সর্বদাই দিতে হয়। তাই উত্তরে কোমলতা ঝরল না। ঝরা সম্ভবও নয়।

তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, সেটা আমায় জিগ্যেস না করে বৌমাকে জিগ্যেস করলেই ভাল হ'ত না ?

'ভাল !' লোকনাথ ব্যঙ্গোক্তি করলেন, ভালোর তো সবই হচ্ছে, তাই ! জিগ্যেস করবো কি, নবাবকন্যে তো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন না, মদগর্বে চলে যান।

বাড়ী থেকেও তাই গেছেন !

লোকনাথের রাগটা এবার সুপ্রভার ওপর এসে আশ্রয় নিল। রাগ চাপলেনও না। বললেন, বৌ কোথায় বেরিয়ে গেল, সে খবরটুকু রাখতে পার না ?

না পারি না। বাতাসে যেটুকু খবর কানে আসে তাই জানি। শুনলাম ছেলেকে সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করতে গেলেন।

সাঁতার !

আকাশ থেকে পড়লেন লোকনাথ। ওই দু' বছরের ছেলেটাকে সাঁতার ক্লাবে ! তার মানে ?

মানে আবার কি ! মা ছেলের স্বাস্থ্য ভাল করবার চেষ্টা করবে না ?

স্বাস্থ্য ভাল ? ওই বারো মাস সর্দি-কাসি ছেলের সাঁতার শিখে স্বাস্থ্য ভাল হবে ?

হবে নিশ্চয়।

বলে সুপ্রভা অকারণেই চশমাটাকে নাকের ওপর চেপে বসিয়ে নিলেন একবার।

এ ভঙ্গী লোকনাথের পরিচিত। এ হচ্ছে প্রসঙ্গে যবনিকাপাতের ইঙ্গিত। ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, খোকা কোথায় ?

ঘরে কি বাথরুমে আছেই কোথাও।

লোকনাথ কাকে যেন ডেকে বললেন, এই দেখতো দাদাবাবু কোথায় ? ডাক একবার।

'খোকা' সদ্য দাড়ি কামানো অল্পবিস্তর সাবানের ফেনা লাগানো মুখটা তোয়ালেয় ঘসতে ঘসতে এসে দাঁড়াল।

লোকনাথ রাগের ভঙ্গী ছেড়ে বিদ্রূপের ভঙ্গী ধরলেন, তোমার লায়েক ছেলে নাকি সাঁতার

শিখতে গেল ?

আড়াই বছরের ছেলেকে সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যে অনেক বচসা হয়ে গেছে খোকার, অথবা ধ্রুবনাথের।

রুমা বলেছে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী হলে কি হবে, অর্ধ শতাব্দীর অনগ্রসরতা নিয়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করছ তোমরা !

ধ্রুবনাথের মাণিকতলার সেই স্যাঁৎসেতে ঘরওয়ালা অন্ধকারাচ্ছন্ন নিজের শ্বশুর বাড়ীটার কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়েছিল শ্বশুরের সেই কলার ছেঁড়া টুইল শার্ট পরা বাজারের থলে হাতে করা মূর্তিটি।

কিন্তু যা মনে পড়ে তা মনের মধ্যে রেখে দেওয়াই সভ্যতা।

সভ্য ধ্রুবনাথ তাই ছেলের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে তর্ক করেছিল এবং যথারীতি তর্কে হেরেও ছিল। সেই তিক্ততা রয়েছে মনের মধ্যে। বাবার এই ব্যঙ্গ প্রশ্নে সেটা আরো বেড়েই গেল। আর তার দরুণ উল্টো গেয়েই বসল। না বলেই বা করবে কি ? সত্যি তো আর পঞ্চাশ বছরের অনগ্রসরতা নিয়ে চলাফেরা করছে না যে, মা বাপ ভাইবোনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্ত্রীর নিন্দে করবে ?

তাই ওই উল্টো গাওয়া।

বেশ আত্মস্থভাবে বলে, তা' আশ্চর্য হবার কি আছে ? কত ছেলেই তো যাচ্ছে ও বয়সে।

যাচ্ছে ! দু' বছরের ছেলে সাঁতার শিখতে যাচ্ছে ?

দু' নয় আড়াই !

সরি ! তা' সেটাই খুব স্বাভাবিক তোমাদের কাছে ?

অস্বাভাবিকেরও তো দেখছি না কিছু— ধ্রুব তোয়ালেটা আরো জোরে জোরে গালে ঘসতে ঘসতে বলে, পাঁচজনে যা করছে—

যে যুক্তি নিজেই এতক্ষণ খন্ডন করছিল, সে যুক্তি এখন নিজেই প্রয়োগ করছে ধ্রুব।

প্রাক্তন জজ বারকয়েক মসৃন মোজাইক মেজেয় চটি ঘসে পায়চারি করে কটুকণ্ঠে বলেন, তা' এ সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করারও তো দরকার বোধ করনি দেখছি—

প্রয়োজনবোধ ধ্রুব করেনি তা নয়, করেছিল।

টুটুল বাবার চক্ষের মণি, প্রাণের পুতুল, তা তো জানে ধ্রুব। কাজেই টুটুল সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাবাকে বলা বিধেয়, এ প্রস্তাব করেছিল ধ্রুব। কিন্তু রুমা বলেছিল, জিগ্যেস করা মানেই তো নিষেধের মুখে দাঁড়ানো ? নিষেধ অমান্য করে কাজ করাটাই কি তুমি বেশ সুন্দর মনে কর ?

অর্থাৎ কাজটা করা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই। অতএব ধ্রুব আর পরামর্শরূপ প্রহসনের দিকে যায়নি। কিন্তু এত কথা তো বলা চলে না, তাই ধ্রুব গুরুত্বটা লঘুতে আনে, কী এমন একটা ব্যাপার ! এটাকে এমন গুরুত্বই বা দিচ্ছেন কেন ?

গুরুত্বই বা দিচ্ছি কেন ! তা বটে । ওই একটা বাচ্ছা—হঠাৎ জজিয়তী করা গলাটা কেমন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে, নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে যান লোকনাথ, অস্ফুট স্বরে কথাটা শেষ করেন, জলে চোবালে বাঁচবে ও ?

ধ্রুব মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকে সেই দিকে । তারপর মায়ের দিকে তাকায় । সুপ্রভা কুটনোয় বসেছিলেন, বসেই আছেন । এসব কথার ছন্দাংশ তাঁর কানে পৌঁছেছে সে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না ।

ধ্রুব ভাবল মেয়েদের নাকি চিরদিন 'মমতাময়ী' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়ে থাকে ।

তারপর ভাবল 'শাঁখের করাত' বলে একটা প্রবাদ আছে বাংলায়, সেটা কাদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল ? তারপর ঠাকুরের কাছে ভাত চেয়ে খেয়ে বেরিয়ে গেল । জজের ছেলে হয়েও তেমন কিছুই হতে পারেনি সে । সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলেজে অধ্যাপনা করে 'প্রফেসর' নামটার গৌরব গ্রহণ করে আছে মাত্র । আর সেখানে গৌরব বাড়ীর গাড়ী করে যাওয়া আসা করা ।

বাসে যেতো প্রথম প্রথম । লোকনাথই বলে কয়ে রাজী করিয়েছেন গাড়ীতে যেতে ।

ধ্রুব বেরিয়ে গেল টের পেলেন লোকনাথ গাড়ীর শব্দে । আর যে গাড়ী চড়তে সেধেছিলেন ছেলেকে, সেই গাড়ীর শব্দটাই হঠাৎ বিষ লাগল তাঁর কানে । ভাবলেন, মাইনে তো তিন পয়সা, লবাবীর কমতি নেই কিছু ।

যাক সেও মনের মধ্যকার কথা ।

সে কথার জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না ।

কিন্তু কিছু কথা মুখের আগায় এনে জমা করে রাখলেন লোকনাথ, বলবেনই ঠিক করেছেন । কেন বলবেন না ? কিছু না বলে বলেই এইটি হয়েছে । এতটি বাড় বেড়েছে ওদের ।

ছেলের বিয়ের পর কিছুদিন যে তিনি নিজেই সরস্বতী প্রতিমা বৌটি নিয়ে কতটা বাড়াবাড়ি করেছিলেন, সে সব আর এখন মনে পড়ে না লোকনাথের । বৈঠকখানায় বাইরের লোক এসেছে, উনি 'বৌমা'কে ডেকে নিয়ে গেছেন, বৌমার গান শুনিয়েছেন তাদের, শতমুখে প্রশংসা করেছেন তাদের কাছে । এ যেন নিজের বিজয় নিশান । কেমন জোগাড় করেছি দেখ তোমরা !

মাণিকতলার সেই ছায়াচ্ছন্ন বাসার ছায়া জড়ানো নম্রকুণ্ঠিত প্রতিমাখানি কবে বিদায় নিল বেদী থেকে ? কবে ওই মেদবহুল বিশ্ব-নস্যাৎভঙ্গী নারী মূর্তিটি মঞ্চে আসীন হল, ঠিক হিসেব করতে পারেন না লোকনাথ ।

তবে সুপ্রভা মাঝে মাঝে লোকনাথের পুরনো দিনের আদিখ্যেতার উল্লেখ করে স্বখাত-সলিলের উপমা দেন । অতএব বৌয়ের সঙ্গে নিজেও বিষ হন লোকনাথের কাছে ।

ক্রুদ্ধ লোকনাথ বলেন, শাশুড়ী হও, উচিত কথা বলতে পার না ?

সুপ্রভা বলেন, না পারি না । উচিত কথায় বন্ধু বিগড়োয় জান না ? শোনাতে ইচ্ছে হয়, তুমি শোনাওগে না ! যখন শুনিয়েছিলাম, তখন কানে করেছিলে আমার কথা ?

এও একটা উচিত কথা।

অতএব বন্ধু বিগড়োয়।

চিরদিনের বন্ধু এখন সর্বদাই বিগড়ে বসে আছে। যাক, আজ লোকনাথ হাল ধরবেন ঠিক করলেন।

ধ্রুব বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে আসামীর পদশব্দ পাওয়া গেল। নকীব আছে তার আগে আগেই। কাঁদতে কাঁদতে আসছে টুটুল। সিঁড়ির দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন লোকনাথ, কাজেই রুমা যা দু'চক্ষে দেখতে পারে না তাই করে বসল টুটুল। মায়ের কাছে পিটুনী খাওয়ার নালিশ করতে এল ঠাকুর্দার কাছে।

দাদু, দাদুভাই, মামণি আমাকে জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, আমায় কান মুলে দিয়েছিল, আমায় রোজ পুকুরে ডুবিয়ে দেবে বলে—

টুটুল!

ডেকে উঠল রুমা, তীব্র কণ্ঠে। এইগুলো সত্যিই ভীষণ বিরক্তিকর। বুড়োদের জ্বালায় ছেলেকে মনের মত করে মানুষ করবার জো নেই।

জজ শ্বশুর থাকার সুবিধেগুলো মনে পড়ে না রুমার, বুড়ো শ্বশুর থাকার অসুবিধেটাই তাকে পীড়িত করে। ছেলের এই নালিশ করা রোগটি কি জন্মাত, যদি লোকনাথ অত প্রশ্রয় না দিতেন আদুরে নাতিটিকে?

তা' রুমা যতই ইঙ্গিতময় ডাক ডাকুক, টুটুল দাদুরই শরণ নেয়। আর লোকনাথ দেখেন, ছেলেটার চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে, মুখটা ফুলে গেছে যেন। লেকের জল এবং চোখের জল, উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত নাতির এই আর্দ্র মূর্তি দেখে আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না লোকনাথ, বলে উঠলেন, ছেলেটাকে আর জ্যান্ত নিয়ে ফিরলে কেন? লেকের জলে রেখে এলেই পারতে!

কথাটা বলে ফেলে বুঝলেন একটু বেশী কড়াই হয়ে গেছে, কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর চারা কি?

না, চারা নেই।

মহীরুহ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে সেই অসতর্ক উক্তি।

মুহূর্তে রুমার সারা মুখটাই ছেলের চোখের মত রাঙা হয়ে ওঠে।

সেও হঠাৎ বলে ওঠে, আপনাদের আশীর্বাদের তেমন জোর থাকলে তাও হতে পারতো বাবা!

কী, কী, বললে বৌমা!

কিছুই বলিনি বাবা, সামান্য একটা ব্যাপারকে অসামান্য করে তুলে নিজেরাই কষ্ট পান আপনারা, এইটাই শুধু বলছি।

এই দুধের ছেলেটাকে জলে চুবিয়ে নিমোনিয়া ধরানোর দুর্বুদ্ধি সামান্য বলছ তুমি বৌমা?

রুমা শান্তস্বরে বলে, আপনি বরং একদিন সকালে গিয়ে দেখবেন, একা আপনার নাতিটিকেই জলে ডুবিয়ে মারার ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা সেখানে।

দেখবার আমার দরকার নেই, লোকনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, ওর যাওয়া হবে না ব্যস।

রুমা তবু শান্ত আর অবিচল থাকে, ভর্তি, করে এলাম—

যাক চুলোয় যাক, গোটাকতক টাকা জলে গেলে কিছু এসে যাবে না।

না, শ্বশুরের মুখে মুখে তর্ক করে না রুমা, শুধু বুঝিয়ে দেয়, টাকাই তো শুধু জলে যাবে না বাবা, আমার প্রেস্টিজটাও জলে যাবে। তা ছাড়া সইবে না বললে চলবে কেন ? ওকে তো মানুষ করে তুলতে হবে ? ওতো আর জজের ছেলে নয় যে গোবরগণেশ হয়ে থাকলে চলবে !

লোকনাথ এসে শুয়ে পড়লেন।

সারাদিন শুয়েই থাকলেন লোকনাথ।

বিকেলের দিকে চাকরের মুখে শুনতে পেলেন, 'টুটুলবাবু' বেড়াতে যাবে না, বেদম জ্বর এসেছে তার।

লোকনাথ উঠে বসলেন।

তারপর বড় করে একটা আলিস্যি ভেঙ্গে হাই তুললেন। মনের কথা কেউ দেখতে পায় না, তবু চাকরটার মনে হল বাবুকে কেমন উৎফুল্ল দেখাল। তারপর ভাবল, ধ্যেৎ, মনের ভ্রম।

ধ্রুবর কলেজ থেকে ফেরার সময়টা দেখেননি লোকনাথ। দেখলেন ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—বললেন, খোকা, এসেই ছুটছ কোথায় ?

লোকনাথের গোবরগণেশ ছেলে ডাঁট রাখতে পারল না, বিষণ্ণ মুখে আর কাতর কণ্ঠে বলল, টুটুলের, জ্বরটা প্রায় চারের ওপর উঠে গেছে বাবা, ফোনে পেলাম না ডাক্তারবাবুকে—

টুটুলের জ্বর হয়েছে নাকি ? কেন ?

'কেন' সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। ধ্রুব ঘুরিয়ে বলে কি জানি এসে তো দেখছি—

ঠিক আছে। তুমি আর রোগা ছেলে ছেড়ে বেরিও না, আমি দেখছি। তবে ওর মাকে বোলো—যাক্।...আচ্ছা—

বেরিয়ে গেলেন লোকনাথ গাড়ী নিয়ে।

ডাক্তার আসতে দেরী হল না।

কিন্তু ততক্ষণে ধ্রুব কাঁপছে, সুপ্রভা প্রায় কাঁদছেন আর রুমার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে এক উনুন আগুন ভরা আছে ওর মুখের ওই ফর্সা চামড়ার অন্তরালে। আবেগ, উৎকণ্ঠা, অভিযোগ, অভিমান সব কিছুকে সংহত করে রাখতেই বোধ করি ওর এই অবস্থা।

ডাক্তার বললেন কি, কি খবর ?

ধ্রুব কেঁদে ফেলা গলায় বলল, এইমাত্র টেম্পারেচার নিয়েছি, পাঁচ পয়েন্ট ছয়—

লোকনাথ সেই 'পাঁচ পয়েন্ট ছয়ে'র মুখের দিকে তাকালেন একবার, বুকের মধ্যেটা

হাহাকার করে উঠল, মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে হ'ল দেয়ালে। এরপর আর কি মুখ দেখাতে পারবেন তিনি ছেলে-বৌয়ের কাছে ?

রুমা তো বলবেই ধ্রুবকে।

শোকের সময়—

শোকের সময় ! তা ছাড়া আর কি ?

লোকনাথ ভাবলেন ওই একমুঠো ফুল কি আর এই আগুনের শিখা থেকে রক্ষা পাবে ? 'পাঁচ পয়েন্ট ছয়—', আগুন ছাড়া আর কি ?

ডাক্তার আইসব্যাগ আর গরমজল দুটোরই ব্যবস্থা দিলেন। এবং উপস্থিত সকলেরই এ বোধ এলো এটা শেষ চেষ্টা মাত্র।

ওই নিথর নিস্পন্দ ফুলের মুঠোটা মাঝে মাঝে হেঁচকি তোলা আর মাথাটা ঘসটানো ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষণ নেই যার মধ্যে, কতক্ষণ আর মাথা চালবে সে ? কতক্ষণ হেঁচকি তুলবে ?

আর পারলেন না লোকনাথ।

পাঁজরের মধ্যেটা মুচড়ে উঠলে মুখ সামলে থাকা কি সহজ ? হতে পারে এখন প্রাক্তন, এক সময় তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, পুরো একটা জেলার। তাই সামলাতে পারলেন না মুখ, বলে উঠলেন, হলো তো ! ছেলেকে খেটে-পিটে খাবার মতন করে মানুষ করা হল ?

সবাই চমকে তাকাল। মায় ডাক্তার।

শুধু রুমা চমকালো না।

শুধু তার এতক্ষণের আগুনে-ফোটা মাথার রক্তটা চোখের স্নায়ু পুড়িয়ে দিয়ে চোখ বেয়ে নামতে থাকল ফুটন্ত জল হয়ে।

লোকনাথ চলে গেলেন ঘর থেকে।

আর প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অপেক্ষা করতে লাগলেন সুপ্রভার কণ্ঠস্বরের। হ্যাঁ সুপ্রভাই। পঞ্চাশ বছর বয়েসের আর আরও পঞ্চাশ বছরের অনগ্রসরতা নিয়ে বসে আছে যে মানুষটা মুমূর্ষু শিশুর মাথার কাছে।

কত যুগ কাটলো ?...

যুগ-যুগান্তর ?

সুপ্রভা কি চেঁচিয়েছিলেন ?

লোকনাথ শুনতে পাননি ?

লোকনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?

নইলে বাড়ীটা এমন নিথর কেন ? ভয়ানক একটা ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল লোকনাথের। উঠতে গেলেন, উঠতে পারলেন না। নিশ্চয় বুঝলেন, তখনকার সেই নির্মম

মন্তব্যই তাঁকে ওদের কাছ থেকে 'একঘরে' করে রেখেছে।

হয়তো ওরা লোকনাথের ওই নিষ্ঠুরতার জন্যে নিজেদেরকে নিশ্চুপ করিয়ে রেখেছে। হয়তো নীরবে নিয়ে চলে গেছে।

'খোকা' বলে ডেকে উঠতে চাইলেন, পারলেন না। বালিশে মাথা চেপে বিশ্রী একটা শব্দ করে উঠলেন শুধু।

এ শব্দে কিন্তু খোকাই এল।

বলল, এই যে বাবা উঠেছেন আপনি ! ঘুমোচ্ছিলেন বলে আর জাগাইনি। টুটুলের জ্বরটা সাড়ে নিরানব্বুইয়ে নেমে গেছে। ডাক্তার এসে পড়েছিলেন, নইলে 'তড়কা' হয়ে পড়তে পারতো।

লোকনাথ ধ্রুবর মুখের দিকে তাকালেন না। নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধ্রুব বলল, খেতে দেওয়া হচ্ছে।

খেতে দেওয়া হচ্ছে ! তার মানে যথারীতি রান্নাবান্না হয়েছে।

লোকনাথ ঘড়ি দেখলেন রাত সাড়ে দশটা।

দু'ঘন্টা তাহলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত মনটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেল লোকনাথের, সে বিস্বাদ বুঝি জিভে এসে লাগল, বললেন, খিদে নেই।

ধ্রুব চলে গেল।

কিন্তু একটু পরে আবার চাকর এল ডাকতে।

উৎফুল্ল মুখে বলল, বাবু, টুটুবাবুর জ্বর ছেড়ে গেছে।

লোকনাথ হঠাৎ তেড়ে উঠলেন তাকে।

বললেন, গেছে তার কি ? দু হাত তুলে নাচব ? কতজনে মিলে শোনাতে হবে ?

ও থতমত খেয়ে বলল, খেতে দিয়েছে—

বললাম যে খিদে নেই, খাব না।

আবার শুয়ে পড়লেন লোকনাথ।

নিজেকে যেন পরাজিত হৃতসর্বস্ব মনে হল লোকনাথের। কে যেন অনেক আশ্বাস দিয়ে ঠকিয়েছে তাঁকে।

❑

Printed at J.J. Offset Printers, Wazirpur, Delhi - 35